দীর্ঘ দেড় হাজার বছরের অভিযাত্রায় ইসলামের বিজয় গৌরবের পতাকাবাহী ঐতিহাসিক বীর মুজাহিদদের জীবন ও কর্ম নিয়ে লিখিত

মুজাহিদদের জীবন কথা
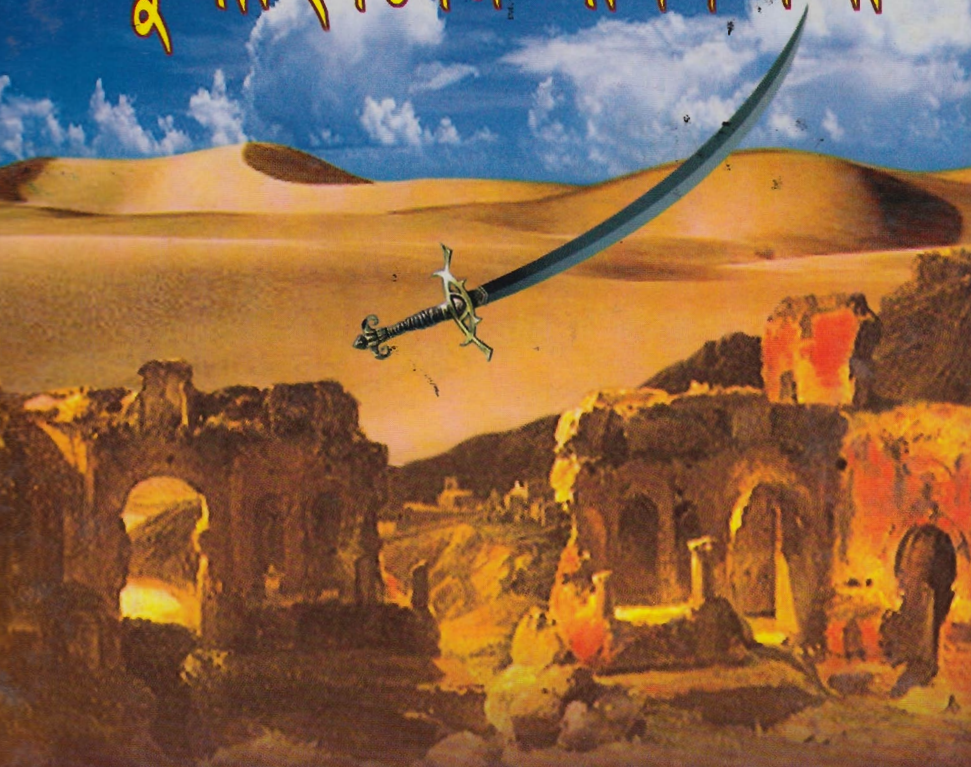
মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নাদভী

মুজাহিদদের জীবন কথা

[ইতিহাসের বিখ্যাত বীর মুজাহিদদের অবিস্মরণীয় জীবন কাহিনী]

।। দ্বিতীয় পর্ব ।।

উবায়দুর রহমান খান নাদভী

কিতাব কেন্দ্র

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল ঃ ০১৭১-৯৫৫২১৭, ০১৭১-৮৪৫৩৩৭

[একটি ইসলামী চেতনা বিকাশ কেন্দ্র প্রকাশনা]

মুজাহিদদের জীবন কথা ।। দ্বিতীয় পর্ব ।।

উবায়দুর রহমান খান নাদভী

❑

❑

প্রকাশ কাল ঃ জুলাই ২০০৩

❑

প্রকাশনায় ঃ

কিতাব কেন্দ্র

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল ঃ ০১৭১-৯৫৫২১৭, ০১৭১-৮৪৫৩৩৭

❑

দাম ঃ নব্বই টাকা

অর্পণ

'দিনবদলের সে সাহসী যোদ্ধাদের'

একবিংশ শতকের এ সভ্য পৃথিবীতে
তথাকথিত উন্নত মানুষগুলোর হাতে প্রায় প্রতিদিন যারা
প্রাণ দিয়ে চলেছে, প্রতিনিয়ত মার খাচ্ছে, শোষিত হচ্ছে–
স্বদেশ, স্বাধীনতা ও ন্যূনতম মানবিক অধিকারটুকু
চাওয়ার অপরাধে যারা আজ সন্ত্রাসী আখ্যা পাচ্ছে–

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম

প্রাসঙ্গিকী

'মুজাহিদদের জীবন কথা' বইটির প্রথম পর্ব দূর-দূরান্তের পাঠকের হাতে যেতে না যেতেই আল্লাহর অপার কৃপায় এর দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। ইসলামের ঐতিহাসিক অগ্রযাত্রার বিজয় পতাকাবাহী দীর্ঘ দেড় হাজার বর্ষীয় আলেখ্য তুলে ধরা যে কত বিরাট কাজ তা কেবল চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই উপলব্ধি করতে পারবেন। ভাঙ্গাচোরা হলেও আমরা এর একটি উদ্যোগ সফল করতে সচেষ্ট রয়েছি। তাওফীকের মালিক আল্লাহ।

'মুজাহিদদের জীবন কথা' শীর্ষক এ গ্রন্থধারা যতদূর সম্ভব প্রকাশিত হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। এ উদ্যোগের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত প্রতিটি ভাই ও বন্ধুর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

এ গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক প্রকাশের সাথে যাদের যতরকম সহযোগিতা আর অংশগ্রহণ রয়েছে, এর সবই আল্লাহ পাকের নিকট উচ্চতর মূল্যায়নের হকদার হোক– এটাই আজকের প্রত্যাশা। বিজ্ঞ পাঠক সমাজ এই প্রকাশনার প্রতি তাদের সুদৃষ্টি ও নেকদোয়া অব্যাহতভাবে জারি রাখবেন।

নতুন প্রজন্মের পাঠকের প্রিয় অথচ নিতান্তই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান 'কিতাব কেন্দ্র' তার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার দ্বারা আরও গতিশীলতার পথে পরিচালিত হোক। বাংলাভাষী পাঠকগণকে ইসলামী ভাবধারার উন্নত-সাহিত্য উপহার দিতে সচেষ্ট এ সংস্থাটির উজ্জ্বল আগামীর প্রত্যাশায়। ফী আমা-নিল্লাহ্!

ঢাকা — বিনীত

২৩ জুন ২০০৩ — **উবায়দুর রহমান খান নাদভী**

সংক্ষিপ্ত সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

দুই কিশোর মুজাহিদের কথা যারা মহানবীর (স.) প্রধান শত্রু আবু জাহলকে হত্যা করেছিল

আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে যেয়ে মক্কার কোরায়শদের চরম শত্রুতার মুখে হযরত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের নিয়ে মদীনায় হিজরত করতে হয়েছিল এবং কোরায়শ শত্রুরা সেখান পর্যন্ত যেয়ে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে দেয়ার লক্ষ্যে কয়েকটি যুদ্ধ করেছিল, শিক্ষিত মুসলমান মাত্রেই তা জানেন। এই যুদ্ধগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম সংঘটিত বদর যুদ্ধ ছিল প্রকৃত অর্থে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধ। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মাত্র ৩১৩ জন সৈন্য নিয়ে ১০০০ সৈন্যর কোরায়শ বাহিনীকে মুকাবিলা করতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও মুসলিম সৈন্যদের অদম্য বিক্রম ও ঈমানের বলে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয়ের ভাগ্য হয়েছিল মুসলমানদেরই এবং অধিকাংশ নেতাকে হারিয়ে কোরায়শ বাহিনীকে পর্যুদস্ত হয়ে পালাতে হয়েছিল। এই যুদ্ধের পরিণামেই ইসলামের বিজয়-নিশান প্রথমবারের মত পৃথিবীর বুকে দৃপ্তভাবে উড্ডীন হয়েছিল।

মক্কার কোরায়শ নেতাদের মধ্যে হযরত রসূলুল্লাহকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের নায়কত্বে ছিল বিশিষ্ট চৌদ্দ জন ব্যক্তি। তাদের মধ্যে এগারো জনকেই জীবন দিতে হয়েছিল এই যুদ্ধে। হযরতের কঠোরতম শত্রু দুরাত্মা আবু জাহল এই যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বে ছিল না, অন্য এক নেতা উতবা ইবনে রাবিআ' ছিল এর সেনাপতি। আবু জাহল সেনাপতি না হলেও সে-ই ছিল সমস্ত কোরায়শ বাহিনীর বল-বুদ্ধির মধ্যমণি, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আবু জাহলসহ সেনাপতি উতবাও নিহত হয়েছিল এই যুদ্ধে।

নিহতদের মধ্যে আবু জাহলের নিধন ছিল বদর যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথম যুদ্ধেই তার মত নেতার পতন পরবর্তী যুদ্ধগুলোর উপর প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল এবং কোরায়শদেরকে বহুলাংশে হীনবল করে দিয়েছিল।

সেনাপতি উতবার পতন হয়েছিল দ্বৈতযুদ্ধে হযরত মহানবী (সাঃ)-এর চাচা বীরকেশরী হযরত হামজা (রাঃ)-এর হাতে। দ্বৈতযুদ্ধে তাঁর হাতে অন্য এক নেতা শায়বা বিন রাবিআ'রও পতন হয়েছিল এবং ওয়ালিদ বিন উতবা (সেনাপতি উতবার পুত্র) খতম হয়েছিল শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে। এরা ছাড়াও আমর বিন হিশাম, উক্‌বা বিন আবু-মুআইত, উমাইয়া বিন খাল্‌ফ এবং উমারা বিন আল-ওয়ালীদ নামের আরো চার জন দুরাত্মা ছিল নিহতদের মধ্যে। নবুয়তের প্রথমদিকে একদিন পবিত্র কাবায় হযরত নবীজীর নামাযের সেজদারত অবস্থায় উপরোক্ত সাত ব্যক্তির প্ররোচণামতে দুরাত্মা আবু জাহল তার দুই কাঁধের উপর একটি উটের নাড়ি-ভুঁড়ি চেপে দিলে উপস্থিত এরা সকলেই সে দৃশ্য উপভোগ করেছিল এবং হেসে গড়াগড়ি দিয়েছিল। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেদিন তাদের প্রতি যে অভিসম্পাত বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, হাদীসমতে তারই প্রতিপূরণে তাঁরা সবকয়জনই বদর যুদ্ধে নিধনপ্রাপ্ত হয়ে নিহত মুশরিকদের জন্য তৈরি একই গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এদের সকলের মধ্যে আবু জাহেলের পতন ছিল সত্যিকার অর্থে এক অভাবিত ব্যাপার। তার নিধন কার দ্বারা কিরূপে সংঘটিত হয়েছিল, অনেকের কাছেই তা অজানা।

এই দুরাত্মার নিধনের ব্যাপারটি বর্ণনা করেছেন খ্যাতনামা সাহাবী হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)। বদরের রণাঙ্গনে যখন সকলকে সারিবদ্ধভাবে সাজানো হচ্ছিল, তখন তিনি তার ডানে ও বামে তাকালেন এবং উভয়পাশেই দু'জন কিশোর বয়সী তরুণ আনসারকে দেখতে পেলেন। তাঁর দু'পাশে বয়স্ক যোদ্ধা না থেকে কাঁচা বয়সী দুই তরুণ থাকায় তিনি স্বস্তিবোধ করতে পারছিলেন না। তাদের একজন তাঁর কাছে ঘেঁষে তাঁকে কানে কানে বললেন, "চাচা! আবু জাহল লোকটাকে আপনি চিনেন?" ছেলেটির এরকম প্রশ্নে তিনি আশ্চর্যবোধ করলেন। তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, তাকে চিনি. কিন্তু তুমি তাকে দিয়ে কি করবে?" ছেলেটি বলল, "আমি শুনেছি, সে হযরত রসূলুল্লাহকে মন্দ বলে। আমি আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করেছি, আবু জাহলকে পেলেই তাকে হত্যা করবো। যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ নিয়ে বলছি, তাকে পেলে আমাদের দু'জনের মধ্যে যার মৃত্যু আগে হবার তা না হওয়া পর্যন্ত তাকে আমি ছাড়বো না।"

কিশোরের দৃপ্ত পণের কথায় হযরত আবদুর রহমান যারপরনাই আনন্দ বোধ করলেন এবং তাঁর পাশে বয়স্ক যোদ্ধা না থাকার যে অস্বস্তিভাব তাঁর ছিল সেটাও দূর হয়ে গেল। পরক্ষণে অপর কিশোরটিও তাঁকে চুপে চুপে একই প্রশ্ন করলেন। তিনি তখন আরো পুলকিত বোধ করলেন। একটু পরেই তিনি দেখতে পান আবু

জাহল তার সেনাবাহিনীর মধ্যে টহল দিচ্ছে। তিনি তখন সাগ্রহে তার দিকে অংগুলী নির্দেশ করে বললেন, "দেখ, তোমরা যার কথা জিজ্ঞেস করছিলে ঐ সেই লোক।" একথা বলামাত্র তাঁরা উলঙ্গ তরবারি হাতে বাজপাখীর মত উড়ন্ত বেগে আবু জাহলের দিকে ছুটে গেলেন এবং বীরবিক্রমে তার উপর আপতিত হলেন। তাঁদের অতর্কিত আক্রমণে আবু জাহলের পাহারাদার সৈন্যরা হতচকিত হয়ে পড়ল এবং ব্যাপার কি তারা বুঝে ওঠার আগেই তাঁদের আক্রমণে আবু জাহল ধরাশায়ী হয়ে পড়ল। কিশোরদ্বয় ছিলেন একে ছোট তার উপর পদাতিক। আবু জাহল উপবিষ্ট ছিল উঁচুতে একটা বড় ঘোড়ার উপর।

এই দুই অসমসাহসী কিশোরের একজনের নাম মু'আজ বিন আমর বিন আল-জামুহ্ (রাঃ) এবং অন্যজনের নাম মু'আব্বাজ বিন আফ্রা (রাঃ)। মু'আজ তরবারির এক প্রচণ্ড কোপ বসিয়ে দেয় আবু জাহলের ঘোড়ার শরীরে এবং মু'আব্বাজ এক কোপ মারেন তার পায়ে। ঘোড়া লুটিয়ে পড়ল। তার সংগে আবু জাহলও পংগু হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। মু'আজ তাকে আরো কয়েক ঘা মারলে আবু জাহল রক্তরঞ্জিত হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি যেতে লাগল।

আবু জাহলের পুত্র ইকরিমা পিতার দুর্গতি দেখে ত্বরিত ছুটে এসে মু'আব্বাজের বাম বাহুর উপর প্রচণ্ড আঘাত করল। যার ফলে বাহুখানা অর্ধছিন্ন হয়ে ঝুলতে লাগল। তিনি দেখলেন তার ছিন্ন বাহু অস্ত্রচালনায় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তিনি তৎক্ষণাৎ দোদুল্যমান বাহুখানাকে পায়ের তলে চেপে ধরে এমন ঝটকা টান মারলেন যে, তা ছিন্ন হয়ে পড়ে গেল। তিনি স্বচ্ছন্দে পূর্ণ তেজে অপর বাহু দিয়ে অস্ত্রচালনা করতে লাগলেন। তাঁর শোচনীয় অবস্থা দেখে মু'আজ তৎক্ষণাৎ তার পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং রক্তরঞ্জিত আবু জাহলের গর্দানে এক কোপ বসিয়ে তাকে সাবাড় করে দিলেন।

হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রাঃ) বর্ণিত এই ঘটনা সম্পর্কিত হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবু জাহলকে ভূপাতিত করার পর দুই বীর হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ সংবাদ দেন। হাদীসের বর্ণনা মতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে এবং তাঁরা দুজনেই তাকে হত্যা করার দাবী করলেন। একথার পর তিন জিজ্ঞাস করলেন, তাঁরা তাঁদের তরবারী মুছে ফেলেছেন কি না। তাঁরা যখন উত্তর দিলেন তাঁরা তরবারী মুছেননি, তখন তিনি তাঁদের তরবারী প্রত্যক্ষ করলেন এবং বললেন, "তোমাদের দুজনই তাকে হত্যা করেছো।" হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) তারপর সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আবু জাহলের নিকট থেকে যা নেয়া হয়েছে' তা মু'আজ বিন

আমর বিন আল-জামুহ পাবে। এই দুই তরুণ ছিলেন মু'আজ বিন আমর বিন আল-জামুহ্ এবং মুআব্বাজ বিন আফ্রা।"-(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে- বদর যুদ্ধের শেষে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন- "আবু জাহলের কি হয়েছে তা কে দেখে এসে বলবে?" একথায় হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) যেয়ে দেখলেন যে, 'আফরা'র দুই ছেলে তাকে আঘাত করে মৃতপ্রায় করে রেখেছে। তিনি তার দাড়ি ধরে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি আবু জাহল?" সে উত্তর দিল, "নিহতদের মধ্যে আমার তুল্য সর্দার কেউ আছে কি?" অন্য বর্ণনা মতে সে বলেছিল- "কিশোর ছাড়া অন্য কেউ আমাকে হত্যা করলে ভালো হতো।"-(বোখারী ও মুসলিম)

বিপর্যস্ত পৌত্তলিক বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়নের সময় আবু জাহলকে মৃত সাব্যস্ত করে ফেলে গিয়েছিল। তার প্রাণ-বিয়োগ হয়েছে কি না তা দেখার সময়ও তাদের ছিল না। তারা তাদের প্রতাপান্বিত নেতার লাশ নিয়ে যাবারও কোন উদ্যোগ নেয়নি। এমনি ছিল তার ভাগ্য। তবুও দেখা যায়, মৃত্যুর মুহূর্তেও তার গর্বোদ্ধত স্বভাবের পরিবর্তন হয়নি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তার মস্তক কর্তনের জন্য তার বুকের উপর চড়ে বসলে সে বলে উঠেছিল- "ওরে ছাগলের রাখাল, উঁচু জায়গায় চড়ে বসলি!" তারপরে বলেছিল- "আমার যা হবার ছিল তা হয়েছে, কিন্তু বল শুনি কাদের জয় হলো?" ইবনে মাসউদ বলেন, আল্লাহ মুসলমানদেরকে জয়ী করেছেন এবং কাফেরদেরকে অপদস্থ ও পরাজিত করেছেন।" অতঃপর তিনি তার মস্তক কর্তন করতে উদ্যত হলে সে বলল, "আমার ঘাড় লম্বা করে কেটো- দেখে লোকেরা যেন চিনতে ও বুঝতে পারে যে, সর্দারের মাথা!" (মাহবুবে খোদা- মাহমুদুর রহমান)

আবু জাহলের নিধনকারী দুই কিশোর বীরের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে কিছু বিভ্রান্তি লক্ষিত হয়। এক বর্ণনামতে তাদের একজন ছিলেন আমরের পুত্র মু'আজ (রাঃ) এবং অন্যজন মদিনার সাহাবিয়া হযরত আফরা রাদিয়াল্লাহু আনহার অন্যতম পুত্র। আবার অন্য বর্ণনা বলে, দু'জনই ছিলেন তাঁর পুত্র, অর্থাৎ তাঁরা দুই সহোদর ভাই ছিলেন। মেশকাত আল-মাসাবীহ গ্রন্থে বোখারী ও মুসলিমে প্রচারিত সংশ্লিষ্ট হাদীসে তাঁদের নাম মু'আজ ইবন আফরা উল্লেখ করা হয়েছে। পাদটীকায় দ্বিতীয়জন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আফরা ছিল তাঁর মায়ের নাম তাঁর পিতার নাম 'আল হারেস'। পিতার নামের স্থলে পুত্র কেন মায়েন নামে পরিচিত হয়েছিল তার কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিতে 'আফরার দুই

ছেলে' উক্তি এই ধারণা দেয় যে, দুই কিশোর সহোদর ভাই ছিলেন (বোখারী শরীফে তৃতীয় খণ্ড)। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি বিবৃত করে ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে– "ঐ যুবকদ্বয় হইলেন মদীনাবাসী হযরত আফ্‌রা (রাঃ) নাম্নী সাহাবিয়ার দুই পুত্র মোয়াজ এবং মোয়াব্বাজ। এতদভিন্ন তাঁর আরও পাঁচটি ছেলে, মোট সাতটি ছেলে বদরের রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন।"

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাবর্গের যে তালিকা উপরোক্ত দুই গ্রন্থে দেয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে হযরত মোয়াব্বজ ইবনে আফ্‌রা (রাঃ) ও হযরত মুয়াজ ইবনে আফ্‌রা (রাঃ) এই দুই নাম ছাড়াও ইবন আফরা নামের আরো দু'জন এবং 'ইবনে হারেছ' নামের সাত জনের উল্লেখ পাওয়া যায়। আরবে 'হারেছ' নাম বহুল প্রচলিত, তাই এঁরা একাধিক ব্যক্তি হতে পারেন। এই সাত জনের তিন জনকে সাহাবিয়া হযরত আফ্‌রার গর্ভজাত পুত্র ধরে নিলে উপরের ব্যাখ্যার সংগে মিল হয়ে যায়। মোয়াজ ইবনে আমর (রাঃ) নামের পৃথক একজনের উল্লেখও পাওয়া যায়। বিভ্রান্তি জাগে এই যে, হযরত আফরার যে ছেলেই হোক, আপন সহোদর রণাংগনে থাকতে তাদের একজনকে সংগী না করে ভিন্ন পিতৃত্বের অন্য একজন মোয়াজকে আবু জাহলের সঙ্গী করতে যাবেন কেন এবং সৈন্যব্যূহ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফের একই পাশে না দাঁড়িয়ে ভিন্ন হয়ে দু'পাশে দাঁড়ালেন কেন?

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ' (প্রথম খণ্ড) 'আবু জাহল' শিরোনামে ভিন্ন মাতৃ-পিতৃ পরিচয়ে হযরত মু'আয ও হযরত মু'আব্বীযের নাম উল্লেখ করেছে। সঠিক নাম ও পিতৃ-মাতৃ পরিচয়ে একটা বিভ্রান্তি তাহলে থেকেই যাচ্ছে। তবে একথা নিশ্চিত যে, এ প্রসংগে প্রথমে যে তিনটি নামের উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে, তাঁদের যে কোন দু'জন ছিলেন এ কাজের বীর। অবশ্য নাম পরিচয়ের এই গরমিল বড় কথা নয়। এ গরমিল অনুবাদের ভুল থেকেও আসতে পারে। দু'জন তরুণ কিশোর আনসার ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে আল্লাহর দুশমন আবু জাহলের হত্যাকার্য সাধন করেছিলেন, এটাই গুরুত্বের ব্যাপার।

আবু জাহল ছিল মক্কার কোরাইশ গোত্রের মাখযুম পরিবারের একজন ধনী ও পরাক্রান্ত ব্যক্তি এবং হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রায় সমবয়স্ক। মক্কার অভিজাতের মধ্যে আল্লাহর রসূলের প্রতি বিদ্বেষে হযরতের আপন চাচা কোরআন-নিন্দিত আবু লাহাব ছাড়া তার মত প্রতিজ্ঞাকৃত জাতশত্রু আর কেউই ছিল না। অনেকবারই সে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দৈহিকভাবে আক্রমণের চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রতিবারই অলৌকিক কিছু দেখে আল্লাহর হস্তক্ষেপে ব্যর্থকাম

হয়েছে। এসব দেখেও তার জড়চিত্ত চেতনা বা সত্যজ্ঞানের কোন উন্মেষ ঘটেনি। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার মৃতদেহ দেখে তাকে তার জাতির ফেরাউন বলে অভিহিত করেছিনে বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। মিসরত্যাগকারী হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদলকে ধরতে যেয়ে হঠকারী ফেরাউন যেমন নিধনপ্রাপ্ত হয়েছিল, আবু জাহলও তেমনি মদীনায় হিজরতকারী হযরত মহানবী (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করতে বদর প্রান্ত পর্যন্ত এসে অকল্পনীয়ভাবে নিধন হয়েছিল। আল্লাহর দুই দুশমনের পরিণতির শোচনীয় মিল দেখেই হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্ভবতঃ তাঁর এই তাৎপর্যপূর্ণ তুলনামূলক উক্তি করেছিলেন।

হতভাগ্য এই লোকটি আল্লাহর নবীর নবুয়তের শত পরিচয় পেয়েও তাঁকে স্বীকার করতে পারেনি উৎকট গোত্রাভিমানের কারণে। হাশেমী পরিবারের মর্যাদার পাল্লা ভারী করে দেবে, এই ভাবনা আবু জাহলকে বিরত রেখেছিল তাঁকে নবী বলে স্বীকার করতে। কোন যুক্তির ব্যাপার-এর মধ্যে ছিল না। সূর্যোদয়কে তো লাঠিপেটা করে ঠেকানো যায় না। তাই আবু জাহল না চাইলেও ইসলামের সূর্য ঠিকই উঠেছিল।

হযরত মহানবীর প্রতি শত্রুতাচরণে সে রকম করেনি। তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের উপর নির্যাতনের প্রায় প্রত্যেকটাতেই তার সক্রিয় হাত ছিল। হিজরতের অব্যবহিত আগের রাতে হযরতকে হত্যা করার যে মহাপরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেটা ছিল তারই মগজ-প্রসূত। পরিকল্পনাটা এরকম ছিল যে, প্রত্যেক গোত্র একজন করে শক্তিশালী যুবক যোদ্ধা দেবে এবং তাদের প্রত্যেককে একখানা তীক্ষ্ণধার তরবারি দেয়া হবে। সকল যোদ্ধা তারপর সন্ধ্যা থেকে সকাল পযন্ত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করবে এবং তিনি বের হলেই তারা একযোগে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। কিন্তু যেহেতু হত্যার দায় পড়বে সকল গোত্রের উপর, তাই মুহাম্মদের গোত্র কোন প্রতিশোধ নিতে পারবে না। এর জন্য যদি শোণিতপণ দিতে হয়, সকল গোত্র তা ভাগ করে দেবে বলেও স্থির হয়েছিল।

আল্লাহ সব পরিকল্পনাকারীর শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী, তাই তিনি আবু জাহলের পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছিলেন। আল্লাহর পাঠানো ইঙ্গিতে হযরত আলী (রাঃ)কে তাঁর বিছানায় শুইয়ে রেখে হযরত মহানবী (সাঃ) সূরা ইয়াসীনের প্রথম নয়টি আয়াত পড়ে সব যোদ্ধার মাথায় মাটি দিয়ে তাদের চোখের সামনে দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহর কালামের মধ্যে ছিল 'ওদের দৃষ্টির উপর আবরণ রেখেছি, ফলে তারা দেখতে পায় না।' (৩৬ ঃ ৯) আবু জাহলের দৃষ্টির উপর আবরণ ছিল

আমরণ বিস্তৃত, তাই সত্যকে দেখার ভাগ্য তার হয়নি। তার পুত্র ইকরামার ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিল অবশ্য মক্কা বিজয়ের পরে এবং তিনি একজন বিশ্বস্ত সাহাবা হয়েছিলেন।

আবু জাহলকে নিয়ে এত কথা বলা হল মু'আজ ও মু'আব্বাজ নামের সেই ক্ষণজন্মা দুই কিশোর বীর তাকে সংহার করে ইসলামের ভবিষ্যতের জন্য কত বড় অবদান রেখেছিলেন তার উপলব্ধির জন্য। মহান আল্লাহ তাঁর মনোনীত মুহূর্তে এই দুই অকুতোভয় দামাল বীরকে রণাঙ্গনে আবির্ভূত করে তাঁর দুশমনকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে অপসারণের ব্যবস্থা করেছিলেন। আবু জাহল তখন নিধন না হলে কি হতে পারত তা ভাবা যেতে পারে। বেঁচে থেকে সে আরো শত্রুতা সাধন করত, পরবর্তী যুদ্ধগুলোর ইতিহাস হয়ত অন্য রকম লিখিত হত, মক্কা বিজয় হয়ত সম্ভব হত না, কিংবা বিলম্বে হত। আরো কিসব পরিণতির উদ্ভব হতে পারত তা আল্লাহই জানেন।

দুঃখের বিষয়, এই বীরদ্বয়ের পরবর্তী জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, মহান আল্লাহ তাঁদেরকে মহৎ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। আবু জাহল হযরত রসূলুল্লাহকে মন্দ বলে এই ব্যথায় ব্যথিত হয়ে দুই বীরপুরুষ আপন প্রাণ তুচ্ছ করে তার সংহার সাধন করে মহানবীর জন্য যা করেছিলেন, সেই একটিমাত্র কীর্তিই তাঁদেরকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে যথেষ্ট। আল্লাহর নবীর জন্য কতখানি মহব্বত থাকলে এমন অমিত বিক্রমে দুর্ধর্ষ একজন কাফের নেতাকে হত্যায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়, বিমুগ্ধচিত্তে তা ভাবা যেতে পারে। তাঁদের একজন হযরত মু'আব্বাজ (রাঃ) নবীর প্রেমে আত্মবিস্মৃত হয়ে যুদ্ধ নিয়ে বাকী জীবন কাটিয়েছিলেন। একথা স্মরণ হতে মন আনন্দে ভরে উঠে।

বদর যুদ্ধের মহান বীরদের মর্যাদাই আলাদা। মহান আল্লাহই তাঁদেরকে অধিক পুণ্য দান করে ভিন্ন মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। বীর-কেশরী হযরত হামজা (রাঃ), শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) প্রমুখ অবিস্মরণীয় বদর বীরদের সঙ্গে এই দুই বীরও অবিস্মরণীয়। আজও যেন মনে হয়, যেখানেই যখন কেউ ইসলামের নবীর নিন্দা করে বা তাঁকে মন্দ বলে, সেদিনের এই যুগল বীরের বিদ্রোহী পুণ্যময় আত্মা যেন বাজপাখীর মত রুদ্ররোষে তার সংহারে ছুটে যাচ্ছে। সকল যুগের মুসলমান তরুণদের জন্য তাঁরা মহান দুঃসাহসিকতার আদর্শ হয়ে থাকবেন।

ইসলামের মহান মুজাহিদ ইমাদুদ্দীন জঙ্গী (রহ.)

বিদ্বেষী খৃস্টজগতের অবিস্মরণীয় আতংক

খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে ৪৯১ হিজরীতে খৃস্টানরা তাদের ধর্মান্ধতা, মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ, কুসংস্কার এবং সকল বর্বরতা নিয়ে এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাদের লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড, ভয়াবহ ধ্বংসলীলা, নিষ্ঠুর পাশবিক নির্যাতন ইতিহাসে সৃষ্টি করেছে এক কলঙ্কময় অধ্যায়। যে সময়টা তারা বেছে নিয়েছিল সে সময়টা ছিল মুসলিম জাহানের জন্য বড় দুর্দিন। বড় দুঃসময়।

শতধা বিচ্ছিন্ন অন্তর্কলহে লিপ্ত মুসলিম জাহানের নামমাত্র আব্বাসীয় খলিফা ছিলেন শক্তিহীন। বিভিন্নস্থানে গড়ে উঠা নতুন নতুন স্বাধীন রাজ্যগুলোর শাসনকর্তাদের সনদ, উপাধি ও অনুমোদন দান এগুলোই ছিল তাঁর প্রধান কাজ।

প্রথমদিকে ইসলামের যে দুই বীর সৈনিক ধর্মান্ধ খৃস্টানদের বর্বর আক্রমণের গতিরোধ করেছিলেন, তারা হলেন ইমাদুদ্দীন জঙ্গী এবং নূরুদ্দীন মাহমুদ। একজন পিতা অপরজন পুত্র।

সেলজুক বংশের মহান সুলতান মালিক শাহের রাজত্বের শেষভাগে আবির্ভাব ঘটে একটি ভয়ঙ্কর গুপ্তঘাতক দলের। এদের মতবাদ ছিল প্রচলিত সবকিছুতে অবিশ্বাস। আসলে এটা একটা রক্তপাতকারী সংঘ। এরা চাইল প্রচলিত শাসন কর্তৃত্বের ধ্বংস সাধন করা। বিষ এবং ছোরা নিয়ে এরা মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ লোকদের পিছু নিল। ফলে নিহত হলেন সেলজুক সুলতান আল-আর-সালামের এবং তৎপুত্র মালিক শাহের বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী প্রশাসক এবং সিয়ামতনামার লেখক নিজামুল মূলক। অথচ নিজামুল মুলক এবং এই গুপ্তঘাতক দলের প্রতিষ্ঠাতা হাসান সাব্বাহ ছিলেন মিসরের ফাতেমী খলিফাদের অনুগত। ফাতেমীয় খলিফাগণ তাকে প্রাচ্যের দূত নিযুক্ত করেছিলেন এবং ক্ষমতা দিয়েছিলেন লোকদের শিয়া ইসমাইলী মতবাদে দিক্ষিত করতে। এটা ছিল একটা গোপন রক্তপাতের ভ্রাতৃসংঘ।

মাজেন্দ্রান পর্বতশ্রেণীতে অবস্থিত দুর্ভেদ্য আলামুত দুর্গটি কিছু শক্তি প্রয়োগে, কিছু বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে হাসান সাব্বাহ দখল করে নেন। সেখান থেকে তিনি আক্রমণ পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠিত সমাজ এবং মানীগুণী নেতাদের উপর। তাই তার আরাধ্য কাজ শেষ করে যেতে পারেননি।

১০৯১ সালে হাসান সাব্বাহর ঘাতকদের একজনের হাতে নিহত হন নিজামুল মুল্‌ক। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল আথির তাঁর সম্বন্ধে বলেন, 'তাঁর মহৎ গুণাবলী

এবং ন্যায়পরায়ণতার জন্য ছোট-বড় সকলেই তাঁকে ভালবাসত।' মালিক শাহের মৃত্যুর পর অবসান ঘটে সেলজুক সাম্রাজ্যের ঐক্য এবং গৌরবের। ইরাক এবং খোরাসান নিয়ে তাঁর পুত্রদের মধ্যে বিরোধ ঘটে। ফলে হাসান বিন সাব্বাহ তার উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা কার্যকরী করতে সুযোগ পেয়ে যান।

হাসান সাব্বাহ এবং তার গুপ্তঘাতক দল উত্তর পারস্য, ইরাক ও সিরিয়ার শক্তিশালী দুর্গগুলো ধীরে ধীরে দখল করে নেয়। সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশে স্থানীয় সাসান শাসনকর্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তাদের মধ্যে দেখা দেয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিরোধ।

আল্‌প আর সালান তার জ্ঞাতি ভাই সুলাইমানকে দিয়েছিলেন এশিয়া মাইনর আর মালিক শাহ্ তার ভাই তুতুশকে দিয়েছিলেন সিরিয়া। তাঁরা উভয়েই সুলতানের সার্বভৌমত্ব মেনে চলতেন। এ দুটো রাজ্য ছাড়াও মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইন কিছুসংখ্যক সামন্ত রাজাদের দেয়া হয়েছিল। তাদের একমাত্র কর্তব্য ছিল সুলতানকে সামরিক প্রয়োজনে সাহায্য করা। নিজামুল মুল্‌কের প্রতিভা এবং মালিক শাহের বিরাট ব্যক্তিত্ব প্রভাব ফেলেছিল সমগ্র সাম্রাজ্যে। সকল রাজপুরুষ এবং শাসনকর্তা সুলতানকে জানাত আনুগত্য এবং শ্রদ্ধা। তাদের মৃত্যুর পরই অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বিরোধের বিষবাষ্পে ছেয়ে গেল সেলজুক সাম্রাজ্য।

সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়ার শাসকগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত হয়ে পড়ল। আলেপ্পোর শাসনকর্তা ছিল বিশ্বাসঘাতক। অন্যরা যদিও মৌখিক আনুগত্য জানাত, তবু তারা নিজেদের স্বর্থোদ্ধারেই ছিল অধিকতর তৎপর। জাতীয় কল্যাণ ছিল তাদের কাছে গৌণ।

মিসরের ফাতেমীয় খেলাফতের অধীন ছিল সিরিয়ার সমুদ্রপোকূল এবং প্যালেস্টাইন। কিন্তু ফাতেমীয় খেলাফতে গোলযোগ-বিশৃংখলার ফলে খৃস্টানদের আক্রমণের মুখে ঐ সমস্ত এলাকার শহরগুলোকে সাহায্য করা দুরূহ এবং অসম্ভব হয়ে পড়ল।

মুসলিম জাহানের অরাজকতার সুযোগে খৃস্টানরা ঝাঁপিয়ে পড়ল পশ্চিমের মুসলিম অঞ্চলগুলোর উপর। উদ্দেশ্য চারশ' বছরে যে সমস্ত অঞ্চল মুসলমানদের কাছে হারিয়েছে সেগুলো পুনরুদ্ধার করা।

খৃস্টান ইতিহাসে এই বর্বর ধর্মোন্মাদনার ঝড়কে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'ধর্মযুদ্ধ'রূপে। খৃস্টানরা তাদের সমস্ত বর্বরতা নিয়ে আপতিত হলো পশ্চিম এশিয়ার উপর। ইউরোপীয় ইতিহাসে এই ধর্মযুদ্ধকে বর্ণনা করা হয়েছে মহিমান্বিত বীরত্বের কাহিনীরূপে এবং এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্য এবং নাইটদেরকে প্রচার করা হয়েছে বীরত্বের আদর্শরূপে। কিন্তু এ ছিল নিষ্ঠুরতা, পাগলামী, বর্বরতা আর অসভ্যতার উপাখ্যান।

প্রথম আক্রমণে খৃষ্টানরা সাফল্য লাভ করে। নিস এবং এন্টিওকসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করে নেয়। জেরুসালেম দখল করে নেয় ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে। গডফ্রেকে বানানো হয় জেরুসালেমের রাজা। তার উত্তরসূরি বালডুইন সিজারিয়া অবরোধ করে। বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের পর মুসলিম বাহিনী আত্মসমর্পণে রাজি হয়। তারা খুলে দেয় শহরে প্রবেশের দরজাগুলো। কিন্তু খৃষ্টানরা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। সন্ধির শর্তের প্রতি কোন সম্মান দেখায়নি। শহরে প্রবেশ করে নির্বিচার এবং নির্মমভাবে হত্যা করল নিরস্ত্র এবং অসহায় লোকদের। কম বেশি একই ভাগ্যবরণ করল ত্রিপলী, টায়ার এবং সিডন।

খৃস্টান ধর্মযোদ্ধারা দখল করতে লাগল শহরের পর শহর, ধ্বংস করতে লাগল দেশের পর দেশ আর সেখানকার অধিবাসীদের হত্যা করতে লাগল নির্বিচারে অথবা পরিণত করল দাস হিসেবে। এ অবস্থা চলে আসছিল দীর্ঘসময় ধরে। অবশেষে আবির্ভূত হলেন ইমাদুদ্দীন জঙ্গী মোজাহিদের বেশে। গতিরোধ করলেন বর্বর খৃস্টান আক্রমণকারীদের।

ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ছিলেন মহান সুলতান মালিক শাহের উচ্চপদস্থ দক্ষ কর্মচারীদের অন্যতম আক-সুক্কুরের পুত্র। তাঁর উপাধি ছিল কাসিমউদ্দোলা। তিনি মালিক শাহের মৃত্যুর পর উদ্ভুত এক গোলযোগপূর্ণ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আক সুক্কর যখন ইন্তেকাল করেন ইমাদুদ্দীন তখন ১৪ বছরের বালক। এই বয়সেই পিতার পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য আক-সুক্করের অনুগত কর্মচারী ও অধীনস্ত পোষ্যরা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন। অল্প বয়সেই ইমাদুদ্দীনের চরিত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল দুর্জয় ইচ্ছাশক্তি, বিপুল চারিত্রিক বল, উচ্চমানের প্রশাসনিক এবং সামরিক দক্ষতা। সুলতান সেলজুক সুলতান মাহ্‌মুদের নিকট থেকে ওয়াসিত শহরটি জায়গীর হিসেবে পেয়েছিলেন এবং বসরায় সুলতানের প্রতিনিধি হিসেবে উচ্চ রাষ্ট্রীয় পদে নিযুক্ত হন। চার বছর পর মসুল এবং ইত্তর ইরাকের প্রশাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় তাঁর উপর। তাঁকে উপাধি দেয়া হয় আতাবেক। তাঁর এই উপাধি এবং মর্যাদা বাগদাদের খলিফা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মসুলের আতাবেকগণের দীর্ঘ এবং মর্যাদাবান ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল আতিব এই সময়ের মুসলমানদের দুর্বলতা এবং খৃস্টানদের শক্তি সম্বন্ধে এক বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'তাদের সৈন্য ছিল অনেক। তাদের হিংস্রতা দিন দিন বেড়ে চলছিল। তারা তাদের ঘৃণ্য দুষ্কর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল। সে জন্য তাদের শাস্তির ভয় ছিল না। তাদের অধিকৃত অঞ্চলের বিস্তৃতি ছিল উত্তর ইরাকের মারিদিন থেকে মিসর সীমান্তের আরিশ শহর পর্যন্ত। হাররাম এবং রাক্কা চরম দুর্দশায় নিপতিত হলো। তারা ধ্বংসকার্য চালিয়ে গেল নিসিবিনের দ্বার পর্যন্ত। রাহ্‌বা হয়ে মরুভূমির মধ্যদিয়ে যে রাস্তাটি নিয়েছে সেটি ব্যতিত দামেস্কে যাওয়ার সমস্ত রাস্তাগুলোই

বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। অগণিত শহর থেকে তারা খাজনা আদায় করত। এমনকি ভয় দেখিয়ে আলেপ্পো শহরের অর্ধেক রাজস্ব কুক্ষিগত করত। আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী অথবা নাস্তিক কাউকে তারা রেহাই দিত না।'

ইমাদুদ্দীন জঙ্গী প্রসাশনকে আরও কার্যকর এবং সেনাবাহিনীকে সুসংগঠিত করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। অবশেষে মেসোপটেমিয়া থেকে অত্যাচারী খৃস্টান ফ্রাঙ্কদের তাড়ানোর জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যথেষ্ট সৈন্য পাঠাতে সক্ষম হলেন। মেসজি এবং বুজা জয় করার ফলে তিনি মুসলমান এলাকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসকরূপে পরিগণিত হলেন। খৃস্টান ধর্মযোদ্ধাদের অত্যাচার এবং লুটতরাজ থেকে রক্ষার জন্য আলেপ্পোর অধিবাসীদের আমন্ত্রণে তিনি আলেপ্পো জয় করে নেন। হাম্মাহ শহরও আলেপ্পোকে অনুসরণ করল। পরবর্তী বছরে জঙ্গী আল-আশরিবে খৃস্টানদের পরাজিত করেন এবং তীব্র প্রতিরোধের মুখে দুর্গটি দখল করে নেন। এডেসার খৃস্টান শাসক জোসেলিনের সঙ্গে তাঁদের অস্থায়ী সন্ধি হয়। তার ফলে তিনি সময় পেয়েছিলেন সুলতান মাহ্‌মুদের মৃত্যুর পর যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, সেখানে অংশ গ্রহণ করতে। কিন্তু এ নিয়ে তিনি বেশিদিন ব্যস্ত থাকেননি। তাঁর জন্য বড় কাজ অপেক্ষা করছিল সিরিয়াতে। খৃস্টানদের মধ্যে আবার যুদ্ধোন্মদনা দেখা দিল। ইউরোপ থেকে আরও বহু সৈন্য এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল।

সম্রাট জন কামেনাসের ব্যক্তিগত পরিচালনায় একটি গ্রীক সৈন্যদল এসে উপস্থিত হলো। তারা বুজা দখল করে সকল পুরুষ অধিবাসীদের নিক্ষেপ করল তরবারির মুখে। স্ত্রীলোক এবং শিশুদের করল বন্দী। তারপর হাম্মাহ্ থেকে একদিনের পথ শাইজার দিকে এগিয়ে গেল।

শাইজার দুর্গটি ছিল খুব সুরক্ষিত এবং প্রায় দুর্ভেদ্য। পর্বতের উপর নির্মিত এই দুর্গটিতে যাওয়ার একটি মাত্র ঘোড়ায় চলা রাস্তা ছিল। আর এই রাস্তাটি তৈরি করা হয়েছিল পর্বতের পার্শ্বদেশ কেটে। সেই সংকীর্ণ পথটি পর্বতের উপর একটি কাঠের সেতু পেরিয়ে দুর্গের দিকে এগিয়ে গেছে। সেতুটি ভেঙ্গে ফেললে কিংবা সরিয়ে দিলে দুর্গে পৌঁছা যেত না। পঞ্চম হিজরীর প্রারম্ভ থেকে কেনানার আরব গোত্র বনু মুনকিজ এই দুর্গটির এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মালিক ছিল। এর সুরক্ষিত অবস্থান হাম্মাহ্ এবং ধর্মযুদ্ধের কেন্দ্রগুলোর সন্নিকটে অবস্থিতির ফলে দুর্গটি খৃস্টান এবং মুসলমান উভয়ের নিকট ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

দুর্গের তৎকালীন অধিপতি আবু আসাকির সুলতানের সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে আতাবেক জঙ্গী দ্রুত এগিয়ে গেলেন খৃস্টানদের থেকে দুর্গটি রক্ষার জন্য। জঙ্গীর আগমনের ফলে খৃস্টান, ফ্রাঙ্ক এবং গ্রীকরা অবরোধ উঠিয়ে পিছু হটে গেল। গ্রীকরা ফিরে গেল তাদের দেশে। আতাবেক এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। তিনি ত্রিপলীর খৃস্টান শাসনকর্তার এলাকায় অবস্থিত আর্কাদুর্গটি দখল করে মাটির

—২

সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। বালবেক অঞ্চলটি দখল করে নাজমুদ্দীন আইয়ুবের অধীনে ন্যস্ত করেন। নাজমুদ্দীন আইয়ুব ছিলেন বিখ্যাত ধর্মযোদ্ধা সুলাজুদ্দীনের পিতা। সিরিয়া ছিল স্বাধীন শাসনকর্তার অধীন। তাই সেখান থেকে ফ্রাঙ্কদের বিতাড়িত করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

৫৩৪ হিজরীতে বারিসের সন্নিকটে ফ্রাঙ্কদের আক্রমণ করে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। এটাই ছিল খৃষ্টান ধর্মযোদ্ধাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ। এ দুর্গকে কেন্দ্র করে তারা হাম্মাহ এবং আলেপ্পো মধ্যবর্তী এলাকায় লুটতরাজ চালাত। ৫৩৯ হিজরী সালে এডেসা দখলই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় বিজয়। এই এডেসা ছিল ফ্রাঙ্কদের বীর এবং দৈত্য বলে আখ্যায়িত দ্বিতীয় জোসেলিনের অধীন। প্রকৃতপক্ষে এ ছিল এক বড় বিজয়। এডেসাকে খৃষ্টানরা তাদের পবিত্রতম শহরগুলোর অন্যতম মনে করত। কারণ, বিশপ এলাকা বলে পরিচিত ছিল এগুলো। জেরুজালেম ছিল এগুলোর মধ্যে প্রধান। জেরুজালেমের পর মর্যাদার ক্রমানুসারে এন্টিওক, রোম, কনস্টান্টিনোপল এবং এডেসার স্থান। এডেসাকে মেসোপটেমিয়ার চক্ষু বল গণ্য করা হত। এডেসা তাদের দখলে ছিল বলে এর আশপাশের অঞ্চলগুলো বিধ্বস্ত করতে পারত এবং দখলে রাখতে পারত শক্তিশালী দুর্গগুলো। জঙ্গী যখন শহরটি দখল করতে অগ্রসর হন, তখন তিনি তাদের জীবন এবং সম্পত্তির নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু অধিবাসীরা আত্মসমর্পণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, তখন জঙ্গী তা আক্রমণ করে দখল করে নেন। এর পূর্বে খৃষ্টানরা জেরুজালেম এবং এন্টিওক শহর দখল করে মুসলমানদের যে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল, জঙ্গী চেয়েছিলেন তার প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু তাঁর মানবতাবোধ তাঁকে বাধা দিল। যোদ্ধার এবং যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল তারা ছাড়া আর কাউকে হত্যা করা হয়নি। নারী-পুরুষ-শিশু যারা বিজয়ীদের হাতে পড়ল তাদের মুক্তি দেয়া হলো। তাদের মালামাল করুণার বশবর্তী হয়ে ফিরিয়ে দেয়া হলো। সেখানে এক শক্তিশালী সেনাদল রেখে জঙ্গী আরও বিজয়ের পথে অগ্রসর হল। তিনি সেরুজ, আরবিড়া এবং খৃষ্টানদের আরও কতগুলো দুর্গ জয় করেন। যখন কালাতজাবির অবরোধে লিপ্ত ছিলেন, তখন ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর কয়েকজন ক্রীতদাস সৈনিক কর্তৃক নিহত হন। ৫ই রবিউল আউয়াল ৫৪১ হিঃ মোতাবেক ১৪ই সেপ্টেম্বর ১১৪৬ খৃষ্টাব্দে এই দুষ্কৃতির উস্কানি দিয়েছিল তাঁর শত্রুরা। এভাবেই অবসান হলো সে যুগের ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৈনিকের জীবন। ন্যায়পরায়ণ, উদার, বিজ্ঞ আতাবেক ইমাদুদ্দীন জঙ্গী তাঁর জনগণের নিকট ছিলেন পিতার মত।

যখন তিনি মেসোপটেমিয়ার শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন, তখন মেসোপটেমিয়া এবং সিরিয়ার অনেক জায়গা ছিল অনাবাদী। চাষীরা এবং শহরের

অধিবাসীরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ফ্রাঙ্কদের লুটতরাজের ফলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। জঙ্গী বহু প্রয়াস করেছিলেন কৃষিকাজ পুরুজ্জীবিত করতে এবং সমৃদ্ধির পথে দেশকে ফিরিয়ে আনতে। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে কৃষকরা ফিরে এসেছিল ক্ষেত-খামারে। শহরগুলো নতুন করে নির্মাণ এবং সুশোভিত করা হয়েছিল।

বিশৃংখলা এবং রাহাজানি দমন করা হয়েছিল কঠোর হস্তে। ফ্রাঙ্কিশ লুটেরা এবং খুনীদের তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল সমুদ্র উপকূলে। ফলে নতুন করে শুরু হয়েছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। মহিলাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তাদেরকে কেউ অপমান বা অত্যাচার করলে কঠোর শাস্তি দিতেন। তিনি দান করতেন মুক্তহস্তে। প্রতি শুক্রবারে প্রকাশ্যে দান করতেন একশ' দিনার। অন্যান্যদিন গোপনে বিপুল অর্থ দান করতেন তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারীদের মাধ্যমে। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত বন্ধু এবং সুবিবেচক প্রভু। যুদ্ধ শিবিরে তিনি ছিলেন কঠোর শৃংখলা বিধানকারী। তাঁর প্রশাসন এবং সম্পদের প্রাচুর্য, দ্রুত কর্ম সম্পাদন, কর্মচারীর সংখ্যা সুলতানের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

তিনি ছিলেন বিদ্বান ব্যক্তিদের বন্ধু। তাঁর উজীর কামালউদ্দীনের উপনাম ছিল আলজাওয়াদ (উদারতা)। তিনি জঙ্গীকে যেমন সরকারী কাজকর্মে সাহায্য করতেন, তেমনি জ্ঞান বিস্তারের পৃষ্ঠপোষকতায়ও সহযোগিতা করতেন। জামালউদ্দীন রাজ্যের ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন। জামালউদ্দীনের আসল নাম আবু জা'ফর মোহাম্মদ। তিনি অনেক জনহিতকর কাজ করে গেছেন। তিনি অনেক দূর থেকে দীর্ঘ পাকা প্রণালী নির্মাণ করেছিলেন। এই পাকানালা দিয়ে হজ্জের সময় আরাফাতে পানি সরবরাহ করা হত। পর্বতের পাদদেশ থেকে শীর্ষ পর্যন্ত সিঁড়ি এবং পবিত্র মদীনা শহরের চতুর্দিকে দেয়াল নির্মাণ করেছিলেন। প্রতি ১২ মাস অন্তর মক্কা ও মদীনার গরীব এবং দুর্দশাগ্রস্ত লোকের জন্য পাঠাতেন প্রচুর অর্থ এবং কাপড়-চোপড়, যা তাদের এক বছরের প্রয়োজন মেটাবার জন্য ছিল যথেষ্ট। যাদের ভাতা বরাদ্দ করা হয়েছিল অথবা যারা আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিল তাদের জন্য একটা তালিকা তৈরি করেছিলেন। মসুলে যখন একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তখন জামালউদ্দীন সেখানকার মানুষ-এর কষ্ট লাঘবের জন্য তার সব সম্পদ দান করে দিয়েছিলেন। ইমাদুদ্দীন জঙ্গী নিজের সম্বন্ধে বলতেন, তিনি বেশি পছন্দ করেন রেশমের বিছানার চেয়ে ঘোড়ার জিন। মধুর সঙ্গীতের চেয়ে যুদ্ধের কোলাহল। প্রিয়ার মধুর ভাষণের চেয়ে অস্ত্রের ঝনঝনানি। ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ করে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের ইতিহাসে ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ইসলামের একজন নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক হিসাবে রেখে গেছেন এক অম্লান স্বাক্ষর। যুগে যুগে তা থাকবে দীপ্তিমান।

খোদাদত্ত ঐশী ডানায় ভর করে জান্নাতের বাগিচায় উড়ে বেড়ানো এক সম্মানিত মুজাহিদ সাহাবী

ইসলামের এক জেহাদে একের পর এক দু'খানা বাহু হারিয়ে শাহাদতবরণ করে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন একজন সম্মানিত সাহাবী এবং জান্নাতবাসী হয়ে আল্লাহর নিকট থেকে দু'খানা হাতের বদলে পাখির মত দু'খানা ডানা লাভ করে, তাই দিয়ে তিনি ফেরেশ্‌তাদের মত উড়ে বেড়ান। হযরত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তিনি স্বরূপে ধরা দিয়েছেন। এ মহাভাগ্যবান সাহাবী আর কেউ নন– হযরত প্রিয় নবীর চাচাত ভাই এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হযরত জা'ফর (রাঃ)। মরণোত্তর ডানাবিশিষ্ট হয়ে জান্নাতে উড়ে বেড়ানোর কারণে তিনি 'তাইয়ার' খেতাবে অভিহিত।

অবিস্মরণীয় যে ঘটনা তাঁকে এ সম্মানের খেতাব এনে দিয়েছে তার বর্ণনার পূর্বে তাঁর পুণ্যময় জীবনের আরো কিছু মূল্যবান ঘটনার উল্লেখ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি ছিলেন হযরত রাসুল-ই করীম (সাঃ)-এর পিতৃব্য আবু তালিবের ১৪ জন পুত্র-কন্যার অন্যতম এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আবু তালেবের পুত্রগণের মধ্যে এ দু'জনই ছিলেন সবচেয়ে ছোট এবং প্রিয় নবীর আপন কোন ভাই না থাকায় তারাই ছিলেন তাঁর প্রিয়তম ভ্রাতৃস্থানীয়। আবু তালিব কোরাইশদের গোত্রের প্রধান হলেও তাঁর ছিল অনটনের সংসার। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাদা আবদুল মোত্তালিবের মৃত্যুর পর থেকে চাচা আবু তালিবের গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। বিবি হযরত খাদিজার সাথে বিবাহের পরে হযরতের কোন অসচ্ছলতা না থাকায় অভাবগ্রস্ত চাচার বোঝা লাঘব করণার্থে তার ধনাঢ্য অন্য চাচা হযরত আব্বাসকে প্রস্তাব দেন যে, তারা দু'জনে আবু তালিবের দুই পুত্র পালনের দায়িত্ব নিবেন। হযরত আব্বাস সম্মত হওয়ায় তিনি নিলেন হযরত জা'ফরকে এবং মহানবী (সাঃ) নিলেন হযরত আলীকে। হযরত জা'ফরের বয়স তখন এগার কিংবা বার বছর এবং আলীর আট কিংবা নয়।

হযরত জা'ফরের যৌবনকালে ইসলামের খেদমতে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল আবিসিনিয়ার হিজরত এবং সেখানে ইসলামের জন্য মুল্যবান ভুমিকা পালন। পঞ্চম হিজরী সনে হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-এর নেতৃত্বে প্রথম হিজরতকারী ১৬ জনের দলের পরে ৮৩ জনের যে বৃহত্তর দল হাবশায়

গিয়েছিলেন, তার নেতৃত্বে ছিলেন হযরত জা'ফর (রাঃ)। হযরত মহানবী হযরত জা'ফরের হাতে হাবশা অধিপতি আসহামা নাজ্জাশীর বরাবরে তাঁকে ইসলামের দাওয়াত জানিয়ে এবং মুসলিম মুজাহিরদেরকে সাদরে গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে একখানা পত্র দিয়েছিলেন।

মুসলমানদের হাবশায় হিজরতের সংবাদে মক্কার কোরাইশরা কুপিত হয়ে তাদেরকে ফেরত আনার জন্য আমর ইবনুল আ'স এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবি রাবিয়া নামক দু'জন চতুর ব্যক্তিকে হাবশা সম্রাটের কাছে পাঠিয়েছিল। তারা সম্রাটের কাছে মুহাজিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হলে সম্রাট মুহাজিরদের তলব করে তাঁদের কৈফিয়ত জানতে চান। মুহাজির দলের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন হযরত জা'ফর (রাঃ) এবং তিনি তাঁর স্বাভাবিক তেজস্বী ভাষায় সম্রাটের কাছে যথাযোগ্য জবাব দিয়ে তাঁর হৃদয় জয় করেছিলেন। কোরায়শ প্রতিনিধিরা এরূপ কথা বলে সম্রাটকে তাঁদের প্রতি বিরূপ করতে সচেষ্ট হল যে, তারা হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর মাতা সম্পর্কে বিকৃত ধারণা পোষণ করে। সম্রাট ইসলাম কি এবং মেরী-মাতা এবং প্রভু যীশু সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য কি তা জানতে চাইলে হযরত জা'ফর শান্ত ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় সকল সত্য সফলভাবে পেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের নবীর প্রতি যে কালাম নাজিল করেছেন, সম্রাট তার কিছু অংশ শুনতে চাইলে জা'ফর সূরা মরিয়মের সমধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের কয়েকটি আয়াত সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করে শুনান।

হযরত জা'ফরের আবৃত্তি শুনে সম্রাটসহ দরবারের অনেকের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। অশ্রুধারা সম্রাটের গণ্ডদেশ ছড়িয়ে তাঁর দাড়ি পর্যন্ত আর্দ্র করে দিল। সকলকে শুনিয়ে নিম্নস্বরে তিনি মন্তব্য করলেন ঃ "নিঃসন্দেহে এরা সত্যপথাবলম্বী; হযরত ঈসা (আঃ) যে পয়গাম নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন, এরাও সেই একই সত্যের ধারক। এদেরকে আমি আমার দেশ থেকে বের করে দিতে পারি না; এরা এ দেশেই পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করবে।" কোরাইশ প্রতিনিধিদ্বয়কে ডেকে তিনি বললেন– "তোমরা আমার সম্মুখ থেকে দূর হয়ে যাও, তোমরা আমার রাজ্যের অকল্যাণ" তাদের আনীত উপঢৌকনও তিনি ফিরিয়ে দিলেন।

হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর হাতে হযরত মহানবী (সাঃ)-এর পত্র পেয়ে সম্রাট আসহামা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে দরবারের ধর্মযাজক ও পরিষদদের সংগে পরামর্শ করলেন। পাদ্রীরা হযরত মহানবীর পত্র সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য ও ভিন্নমত প্রকাশ করে চিৎকার শুরু করল। কিন্তু সম্রাট কারো কোন কথায় বা কারো

আপত্তির প্রতি কর্ণপাত না করে সিংহাসন থেকে নেমে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর সঙ্গে রাজ পরিবারের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ সভাসদগণেরও অনেকে ইসলামে দীক্ষিত হন।

সম্রাট আসহামার ইসলাম গ্রহণের ফলে খৃষ্টান ধর্মযাজকদের মধ্যে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। খৃষ্টান পাদ্রীরা রাজ-পরিবারের অন্য একজন সদস্যের সাথে ষড়যন্ত্র করে একটা মারাত্মক বিদ্রোহ সৃষ্টি করে। এ বিদ্রোহ সফল হলে প্রবাসী মুসলমানরাই সর্বাপেক্ষা বিপন্ন হবেন, এ ভাবনায় সম্রাট বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হওয়ার আগে যথাশীঘ্র দু'টি সমুদ্রগামী জাহাজ সংগ্রহ করে মুসলমানদের উপদেশ দিলেন, যুদ্ধের অবস্থা প্রতিকূল দেখলে তারা যেন জাহাজে অন্য কোথাও চলে যান। বীরসিংহ হযরত জা'ফর (রাঃ) সম্রাটের এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে গমন করেন। যুদ্ধে নাজ্জাশী বিজয়ী হয়ে ফিরে এলে তাঁর দেয়া সেই দু'টি জাহাজে করে প্রসাবীদের মধ্যস্থ হযরত মহানবী (সাঃ)-এর মাতুল হযরত আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওহাইব ইবনে আবদে মানাফ, আরো তিনজন প্রবাসী সাহাবা এবং স্থানীয় কয়েকজন মুসলমান সাথে নিয়ে চীনের উদ্দেশ্যে ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে গাড়ি জমিয়েছিলেন। মোটের উপর বলা যায়, আবিসিনিয়ায় মুসলিম মুহাজিরদের নিরাপদ অবস্থান, স্বয়ং সম্রাট ও কিছুসংখ্যক সভাসদসহ বহুলোকের ইসলাম গ্রহণ, ইসলামের কারণে উদ্ভুত বিদ্রোহ এবং উহার দমন, আর সেখান থেকেই চীনে ইসলাম প্রচারের জন্য একটা অভিযাত্রীদলের সমুদ্রযাত্রা ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যে হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বাক্ষ্য পাওয়া যায়।

হযরত মহানবী (সাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের পরে প্রবাসী মুসলমানগণ সরাসরি মদীনায় ফিরে আসতে থাকেন। খায়বার অভিযানে গমনের কিছুদিন পূর্বে হাবশা থেকে মুহাজিরদেরকে ফেরত আনয়নের জন্য একজন দূত প্রেরিত হয়েছিল। সদাশয় নাজ্জাশী তাঁদের স্বদেশ যাত্রার সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করে দিলে শেষ দলটি যথাসময়ে মদীনায় উপস্থিত হয়। হযরত জা'ফর (রাঃ) তাঁর বর্ণিত একটি হাদীসে বলেছেন– "আমরা মদীনায় পৌছলে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন আমাকে দেখলেন, তখন আমাকে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন ঃ আমি বলতে পরি না আমি খায়বার বিজয়ের জন্য বেশী আনন্দিত, না জাফরের পৌছার জন্য।" (শরহে সুন্নাহ) উল্লেখ্য যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেদিন কেবলমাত্র খায়বার বিজয় করে মদীনায় ফিরছেন। হযরত জা'ফরের সঙ্গে যারা ছিলেন হযরত নবীজী তাঁদেরকেও খায়বারের যুদ্ধ সম্পদের কিছু অংশ দান করেছিলেন। আবু দাউদ ও বায়হাকী বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জা'ফরের কপালে চুম্বনও করেছিলেন।

হযরত জা'ফর (রাঃ) সকল মুসলমানের মনে অমোচনীয় আসন করে নিয়েছেন পরবর্তী মূতা অভিযানে তাঁর অনন্য সাধারণ ভূমিকার জন্য। রোম সম্রাট-হিরাক্লিয়াসের এক লক্ষ সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলার জন্য হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাত্র তিন হাজার সৈন্য পাঠিয়েছিলেন এবং সিরিয়ার মূতা নামক স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অভিযানের নায়করূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন হযরতের প্রাক্তন ক্রীতদাস যায়েদ বিন্ হারিসা (রাঃ) পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাত্র একজনকেই সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করতেন, কিন্তু এবারে তিনি অন্যরকম ব্যবস্থা করলেন। যায়েদের স্থলবর্তী হয়ে সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি যথাক্রমে জা'ফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)-কেও পরবর্তী সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। যাতে একজনের পতনের পর পরবর্তীজন তাঁর স্থান নিতে পারেন। মহানবী (সাঃ) একথাও বলে দিলেন যে, যদি আবদুল্লাহ নিহত হন, সেক্ষেত্রে মুসিলম সৈন্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে যাকে যোগ্য মনে করেন তাঁকে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে নেবেন।

সুদূর ক্লান্তিকর পথ অতিক্রম করে মুসলিম বাহিনী সিরিয়া প্রদেশে উপস্থিত হলেন এবং সেখান থেকে জানতে পারলেন যে, তাদেরকে মোকাবিলার জন্য এক লক্ষ খৃস্টান সৈন্যের বাহিনী মাআন অঞ্চলে অপেক্ষা করছে। তাঁদের মাত্র তিন হাজার সৈন্য বাহিনী। এ রকম অবস্থায় কর্তব্য নির্ধারণের জন্য তাঁরা যাত্রা স্থগিত করে পরামর্শে প্রবৃত্ত হলেন। কেউ কেউ বললেন, "এ রকম অবস্থায় মদীনায় সংবাদ পাঠানোই প্রকৃষ্ট।" আবদুল্লাহ, বিন রাওয়াহা একথা সমর্থন করতে না পেরে তেজদৃপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন– "হে মুসলিম বীরবৃন্দ! এ কি রকম কথা বলছো তোমরা! যে সাফল্য অর্জনের জন্য বেরিয়েছিলে তা কঠিন দেখে তোমরা ভয় পেয়ে যাচ্ছ! শুধু জয়লাভই কি আমাদের কাম্য? শাহাদত কি আমাদের কাম্য নয়? সংখ্যার হিসাব মুসলমান কখনোই করে না। তাদের একমাত্র শক্তি আল্লাহ। বিজয়ী হতে পারি তো ভালো, আর শাহাদত লাভ হয় তো আরো ভালো। সুতরাং এত আলোচনা আর যুক্তি পরামর্শ কিসের জন্য?"

আবদুল্লাহ্র তেজদৃপ্ত উক্তি শুনে মুসলিম সৈন্যগণ উদ্দীপিত হয়ে উঠলেন। দুর্বলতা ও ভীরু চিন্তা মুহূর্তের মধ্যে কোথায় ভেসে গেল। সকলে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "আল্লাহর কসম! ইবনে রাওয়াহা সত্য কথাই বলছেন।" তিন হাজার মুসলিম সৈন্য আল্লাহর নামের ধ্বনি দিতে দিতে এক লক্ষ খৃস্টান সৈন্যের মোকাবিলার জন্য ধাবিত হলেন। মূতা নামক স্থানে উভয়পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হল।

সেনাপতি যায়েদ বিন হারিসা (রাঃ) দক্ষতার সঙ্গে সৈন্য বিন্যাস করে যুদ্ধে অগ্রসর হলেন। ইসলামের জয় পতাকা তিনি নিলেন নিজের হাতে। কিছুক্ষণ বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করার পর তিনি শাহাদত বরণ করলেন। তখন বীরবর হযরত জা'ফর বিন আবু তালিব (রাঃ) ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে গিয়ে সেই পতাকা তুলে নিলেন এবং সেনানায়কের দায়িত্ব নিয়ে অতুলনীয় বল বিক্রমের পরিচয় দিলেন। যুদ্ধ তখন চরম আকার ধারণ করেছে। তাঁর ঘোড়া আহত হলে তিনি দ্রুত তার উপর থেকে নেমে পড়লেন এবং পায়ে হেঁটে লড়াই চালাতে লাগলেন। অবশেষে তিনিও শাহাদত বরণ করলেন। ইসলামের ইতিহাসে হযরত জাফরের ঘোড়াই রণাঙ্গনে প্রথম আহত হয়। শত্রুর আঘাতে যখন হযরত জাফরের ডান বাহু কাটা যায়, তখন তিনি বাম হাতে ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখেন। যখন বাম বাহুও কাটা গেল, তখন তিনি বুকে চেপে ধরে ঝাণ্ডা উঁচু রাখলেন। এভাবেই তিনি শাহাদত বরণ করলেন। ত্রিশটি ক্ষতচিহ্ন গুনে পাওয়া গিয়েছিল তাঁর শরীরে।

অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) ঝাণ্ডা তুলে নিলেন। ঘোড়া থেকে নামতে তিনি ইতস্ততঃ করছিলেন, কিন্তু অবশেষে নেমে পড়লেন। তাঁর এক চাচাতো ভাই তাঁকে এক টুকরো গোশত দিয়ে বলল, "সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, একটু কোমরে শক্তি সঞ্চয় করে নিন।" গোশতখণ্ড হাতে নিয়ে তার কিছু অংশ দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিলেন। তখনি অপরদিকে মানুষের হৈ চৈ ও হাহাকার তাঁর কানে গেল। অমনি তিনি এ বলে গোশত খণ্ড ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, "তুই তো দুনিয়ার খাদ্য।" তারপর তিনি তরবারি ধারণ করে শত্রুর মাঝে এগিয়ে চললেন এবং প্রাণপণ লড়াই করে অবশেষে তিনিও শাহাদত বরণ করলেন। যায়েদ ইবনে আরকাম তখন ছুটে এসে পতাকা তুলে ধরলেন এবং সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন–"ভাইসব! যে কোন একজনকে তোমরা সর্বসম্মতিক্রমে নেতা করে নাও।" সবাই সমস্বরে তাঁকেই সেনাপতির দায়িত্ব নিতে বললে তিনি অস্বীকৃতি জানান এবং অতঃপর সকলে একমত হয়ে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ)-কে সেনাপতি নির্বাচিত করলেন। (যাদুল মা'আদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৪)

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ দৃপ্ত আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত বাহিনীর বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে গেল। সেদিনকার যুদ্ধের তখন প্রায় শেষাবস্থা। সৈন্যদেরকে আর হতাহত হতে না দিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে খালিদ তাদেরকে নিজ নিজ শিবিরে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন।

মদীনায় বসে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অলৌকিকভাবে মূতা'র রণাঙ্গনের সমস্ত দৃশ্য দেখছিলেন। আবু আমের আশআরী নামক একজন দূতকে পূর্বাহ্নেই তিনি

পাঠিয়েছিলেন। রণাঙ্গনের সংবাদ সংগ্রহের জন্য দূত ফিরে এসে তাঁকে যে সংবাদ দিয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক পরিষ্কাররূপে হযরত নবীজী সেখানকার পরিস্থিতি অবগত ছিলেন। বিপর্যস্ত বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য ক্ষণকালের মধ্যে এক দুর্ধর্ষ বিশাল বাহিনী সংগঠিত করে তিনি দ্রুত মূতায় পাঠিয়ে দিলেন। রাতের আঁধারে নতুন বাহিনী এসে যোগদান করলে হযরত খালিদ প্রত্যুষের সম্মিলিত সেনাদলকে সুবিধামত বিভক্ত করেন এবং নবরূপে ব্যূহবিন্যাস করে নবোদ্যমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী অবিশ্বাস্যভাবে কিরূপে বিজয়ী হয়ে মদীনায় ফিরে আসেন এবং অসাধারণ রণ-কৌশলের জন্য হযরত খালিদ তাঁর বীরত্ব ও শৌর্যের স্বীকৃতিস্বরূপ 'সাইফুল্লাহ' বা 'আল্লাহর তরবারি' খেতাবে ভূষিত হলেন। আর বিশদ বিবরণদানের স্থান এখানে নয়।

এ যুদ্ধ সম্পর্কিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন– "আমার কাছে জা'ফর, জায়েদ ও ইবনে রাওয়াহা স্বরূপে ধরা দিয়েছে। তাদেরকে এক তাঁবুতে দেখেছি। তাঁবুর ভিতরে প্রত্যেকের জন্য খাট রয়েছে। জা'ফরকে সোজাসুজি দাঁড়ানো দেখেছি। তিনি আরো বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা দু'হাতের বদলে দুটো পাখা দিয়েছেন। সে তাতে ভর করে জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা উড়ে বেড়ায়।" (যাদুল মা'আদ, ২-২৮৫)। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ উক্তি থেকেই হযরত জা'ফর বিন আবু তালিব (রাঃ)-এর উপনাম হয়েছে 'তাইয়ার' বা 'উড়ন্ত'।

হযরত জা'ফর তাইয়ারা (রাঃ) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (সাঃ) ভালবাসায় এবং আত্মোৎসর্গে যেমন বড় ছিলেন, দানশীলতা ও মানবতায়ও তেমনি অতুলনীয় ছিলেন। 'তাইয়ার' কেবল তাঁর একটি খেতাবই নয়। জান্নাতে তাঁকে দেখার ভাগ্য যাদের হবে তাঁরা ঠিকই দেখবেন, তাঁর হাত নাই, আছে পাখির মত দু'টি ডানা যা দিয়ে তিনি ইচ্ছামত উড়ে বেড়ান। তাঁর মত আর কেউ হবেন কি?

ফিলিপাইনে মুসলিম জাগরণের সাহসী নকীব মুজাহিদ হাশেম সালামতের অজানা কথা

সুবিশাল প্রশান্ত মহাসাগর আর চীন সাগরের মাঝে সমুদ্রের সুকোমল বুক চিরে জেগে উঠেছে অসংখ্য দ্বীপ। দ্বীপে দ্বীপে ভরা এই দ্বীপপুঞ্জটির নাম ফিলিপাইন। নৈসর্গের শ্যামল সুন্দর তরুরাজী, পাখির কুজন আর বারিধারার সুমধুর কলতান হৃদয়কে করে মুগ্ধ, বিমোহিত। প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে ১৪৫০-৬০ দশকে আগত মুসলিম মুবাল্লিগরা মাতৃভূমির কথা ভুলে এদেশেই গড়ে তুলে নিজস্ব আবাসভূমি। নিবিষ্ঠ মনে দাওয়াতের কাজ করতে থাকে। অনেকে আবার ব্রুনি ও সুলু সুলতানদের চাকরি করতে থাকে। নবাগত এই মুসলমানদের আচার-আচরণ ও ব্যবহার মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে সুলু, পালোয়ান ও মিন্দানাও দ্বীপের জনসাধারণের মাঝে অভূতপূর্ব জাগরণের সৃষ্টি হয়। স্বেচ্ছায় দলে দলে তারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।

এসব নতুন মুসলিম জনবসতিগুলোতে নতুন সমাজ, নতুন আদর্শ ও সংস্কৃতির ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। একেকটি মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নতুন শাসন ব্যবস্থা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাসনে বিভক্ত স্বায়ত্তশাসিত এই অঞ্চলে মুসলমানরা পরম নিশ্চিতে, সুখে-সমৃদ্ধি ও শান্তিতে জীবন যাপন করতে থাকে।

১৫২১ সালে পাশ্চাত্যের দুর্ধর্ষ নাবিক ম্যাগিলান ফিলিপাইন আবিষ্কার করেন। এরপর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো একের পর এক বণিকের বেসে এসে হাজির হতে থাকে। এদের মধ্যে স্পেনীয়রা প্রভূত শক্তি অর্জন করে মুসলিম শাসকদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ম্যানিলায় তখন মুসলিম রাজা সুলাইমানের শাসন চলছিলো। স্পেনীয় বণিক গোষ্ঠী ও সুলতান সুলাইমানের মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। ১৫৭১ সালে এ যুদ্ধে সুলাইমানের পরাজয়ের সাথে সাথে ফিলিপাইনে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে এবং স্পেনীয় খৃষ্টীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এরপর থেকে মুসলিম মুজাহিদরা ক্রমাগত জিহাদ করে আসছে। লাখ লাখ মুজাহিদদের রক্তে ফিলিপাইনের মাটি হয়েছে রঞ্জিত। ইজ্জত আবরু হারিয়েছে শত শত মা বোন। বিরামহীন জিহাদের ফলশ্রুতিতে যখন স্পেনীয়দের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল ঠিক তখনই আরেক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এসে হাজির হয়। ১৮৯৮ সালে আমেরিকানরা স্পেনীয়দের পরাজিত করে ফিলিপাইনের বুকে চেপে বসে। সাম্রাজ্যবাদী এই নব শক্তির বিরুদ্ধে আবার মুসলিম জনতা অস্ত্র তুলে নেয়। শুরু হয় মরণপণ লড়াই। অবশেষে ১৯৪৬ সালে আমেরিকানরা ফিলিপাইন ছেড়ে

যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু যাবার আগে তাদেরই দোসর দেশীয় খ্রীষ্টানদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়।

সুদীর্ঘ এই চারশত বছর মুজাহিদদের রক্তের বিনিময়ে ক্ষমতার মসনদে পরিবর্তন এসেছে বার বার। কিন্তু মুসলমানরা ফিরে পায়নি তাদের হৃত অধিকার। পায়নি স্বাধীনতার উষ্ণ আমেজ। উদিত হয়নি তাদের ভাগ্য তারকা। স্পেনীয় শাসনামলে রোমান ক্যাথলিকরা সরকারী প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহায়তা ও মদদপুষ্ট হয়ে গোটা ফিলিপাইনে খ্রীষ্টীয় মতবাদ প্রচার করে বেড়ায়। স্থানে স্থানে গির্জা নির্মাণ করে। ভিন্নধর্মীদের সুকৌশলে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করে। প্রশাসনিক পদসহ ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। পরবর্তীতে আমেরিকানরাও তাদের ব্যতিক্রম কিছুই করেনি।

কিন্তু অত্যাশ্চর্য বিষয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাজার অত্যাচার, অনাচার, ষড়যন্ত্র, আঁতাত ও হত্যাযজ্ঞ সত্ত্বেও আজও ফিলিপাইনে মুসলিম জনগণ তাদের অস্থিরতার কারণ হয়ে টিকে আছে। আঁকড়ে ধরে আছে তারা নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও মুসলিম ঐতিহ্য। মরণজয়ী এই দুর্ধর্ষ কাফেলার হৃদয়ের নিবিড় অঙ্গনে লালিত ও স্বাধীনতার স্বপ্নকে কেউ মুছতে পারবে না। সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন তাদের অধরে ফুটে ওঠবে সফলতার সুমধুর হাসি।

সম্প্রতি আরবী প্রসিদ্ধ পত্রিকা আল ইসলাহের পক্ষ থেকে মরো ইসলামী মুক্তি ফ্রন্টের চেয়ারম্যান হাশেম সালামতের এক সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। উক্ত সাক্ষাৎকারে তিনি ফিলিপাইনের মুসলমানদের বর্তমান বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন। আমরা সেই সাক্ষাৎকারটি হুবহু সুধী পাঠক মহলের সামনে ভাষান্তর করে পেশ করলাম।

ইসলাহ ঃ আশা করি আপনি মরো মুসলমানদের বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করবেন এবং ক্ষমতাসীন সরকার ও মরো মুক্তিফ্রন্টের মাঝে চলমান শান্তি আলোচনা কতটুকু ফলপ্রসু হতে পারে আর একে কেন্দ্র করে যে অপপ্রচার চলছে, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

হাশেম ঃ এক কোটি বিশ লক্ষ মরো মুসলিম অধ্যুষিত এক বিশাল অঞ্চল দক্ষিণ ফিলিপাইন। এ অঞ্চলের মুসলমানরা সুদীর্ঘ চারশ বছর যাবৎ মুক্তি আন্দোলন করে আসছে। রক্ত দিয়েছে, অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেছে, মৃত্যুবরণ করেছে তবুও তারা মুক্তি আন্দোলন থেকে পিছপা হয়নি। বেনিয়া স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে তিন শত বছর জিহাদ করেছে, তারপর সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার বিরুদ্ধে চল্লিশ বছর এবং বর্তমান দেশীয় খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাচ্ছে। কিন্তু কোন শক্তি তাদেরকে স্তব্ধ করতে পারেনি। পারেনি তাদেরকে নিজস্ব ঈমান আক্বিদা থেকে একচুল হটাতে, পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকরাও আজ একথা স্বীকার করছে।

কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা হলো, যখন আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন ও জিহাদ অভিষ্ট লক্ষ্যের নিকটতম হচ্ছে, যখন আমাদের মুক্তি আন্দোলন এক চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক তখনই আলোচনার টেবিলে এসে মরো মুক্তিফ্রন্ট আর অবিচল থাকতে পারেনি। খৃষ্টীয় শাসকদের হাতে স্বীয় অঞ্চলগুলোকে ছেড়ে দিতে তারা সম্মত হয়েছে।

এরপর সম্প্রতি যখন খৃষ্টান শাসক গোষ্ঠী ও আমাদের মাঝে জিহাদ এক চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত, আমরা আমাদের ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে যাচ্ছি ঠিকই তখনই লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলীতে ক্ষমতাসীন সরকার ও নূর মিসৌরীর ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের সাথে এক শান্তি আলোচনা ঘোষিত হয়। কিছুদিন শান্তি আলোচনার ফলাফল গোপন রাখা হয়। তারপর ফিলিপাইনের রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমগুলো কথিত এই শান্তি আলোচনার স্বপক্ষে অকল্পনীয় প্রচার প্রচারণা চালায়। শান্তি আলোচনার আগামী বৈঠকটি ফিলিপাইনেই হওয়ার কথা ছিল। জনাব নূর মিসৌরী শান্তি আলোচনায় বিশ্বাসী। যারা হাজার হাজার মরো মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, হোলি খেলেছে মা-বোনদের ইজ্জত নিয়ে, তিনি বার বার তাদের সাথে শান্তি আলোচনায় মিলিত হচ্ছেন। ১৯৭৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ আঠারো বছর তাঁর শান্তি আলোচনা কোন শান্তির দিশা দিতে পারেনি। মার্কোস, মিসেস একুইনো এবং মর্তমান সামরিক ডিক্টেটর সরকার সবার সাথে শান্তি আলোচনা করছেন এবং ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন।

কিন্তু আমরা এ ধরনের শান্তি আলোচনা প্রত্যাহার করেছি। আমাদের বিশ্বাস, দুশমন আমাদের মাতৃভূমি জবর-দখল করে আছে। তাদের সশস্ত্রবাহিনী আমাদের মাতৃভূমিতে অবস্থান করছে। শুধু আলোচনার মাধ্যমেই আমরা আমাদের হৃত অধিকার ফিরে পাবো না। এটা সম্ভবও নয়। আমরা জানি ক্ষমতাসীন সরকারের এটা একটা দুরভিসন্ধি। এ শান্তি আলোচনার আবরণে তারা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মরো মুসলমানদের দাবীতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চাচ্ছে।

ইসলাহ ঃ ফিলিপাইন ও ইসরাইলের মাঝে সহযোগিতার কথাও কেউ কেউ বলছে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

হাশেম ঃ ইসরাইল-ফিলিপাইন সহযোগিতা চুক্তি বহুদিন আগে থেকে। এর সূচনা হয় ফিলিপাইনের খৃষ্টীয় সরকারের সামরিক শক্তিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যেই এই সামরিক সহযোগিতার আয়োজন। ক্ষমতাসীন সরকারের ধারণা ফিলিস্তিনী ও মরো মুসলমানদের জিহাদী আন্দোলনের ধারা সাদৃশ্যপূর্ণ। ফিলিস্তিনী স্বাধীনতা আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ব্যাপারে ইসরাইল সরকারের দীর্ঘ ঘৃণ্য অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাছাড়া ফিলিপাইনের ইহুদীরাও মুসলমানদের নিঃসন্দেহে নির্মূল

করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই তারা এ ব্যাপারে ইসরাইলের সামরিক সহযোগিতা লাভ করে বেশ তৎপর হয়েছে।

ইতোমধ্যে ইসরাইল ফিলিপাইনকে অত্যন্ত দ্রুতগামী ও শক্তিশালী কিছু নৌযান সরবরাহ করেছে যা ফিলিপাইনের বিভিন্ন দ্বীপের সাথে সংযোগ বজায় রাখতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলো মুজাহিদদের বোটগুলোকে ধাওয়া করে ডুবিয়ে দিতে খুব কার্যকর। তাছাড়া মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য তারা বহু অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রও দিয়েছে।

ফিলিপাইনে এখন ইহুদী মিশনারীগুলো খুব তৎপর। প্রতিমা পূজারী গোত্রগুলোতে এখন তারা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করছে। মিশনারী দলগুলো সেখানে পুরোদমে তাদের প্রচারণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। নিঃস্ব, অসহায় মূর্তিপূজকদের বিপুল আর্থিক সহায়তা করছে। ইসরাইলের সাহায্যপুষ্ট স্থানীয় ইহুদীরাও বিপুল উদ্যমের সাথে ইহুদীবাদ প্রচারে লিপ্ত। সম্প্রতি প্রতিমাপূজারীদের আবাসভূমিতে কয়েকটি ইহুদী বস্তি গড়ে উঠেছে। এই তো সেদিন মরো ইসলামী মুক্তিফ্রন্টের সদস্যরা একটি মুসলিম অঞ্চলের ঠিক মাঝে এক ইহুদী কলোনীর সন্ধান পায়। ইহুদীদের বক্তব্য এটা এমন এক অঞ্চল হবে যেখানে সর্বধর্মের লোকেরা নির্বিঘ্নে সৌহার্দের সাথে বসবাস করবে। কিন্তু বাস্তবে তা এক শক্তিশালী ইহুদী বস্তিতে রূপান্তরিত হবে।

ইসলাহ ঃ ইসলামী মুক্তিফ্রন্ট ও জনাব নূর মিসৌরীর ন্যাশনাল ফ্রন্টের মাঝে সম্পর্ক কেমন?

হাশেম ঃ মরো ইসলামী মুক্তিফ্রন্ট একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। ইসলামী অনুশাসন বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই আমরা জিহাদ করে আসছি। ইনশাআল্লাহ আমাদের বিজয় অবধারিত। আমরা খিলাফতে রাশেদার আলোকে ইসলামী অনুশাসন কায়েম করবো। পক্ষান্তরে, জনাব মিসৌরী সাহেব সেক্যুলার শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। তবে শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করার ব্যাপারে আমরা এক ও অভিন্ন। এখনো আমরা একে অপরের বিরোধিতা করছি না। তবে দু'দলের চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতায় দুস্তর ব্যবধান।

আমাদের বিশ্বাস, আমাদের স্বাধীনতা ও হৃত-অধিকার পুনরুদ্ধার এবং ইসলামী অনুশাসনের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আল্লাহর পথে সর্বাত্মক জিহাদ, দাওয়াত ও তরবিয়্যতের কর্মসূচী ছাড়া অন্য কোন পন্থায় হাসিল হওয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছি। এরা শুধু আমাদের মাতৃভূমিই ছিনিয়ে নেয়নি, এরা দেশবাসীর পবিত্র ধর্মের ওপর অন্যায়-অত্যাচার চালিয়েছে। আর জনাব নূর মিসৌরীর মুক্তিফ্রন্ট রাজনৈতিকভাবে এর সমাধানে বিশ্বাসী। তিনি শান্তি আলোচনাকেই লক্ষ্যে পৌছার মাধ্যম মনে করেন। ক্ষমতার উচ্চাসনে পৌছা তার

চূড়ান্ত লক্ষ্য। ইদানিং হোয়াইট হাউজে ফিলিস্তিন-ইসরাইল শান্তিচুক্তি জনাব মিসৌরির মনোবল আরো বৃদ্ধি করেছে।

ইসলাহ ঃ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আন্তর্জাতিকভাবে যে পরিবর্তন এসেছে তাতে কি আপনি মনে করেন যে, আন্তর্জাতিকভাবে এ সমস্যাটি তুলে ধরলে এর কোন সমাধান হবে?

হাশেম ঃ সারাবিশ্বে আজ অন্যায়-অবিচার ও জালেমদের জয় জয়কার। দুর্বল শক্তিধরদের সামনে শির নত করছে। আর এই শক্তিধররাতো শুধু তাদেরই সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা করছে যারা ভূপৃষ্ঠ থেকে আল্লাহর দ্বীনকে মিটিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। আমাদের বিশ্বাস, এ অবস্থায় কেউ আমাদের প্রতি এগিয়ে আসবে না, আমাদের পক্ষে কেউ এগিয়ে যাবে না। আলজেরিয়া, বসনিয়া, হার্জেগোভিনাই-এর প্রকৃত প্রমাণ। আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের নীতিহীনতার কারণে আমরা মনে করি যদি সমস্যাটি আন্তর্জাতিকভাবে উত্থাপন করা হয় তবে তাতে শুধু ব্যর্থতার গ্লানিই নিহত রয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমরা আশার ক্ষীণ আলোকরশ্মিও দেখতে পাচ্ছি না। তবে আমরা নিরাশ নই, আমরা একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করছি। আমাদের ঈমান ও বিশ্বাস যে, আল্লাহই সর্বশক্তিমান। তাঁর ইচ্ছা তাঁর হিকমতে যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে আল্লাহ অবশ্যই তাদের সহায়তা করেন। তিনি অবস্থার এমন পরিবর্তন করে দিতে পারেন যে, আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে নির্বিঘ্নে পৌছাতে পারবো।

ইসলাহ ঃ জিহাদী এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে আপনারা কোথা থেকে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা পেয়ে থাকেন? আর আপনাদের ব্যাপারে ইসলামী বিশ্বের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে কি আপনারা সন্তুষ্ট?

হাশেম ঃ জিহাদী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে যদি কেউ অন্য কাউকে সহযোগিতা করে তবে তা বলে বেড়াতে নেই। তবে ইসলামী বিশ্বের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে আমরা একথাই বলতে পারি যে, হয়ত মরো মুসলমানদের দুর্দশা ও অবস্থার ভয়াবহতা সম্পর্কে ইসলামী বিশ্বের প্রকৃত ধারণা নেই। তারা হয়তো জানেই না যে, মরো মুসলমানরা এক অসহায় মুসলিম কওম, খৃস্টান শাসকরা যাদের মাতৃভূমিকে অন্যায় অত্যাচার করে ছিনিয়ে নিয়েছে। তারা সুপরিকল্পিতভাবে তাদের নিঃশেষ করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। একের পর এক তাদের জীবন ধারণের উপকরণকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। দিন দুপুরে অহর্নিশি খৃস্টান সশস্ত্রবাহিনী তাদের বস্তিগুলোতে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। মা-বোনদের ইজ্জত আবরু করছে রক্তরঞ্জিত। তাদের হাহাকার, অসহায় আর্তনাদে পাথরেরও যেন চোখ ছেপে অশ্রু ঝরছে।

যদি ইসলামী বিশ্ব মরো মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থার কিয়দাংশও জানতো তবে নিঃসন্দেহে তারা এসে আমাদের পাশে দাঁড়াতো। ইসলামী বিশ্বের নিরব-নিস্পৃহ

অবস্থা সম্পর্কে এ ছাড়া আমার আর কোন কারণ জানা নেই। তবে আমি আশা করবো, সত্যের সৈনিক সাংবাদিক ভাইয়েরা আমাদের এ করুণদশা মুসলমানদের সামনে তুলে ধরবেন। এতে মুসলিমবিশ্বে মরো মুসলমানদের সম্পর্কে জনমত তৈরি হবে। আর আমাদের প্রতি হবে আপনাদের আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ।

সরকার প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মিথ্যা বানোয়াট কাহিনী প্রচার করায় মুসলিম বিশ্বসহ অন্যান্যরা আজও জানে না যে, মরো মুসলমানরা ফিলিপাইনের অধিবাসী; ফিলিপাইনই তাদের জন্মভূমি। তারাও ফিলিপাইনে এক আলাদা জাতিসত্তার অধিকারী।

ইসলাহ ঃ কোন শক্তিগুলো মরো মুসলমানদের ধ্বংস করতে ফিলিপাইনের পৃষ্ঠপোষকতা করছে? ফিলিপাইনের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো কি তবে মুসলমানদের নিঃশেষ করতে ঐক্যবদ্ধ?

হাশেম ঃ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ফিলিপাইন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। বিশেষত ইহুদী ও খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো খুবই তৎপর। ফিলিপাইনের রাজনৈতিক অঙ্গনে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা অস্বীকার করা যায় না। আর ফিলিপাইনের সবগুলো রাজনৈতিক দলই মরো মুসলমানদের বিরোধী।

আজ এ তিক্ত বাস্তবতাকে অবশ্যই মুসলিম বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে হচ্ছে যে, পাশ্চাত্যের ক্রুসেডারদের সহায়তায়ই ফিলিপাইনের খৃস্টান শাসকরা মুসলিম শাসিত এলাকাগুলো দখল করে নিয়েছে। অতীত ও বর্তমানের সকল শাসকরাই ক্রুসেডারদেরই ইঙ্গিতে উঠা বসা করে। ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংসের ব্যাপারে তারা যে কোন পদক্ষেপ নিতে বিন্দুমাত্রও চিন্তা করে না। তাদের লক্ষ্য অদূর ভবিষ্যতে ফিলিপাইনকে প্রাচ্যের এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে আর এ অভীষ্ট লক্ষ্যে একমাত্র বাধা মরো মুসলমানরা। তারা সুবিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করছে। তাদের সমৃদ্ধ ও স্বতন্ত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির অবস্থান খৃস্টান নেতাদের দৃষ্টিতে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

আমাদের এই ক্রুসেডার দুশমনদের মনে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে যদি জন্মগত বিদ্বেষ, হিংসা না থাকতো তবে তারা মুসলমানদের নিঃশেষ করার পরিবর্তে এর একটা সুন্দর সমাধান খোঁজার চেষ্টা করতো। তারা মরো মুসলমানদের ভবিষ্যত তাদের হাতেই ছেড়ে দিতো।

আমরা বিশ্ব মুসলমানের দোয়া প্রার্থী। জিহাদই আমাদের মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার একমাত্র অবলম্বন। ইনশাআল্লাহ অদূর ভবিষ্যতে আমরা ফিলিপাইনের বুকে ইসলামী সাম্যের পতাকা উড্ডীন করে ছাড়বো, প্রতিষ্ঠিত করবো ইসলামী শাসন ব্যবস্থা।

—সাক্ষাতকারটি তর্জমা করেছেন মাওলানা নাসীম আরাফাত

শহীদী ঈদগাহে দেখ আজ জামায়েত ভারী

টুরসের যুদ্ধ ঃ মুজাহিদদের রক্তাক্তমঞ্চ

ইসলামের সঞ্জীবনী শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে অর্ধশতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে সিরিয়া, মিসর এবং আফ্রিকায় খৃস্টান শক্তিকে পরাভূত করেছিল ইসলামের বিজয়ী বাহিনী। দিগ্বিজয়ী মুসলিম বাহিনী পূর্ব দিকে পৌছে গেলে সুদূরে আনাতোলিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে; আর পশ্চিম দিকে উত্তর আফ্রিকা জয় করে পৌছল ইউরোপের স্পেনে। পূর্বদিক থেকে চেষ্টা করল ইউরোপে প্রবেশ করতে, কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল পূর্ব রোমক সাম্রাজ্যের সুরক্ষিত রাজধানী কনস্টান্টিনোপল। কনস্টান্টিনোপল জয় করার জন্য খলিফা দু'বার প্রেরণ করেছিলেন শক্তিশালী সেনাদল এবং নৌ-বহর। কিন্তু প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও মুসলিম বাহিনী তা দখল করতে পারেনি। ফলে তখনকার মত পূর্বদিকের মুসলিম আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় তৎকালীন ইউরোপের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলো।

কিন্তু পশ্চিম দিকে স্পেন জয় করে পিরেনিজ পর্বতমালার চূড়ায় দাঁড়িয়ে মুসিলম বাহিনী দৃষ্টিপাত করল ফ্রান্সের দিকে। সেনাপতি মুসা স্বপ্ন দেখছিলেন পশ্চিম দিক থেকে খৃস্টান দেশগুলো জয় করতে করতে অগ্রসর হবেন পূর্বদিকে। তারপর কনস্টান্টিনোপল হয়ে ফিরে আসবে তৎকালীন মুসলিম জগতের শক্তিকেন্দ্র উমাইয়া খেলাফতের রাজধানী দামেশ্‌কে। এভাবে সমগ্র দক্ষিণ ইউরোপকে নিয়ে আসবেন ইসলামের পতাকা তলে। কিন্তু খেলাফতের দ্বিধাগ্রস্ততা এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। মুসা ইবনে নুসায়রের সে স্বপ্ন সফল হলে আজ সমগ্র ইউরোপে উড্ডীন থাকত ইসলামী ঝাণ্ডা। কিন্তু এক সময়ে ইউরোপ জয়ের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার পরিবর্তে খেলাফতের অন্তর্দ্বন্দ্বে খলিফার নির্দেশে ইসলামের দুই বীর মুসা এবং তারিককে দামেশ্‌কে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। তখনকার মত তিরোহিত হল ইউরোপ বিজয়ের সম্ভাবনা।

স্পেন থেকে মুসা এবং তারিখের প্রত্যাবর্তনের পর সেখানে দেখা দিল বিদ্রোহ এবং বিরোধ। আর খৃস্টান জগত মুসলিম আক্রমণের প্রথম ধাক্কা সামলে নিল এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। একটানা বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী দক্ষিণ ফ্রান্সের তৌলুসে তাদের প্রথম পরাজয়বরণ করে। (জিলহজ্ব, ১০:

হিজরী, জুন, ৭২২ খৃঃ)। তাদের আমীর এবং সেনাপতি আস্‌সাম এবং আরও অনেক নেতা শাহাদতবরণ করেন। বিপুল ক্ষয়ক্ষতি বরণ করে মুসলিম বাহিনী ফিরে এল সেন্টিমেনিয়ায়।

পরবর্তী দশ বছর স্পেনে বিরাজ করল অশান্তি আর অরাজকতা। এ সময়ে আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ আলঘাফিকিকে আন্দালুসিয়ার স্পেনে গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। (সফর, ১১৩ হিঃ, এপ্রিল, ৭৩১ খৃঃ) আব্দুর রহমানের প্রথম জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিন্তু এতটুকু জানা যায় যে, তাবেঈনদের মধ্যে যারা স্পেনে এসেছিলেন, তিনি তাদের একজন। আমরা আরও জানতে পারি, তিনি ছিলেন একজন শক্তিমান শাসক। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি আন্দালুসিয়ার শ্রেষ্ঠ ওয়ালী ছিলেন। তাঁর উচ্চ গুণাবলী, ন্যায়বোধ, ধৈর্য এবং ধার্মিকতা সম্বন্ধে সকল আরব ঐতিহাসিক একমত। সমগ্র আন্দালুসিয়া তাঁর নিয়োগকে স্বাগত জনিয়েছিল। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা এবং দয়ার জন্য সেনাবাহিনী তাঁকে ভালবাসত। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বিভিন্ন গোত্র ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, মেদার এবং হেমইযারীদের মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তিও হয়েছিল, সেনাবাহিনীতে এবং প্রশাসনে বিরাজ করছিল ঐক্য। ফলে আন্দালুসিয়া প্রবেশ করেছিল এক নতুন যুগে।

আবদুর রহমান গভর্ণর হয়ে বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থা সরেজমিনে দেখতে যান। তিনি সেগুলোর শাসনব্যবস্থা সুসংগঠিত করেন এবং প্রশাসনে নিয়োগ করেন নিরপেক্ষ ও কর্মদক্ষ লোক। তিনি বিদ্রোহ দমন করেন এবং খৃস্টানদের নিকট তাদের গির্জা ও সম্পত্তি ফেরত দেন। তিনি ন্যায়বিচারের সঙ্গে কর পুনর্নির্ধারণ করেন ও তাঁর পূর্বসুরিদের আমলের প্রশাসনের একটি বিচ্যুতি দূর করেন। সেনাবাহিনী সংগঠনে ও সংস্কারে বিশেষ নজর দেন। সকল প্রদেশ থেকে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং গড়ে তোলেন বাধার অশ্বারোহী বাহিনী, যার অধিনায়কত্বে নিয়োগ করেন শ্রেষ্ঠ আরব অফিসারদের। উত্তরাঞ্চলে প্রধান প্রধান নগর এবং সেনা ছাউনিগুলো সুরক্ষিত করে সরকার সংগঠনের ব্যস্ততার মধ্যেও উত্তর সীমান্তের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ তাঁর মনোযোগ এড়ায়নি। তৌলুসের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পরাজয় ঘটেছিল। তার ফলে মুসলিম বিজয়াভিযান ব্যাহত হয়েছিল। তাতে তিনি বিস্মিত হননি। তৌলুসের পরাজয়ের প্রতিশোধ এবং তারিক ও মুসার জয়ের গৌরবকে আরও এগিয়ে নেয়ার কামনা তাঁর অন্তরকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই তিনি ক্রমশঃ এমন এক সেনাবাহিনী সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, যা হবে উত্তর দিকের খৃস্টানদের কাছে অপ্রতিরোধ্য। এর পেছনে সর্বোপরি ছিল ধর্মীয় প্রেরণা। তাঁর মত একজন অভিজ্ঞ ও সাহসী বীর সেনাধ্যক্ষের অধীনে দলে দলে সমবেত হতে লাগল বিভিন্ন স্থান থেকে আগত স্বেচ্ছাসেবক।

তিনি যখন গভর্ণর নিযুক্ত হন তখন উত্তরাঞ্চলে বিদ্রোহ দানা বাঁধছিল। তার নেতা ছিলেন উসমান ইবনে আবি সিনা আল-খাতামি নামে একজন বার্বার মুসলিম। তিনি ছিলেন উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশের গভর্ণর। স্পেন বিজয়ের সময় অন্যান্য বার্বার নেতার মত তিনিও স্পেনে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি পূর্বে তিন বছর স্পেনের গভর্ণর ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁকে পিরেরিজ এবং সেপ্টিমেনিয়ার শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। স্পেন জয়ের পর থেকে আরব এবং বার্বারদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল বিরোধ। বার্বারগণ আরবদের উপর অসন্তুষ্ট ছিল। তারা মনে করত, স্পেন বিজয়ের বেশীর ভাগ কৃতিত্ব তাদের। কিন্তু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে আরবরা। আরবরা সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল করে বসে আছে। ইবনে আবি নিসা ছিলেন উচ্চাভিলাষী এবং তাঁর বার্বার গোত্রের সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে উদগ্র। তাঁর আশা ছিল, তিনি আন্দালুসিয়ার ওয়ালী হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হবেন। কিন্তু তদপরিবর্তে আবদুর রহমান গভর্ণর নিযুক্ত হওয়ায় তাঁর ঘৃণা এবং ক্ষোভের সীমা রইল না। তাই তিনি বিদ্রোহের সুযোগ খুঁজছিলেন।

কোন এক অভিযান অথবা ভ্রমণ উপলক্ষে তিনি গিয়েছিলেন একুইটেনে। এভাবে তিনি একুইটেনের খৃস্টান শাসক ডিউক ইউডোর সংস্পর্শে আসেন এবং আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে তার সাহায্য কামনা করেন।

ডিউক ইবনে আবি নিসার সখ্যতা গ্রহণ করেন সাগ্রহে এবং তার সুন্দরী কন্যা ল্যাম্পিজিয়াকে ইবনে আবি নিসার নিকট বিয়ে দেন। এ বিয়ে ডিউক এবং মুসলিম নেতার মিত্রতার বন্ধনকে দৃঢ়তর করে।

তার উদ্দেশ্য গোপন রাখার জন্য এ মিত্রতাকে প্রচার করা হলো ইবনে আবি নিসার এবং ফ্রাংকদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হিসেবে। কিন্তু আবদুর রহমান বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করলেন এবং প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য উত্তরের প্রদেশগুলোর নিরাপত্তা বিধানের জন্য ইবনে জাইয়ানের অধীনে প্রেরণ করেন একদল সেনাবাহিনী। উসমান ইবনে আবি নিসা পিরেনিজ পর্বতে অবস্থিত তার বাসস্থান আলবাব শহর থেকে পর্বতমালার অভ্যন্তরে গিরিপথে পলায়ন করেন। ইবনে জাইয়াম পর্বত থেকে পর্বতে তাকে ধাওয়া করেন। উসমান আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অবশেষে ধৃত এবং নিহত হন। ডিউক তার মিত্রের এ শোচনীয় ভাগ্যবরণ দেখে নিজের আসন্ন বিপদ দেখতে পেলেন, তখন তিনি নিজের রাজ্য রক্ষার প্রস্তুতি নিলেন। উত্তর প্রদেশগুলোর খৃস্টান ফ্রাংক এবং গথরা মুসলিম ঘাঁটিগুলো আক্রমণ করতে এগিয়ে এল। আবদুর রহমানের হৃদয়ে তখন আসলাম হত্যা এবং

তৌলুসের মুসিলম বাহিনীর পরাজয়ের প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল। গভর্ণনের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকেই তিনি ফ্রাংকদের রাজ্য জয় করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। এখন তিনি উত্তর দিকের প্রদেশগুলোর বিপদ আসন্ন দেখে তাঁর প্রস্তুতি অসম্পূর্ণ রেখেই সসৈন্যে উত্তর দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজনীয় অনুভব করলেন। তিনি এক বিশাল সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করে উত্তর দিকে অগ্রসর হন। স্পেন বিজয়ের পর এত বড় সৈন্যবাহিনী আর খৃস্টানদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়নি। ১১৪ হিজরীর প্রথমার্ধে (৭৩২ খৃঃ) আবদুর রহমান উত্তর দিকে অগ্রসর হয় আরাগন এবং নাভারে জয় করেন এবং ঐ বছরের বসন্তকালে প্রবেশ করেন ফ্রান্সে এবং রোন নদীর তীরে আরলেসে উপস্থিত হন। নদীর তীরে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ডিউক ইউডোর সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়। আবদুর রহমান স্থানটি অধিকার করেন। তারপর তিনি আরও পশ্চিমে এগিয়ে যান।

গ্রোন নদী পার হয়ে মুসলিম বাহিনী ঝঞ্ঝার মত আপতিত হয় একুইটেনের উপর। ধ্বংস করে দেয় শহরের পর শহর। ডিউক মুসলিম বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করার চেষ্টা করেন। আবার প্রচণ্ড যুদ্ধ হল দরদগনি নদীর তীরে। কিন্তু শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন ডিউক। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তার সৈন্যদল। নিহত হলো বহু খৃস্টান সৈনিক। আবঁদুর রহমান পলায়নপর ডিউকের পশ্চাদ্বাবন করলেন তাঁর রাজধানী বোর্দো পর্যন্ত। কিছুকাল আবরোধের পর বোর্দে নগরীর পতন ঘটে। ডিউক তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে পালিয়ে গেলেন উত্তর দিকে এবং মুসলিম বাহিনীর দখলে এসে গেল সমগ্র একুইটেন। আবদুর রহমান রোন উপত্যাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। মুসলিম বাহিনী দখল করে নিল বার্গান্ডি, লিয়ন প্রভৃতি জায়গা এবং মুসলিম বাহিনীর অগ্রবর্তী দল পৌছে গেল বর্তমান ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী থেকে মাত্র একশত মাইল দূরে একটি স্থানে। আবদুর রহমান এ এলাকায় তার জয় সম্পূর্ণ করার জন্য পশ্চিম দিকে অভিযান চালিয়ে লর্য়ার নদীর তীর পর্যন্ত পৌছে গেলেন। তারপর অগ্রসর হলেন ফ্রাংকদের শক্তিকেন্দ্র কেন্দ্রের দিকে। তাঁর এ গৌরবময় অভিযানে কয়েক মাসের মধ্যে পূর্ব থেকে পশ্চিমে দক্ষিণ ফ্রাংঙ্কের অর্ধেক জয় করে ফেললেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গিবন বলেন, "অভিযানের বিজয় রেখা জিব্রাল্টার পাহাড় থেকে প্রায় এক হাজার মাইল দীর্ঘায়িত হয়ে লয়ার নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। এমনি করে অগ্রসর হলে আরবরা পূর্ব দিকে পৌছে যেত পোল্যান্ডের সীমান্ত পর্যন্ত (পশ্চিম দিকে) স্কটল্যান্ডের উচ্চভূমি পর্যন্ত। রাইন নদী নীল অথবা ইউফ্রেতিস নদীর চেয়ে বেশী অনতিক্রমশীল নয়। আরব নৌবহর কোন নৌযুদ্ধ ছাড়াই পৌছে যেত টেমস নদীর মোহনা পর্যন্ত। এখন সম্ভবত কোরআনের ব্যাখ্যা পড়ানো হত অক্সফোর্ডের স্কুলগুলোতে।"

দরদগনির নদী-তীরে পরাজয়ের পর ডিউক ইউডো বুঝতে পারলেন, তার পক্ষে মুসলিম অভিযানের গতিরোধ করা সম্ভব নয়। তাই তিনি ফ্রাংক রাজা চার্লস মারটেলের সহায়তা চাইলেন। চতুর কর্মঠ চার্লস ডিউকের আবেদনে দেখতে পেলেন তার রাজ্য বিস্তৃতির সুযোগ। তিনি দ্রুত সে আবেদনে সাড়া দিলেন। দানিয়ুর ও এলব নদীর তীরবর্তী এলাকা থেকে এবং জার্সেনীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তিনি সংগ্রহ করলেন অসভ্য লোকদের নিয়ে গঠিত এক বিশাল সাহায্যকারী বাহিনী। এদের নিয়ে এগিয়ে এলেন দক্ষিণ দিকে মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করতে। এদিকে মুসলিম বাহিনী এগিয়ে এসে টুরস দখল করে নিল।

ইতোমধ্যে খৃস্টান ফ্রাংক বাহিনী পৌঁছল লয়ার নদীর তীরে। মুসলিম বাহিনী অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারেনি। মুসলিম সেনাদলের পর্যবেক্ষণকারীরা খৃস্টান বাহিনীর শক্তি সম্বন্ধে ভুল ধারণা করেছিল, তাই আবদুর রহমান যখন লয়ার নদীর দক্ষিণ তীরে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য নদী অতিক্রম করতে চাইলেন, তখন তিনি চার্লস মার্টেলের অধীনে বিরাট বাহিনীর উপস্থিতি দেখে আর্শ্চযান্বিত হয়ে গেলেন। ফ্রাংক সেনাদলের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখে আবদুর রহমান মুসলিম বাহিনী নিয়ে নদী তীর থেকে সরে এসে টুরস্ এবং পয়টিয়ার্সের মধ্যবর্তী সমতল ভূমিতে অবস্থান গ্রহণ করেন। চার্লস মার্টের টুরসের পশ্চিমের লয়ার নদী অতিক্রম করে মুসলিম বাহিনীর বাম দিকে কয়েক মাইল দূরে ক্লেইন এবং ভিয়েনা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করলেন তার শিবির।

কিন্তু মুসলিম বাহিনীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন অত্যন্ত উদ্বেগজনক। মুসলিম বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য ছিল বার্বার গোত্রের লোক। বার্বারদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ছিল অন্তর্দ্বন্দ্ব। দক্ষিণ ফ্রান্সের অর্ধেক জয় করার ফলে তাদের হাতে পড়েছিল প্রচুর ধন সম্পদ, সেই সংগে প্রচুর বন্দী। সেগুলো নিয়ে ফিরে যাওয়ার জন্যই তারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। তার ফলে তাদের মধ্যে দেখা দিল মতবিরোধ এবং বিশৃঙ্খলা। যুদ্ধলব্ধ এ সম্পদ যে সেনাবাহিনীতে বিশৃংখলার সৃষ্টি করে মুসলিম বাহিনীর জন্য বিপদ ডেকে আনছে, তা আবদুর রহমান বুঝতে পারলেন। কারণ, যুদ্ধের সময় এ ধন-সম্পদ রক্ষার জন্যই তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে। তিনি এ সম্পদের কিছু অংশ ত্যাগ করার জন্য সৈন্যদের বুঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কঠোর হতে পারেননি। কারণ তাঁর আশঙ্কা ছিল, কঠোর হলে সৈন্যরা বিদ্রোহ করতে পারে। তাছাড়াও ফ্রান্সে প্রবেশ করার পর কয়েক মাস যাবত বিরামহীন অভিযানের ফলে মুসলিম সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং বহু বিজিত শহর ও ঘাঁটিগুলোতে ছোট ছোট সেনাদল মোতায়েন রাখার ফলে মূল বাহিনী খর্ব হয়ে

পড়েছিল। এত অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিলেন।

১১৪ হিরজরীর শাবান মাসের শেষ দিকে (অক্টোবর ১২/১৩, ৭৩২ খৃঃ) যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধমান বাহিনীগুলো মূল অবস্থানেই রয়ে গেল। নবম দিনে উভয়পক্ষের সমগ্র বাহিনী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। কিন্তু কোন পক্ষই সুবিধা অর্জন করতে পারেনি।

পরদিন আবার যুদ্ধ শুরু হলো, উভয়পক্ষই চরম সাহস এবং সহ্য ক্ষমতার পরিচয় দিল। অবশেষে ফ্রাংকদের মধ্যে ক্লান্তির লক্ষণ দেখা গেল। মনে হলো, মুজাহিদ বাহিনী জয়লাভ করবে। কিন্তু এ সময় দেখা দিল বিপর্যয়। ফ্রাংকরা মুসলিম শিবিরের যে অংশে যুদ্ধলব্ধ মালামাল ছিল সেখানে যাওয়ার পথ করে নিয়েছিল এবং তা ফ্রাংকদের হাতে পড়ার আশংকা দেখা দিল। অপর এক বিবরণে বলা হয়েছে, মুসলিম শিবিরে কোন এক অজ্ঞাত ব্যক্তি চিৎকার করে উঠল যে, মালামাল রাখার শিবিরগুলো শত্রুদের হাতে পড়ার উপক্রম হয়েছে। ফলে. যুদ্ধের স্থল ত্যাগ করে মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনীর একটি বড় অংশ মালামাল রক্ষার জন্য চলে আসে পেছনের সারিগুলোতে। বহু সৈন্য তাদের মালামাল রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ফলে, মুসলিম বাহিনীতে দেখা দিল বিশৃঙ্খলা। আব্দুর রহমান চেষ্টা করলেন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং সৈন্যদের আশ্বস্ত করতে। কিন্তু ব্যর্থ হলো তাঁর চেষ্টা।

তিনি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটাছুটি করে সৈন্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে তাদের যুদ্ধের দিকে পরিচালনার চেষ্টা করছিলেন, তখন শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি তীরের আঘাতে নিহত হন এবং ঘোড়া থেকে পড়ে যান। এতে মুসলিম বাহিনীতে দিল ভীতি এবং বিশৃঙ্খলা। ফ্রাংকরাও ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিপুল সংখ্যক মুসলিম সৈন্য হতাহত হলো। তবু রাত্রি আসা পর্যন্ত কোনমতে তাদের অবস্থানে টিকে রইল। রাতে উভয় সৈন্যদল জয় ছাড়াই যুদ্ধ বন্ধ করে ফিরে গেল নিজ নিজ শিবিরে। সেদিনটি ছিল ২১ শে অক্টোবর, ৭৩২ খৃষ্টাব্দ, রমযান মাস, ১১৪ হিজরী।

এ গুরুতর সংকট সময়ে মুসলিম বাহিনীর নেতাদের মধ্যে দেখা দিল বিরোধ এবং মতানৈক্য। সৈন্যদলে ছড়িয়ে পড়ল ভীতি। নেতারা দেখলেন, জয়লাভের আশা নেই। তাঁরা তৎক্ষণাৎ পশ্চাদাপসরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। গভীর রাতে আঁধারের আবরণে এককালের অপরাজেয় মুসলিম বাহিনী তাদের ঘাঁটি ত্যাগ করে চুপিসারে দক্ষিণ দিকে সেপ্টিমেনিয়ায় পশ্চাদাপসরণ করল। পেছনে রেখে গেল তাদের ভারী জিনিসপত্র, যুদ্ধলব্ধ মালামাল, যা রক্ষার জন্য তারা যুদ্ধক্ষেত্রের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছিল।

পরদিন সকালে চার্লস এবং তার মিত্র ডিউক ইউডো মুসলিম শিবিরের নিস্তব্ধতা লক্ষ্য করলেন। তারা সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে দেখলেন, মুসলিম শিবির শূন্য। শুধু কিছুসংখ্যক আহত লোক পড়ে আছে। তারা শিবির ত্যাগকারী বাহিনীর সঙ্গে যেতে পারেনি। খৃষ্টানরা তাদের সেখানেই হত্যা করল।

মুসলিম সৈন্যদের এ আকস্মিক প্রস্থান চার্লসের নিকট সন্দেহজনক মনে হলো। তিনি মনে করলেন, এটা হয়ত মুসলিম সৈন্যদের পাতা ফাঁদ অথবা কোন যুদ্ধ কৌশল।

এ আশঙ্কা করে তিনি আর অগ্রসর হতে ভরসা পেলেন না। যেটুকু বিজয় অর্জিত হয়েছে এতেই তিনি সন্তুষ্ট হয়ে তার সৈন্যদল নিয়ে উত্তর দিকে ফিরে গেলেন।

বিশ্বজোড়া বিশাল সাম্রাজ্য মুসলমানদের হস্তগত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, টুরসের প্রান্তরে মুসলমানরা যে তা হারিয়ে ফেলে। টুরস যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের ফলে নির্ধারিত হয়ে গেল ইউরোপের ভাগ্য। যেখানে মুসলমানরা জয়লাভ করলে ইউরোপ তথা সারা পৃথিবীতে আজ উড্ডীন থাকতো ইসলামী ঝাণ্ডা। গোত্রগত বিরোধ, ধন-সম্পদের প্রতি লোভ, যুদ্ধক্ষেত্রে অবাধ্যতা মুসলমানদের জন্য ডেকে আনে গুরুতর বিপর্যয় এবং সুদূরপ্রসারী পরাজয়। মুসলমানদের পরিত্যাগ করতে হয় ফরাসী দেশ তথা পশ্চিম ইউরোপ।

টুরসের প্রান্তরে আব্দুর রহমানের সঙ্গে শাহাদতবরণ করেন বহু মুসলিম সৈনিক এবং সেনানায়ক। তাই ইসলামের ইতিহাসে টুরসের যুদ্ধ আখ্যায়িত হয়েছে বালাত-উস-শোহাদা অর্থাৎ, শহীদগণের মঞ্চ (Platform of martyrs) নামে।

বহু শতাব্দী পরে, যুগ-যুগান্তরে এপারে বসে আমরা যখন টুরসে মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা স্মরণ করি, তখন ব্যথিত না হয়ে পারি না। যুগ যুগ ধরে মুসলমানের হৃদয়কে তা ব্যথিত করবে। আজো প্রশ্ন জাগে, যে সকল কারণে মুসলমানদের বরণ করতে হয়েছিল এ শোচনীয় পরাজয়; আজো কি তা মুসলিম জাহানে বিদ্যমান নেই?

মুজাহিদ এক পঙ্গু সাহাবীর আবেগময় অভিব্যক্তি

খোঁড়া পা নিয়েই আমি জান্নাতময় ঘুরে বেড়াবো

উহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে বিপুল উদ্যমে। মদীনার প্রতিটি এলাকায় যুবক-বৃদ্ধ সবার মাঝে এ একই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে। সবাই আসন্ন জেহাদে শরীক হবার ইচ্ছায় নিজ নিজ প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

মদীনার একগলি পথ। দু'ধারের বাড়িগুলোয় একটি গোত্রের আবাস। সেখানে একই বাড়ি থেকে যুদ্ধে যাচ্ছে শক্ত-সমর্থ চার জন যুবক। যেমনি সুঠাম দেহ, তেমনি সাহসী ও বীর যোদ্ধা, তারা চার ভাই। জেহাদে যাবার জন্যে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে তারা নিজেদের নাম লিখিয়ে এসেছে। বাড়ি ফিরে তারা এখন যুদ্ধের অবশিষ্ট তৈরিতে লিপ্ত।

বাড়ি থেকে রাস্তায় বের হয়ে এসেছে এ চার যুবক। তাদের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে আশেপাশের অন্য যুবক ও তরুণ। এমন সময় দেখা গেলো, তাদের পিছনে এক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে হাজির হয়েছেন। এ লোকটির একটি পা খোঁড়া। তার পায়ে ত্রুটি থাকলেও উৎসাহ-উদ্দীপনার কোন কমতি নেই। তিনি এ চার যুবকের পিতা। ছেলেদের পিছনে পিছনে তিনি আসছেন ও সে সাথে উচ্চকণ্ঠে বলছেন, 'আমিও জেহাদে যাবো।'

উপস্থিত লোকজন তাঁকে গভীর ঔৎসুক্যের সাথে দেখতে লাগলো। তিনি নিকটে এলে একজন বললো, দেখুন আপনি তো অপারকতার শিকার, তাই আপনার উপর তো জেহাদ ফরযই নয়। সে এলাকার নেতৃস্থানীয় একজন তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললেন, দেখো ভাই, তোমার বাড়ি থেকে এ চারজন যুবক জেহাদ করতে যাচ্ছে। তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি তোমার ঘরের সবাইকে জেহাদের জন্যে পাঠাতে পারছো। এর চাইতে অতিরিক্ত আর কিছু তোমার করার নেই।

এ বৃদ্ধ লোকটি সবার কথাই মনোযোগ নিয়ে শুনতে লাগলেন– কারও কোন কথারই জবাব দিলেন না। তাঁর এক ছেলেও কাছে এসে তাঁকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে জেহাদ থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা চালালো। এতক্ষণ যিনি চুপ করে সবার কথা শুনছিলেন, এখন তিনি আর ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারলেন না। চরম বিরক্তি ও

রাগের সাথে বললেন, 'তোমরা চুপ করো! তোমরা আমাকে বদরের যুদ্ধেও যেতে দাওনি। জোহাদের সবটা সওয়াব শুধু তোমরাই নেবে, আমাকে সামান্যও নিতে দেবে না। কি আশ্চর্য! আমি কি জেহাদে যেতে পারি না? তোমরা মুজাহিদের মর্যাদা লাভ করে জান্নাতে যাবে, আর আমি শুধু ভাঙ্গা পা নিয়ে খোঁড়াতেই থাকবো?

তাঁর এ কথাগুলোতে এমন এক জাদুকরী প্রভাব ছিল যে, কারও মুখে কোন কথাই আর ফুটলো না। অপর একজন বয়স্ক লোক, যিনি এ খোঁড়া লোকটির বন্ধু, তিনি এগিয়ে এলেন। খোঁড়া লোকটির হাত ধরে বললেন, আমর ইবনে জামুহ, তুমি ঠিকই বলেছ, কিন্তু তুমি যাবে কি করে?

হ্যাঁ, এ বয়োবৃদ্ধ খোঁড়া ব্যক্তিটির নাম আমর ইবনে জামুহ। নবী করীম (সাঃ)-এর এ বিশিষ্ট সাহাবী তখন বলে উঠলেন, 'খোঁড়া পা নিয়েই জেহাদে যাবো। আল্লাহর কসম।' সাথী বৃদ্ধ লোকটির বুকে হাত মেরে বলে উঠলেন, 'তোমরা দেখো, আমি এ খোঁড়া পা নিয়ে জান্নাতেও যাবো। তখনও কারও পিছনে পড়বো না।' আমর ইবনে জামুহ (রাঃ) তাঁর খোঁড়া পা নিয়ে সামনে এগুতে লাগলেন এবং চেষ্টা করতে লাগলেন, যেন তাঁর খোঁড়া ভাব কারও কাছে প্রকাশ না পায়। বরং সবাই যেন এটাই বুঝতে পারে যে, তিনি খোঁড়া হলেও স্বাভাবিক চলাচল করতে পারেন। কিন্তু চেষ্টা করেও তিনি তাঁর খোঁড়া ভাব গোপন করতে পারছিলেন না।

যুদ্ধের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। রাসূলে আকরম (সাঃ) তাঁর সাথীদের নিয়ে সশস্ত্র মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তুলতে সময় দিচ্ছেন পুরোপুরি। এসময় সাহাবী আমর তাঁর পা গোপন রাখার চেষ্টা করে মুজাহিদ বাহিনীতে নিজের নাম উঠানোর আবেদন করলেন। বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল। আমি আমার এ খোঁড়া পা নিয়ে জান্নাতে হেঁটে বেড়াতে চাই।'

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর এত ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও হযরত আমরের দিকে পুরো মনোযোগী হলেন। মুচকি হেসে বললেন, কিন্তু আল্লাহ তোমাকে অপারগ করে রেখেছেন। এ অবস্থায় না গেলে কোন ক্ষতি তো নেই। একথার পর আমর আর কিছু বলতে পারছিলেন না। নবী করীম (সাঃ)-এর ব্যক্তিত্বের সামনে তাঁর আর কোন কথাই মুখে ফুটছিল না। তিনি নীচের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্য সাহাবাদের প্রতি মনোযোগ দিলেন ও সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমর ইবনে জামুহ তাঁর খোঁড়া পা নিয়ে সেখানেই বসে পড়লেন। তাঁর সবটা রাগ আর কষ্ট যেন এই হাঁটুর উপরেই ঢাল ত লাগলেন। আমর এভাবে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন নবীর দিকে। চোখে তাঁর

অশ্রু, হাত না বলা কথা প্রকাশ করতে কাঁপছে, কাঁপছে সারাটা শরীরও। খোঁড়া পা-টা তখন মাটিতে বিছানো রয়েছে। রাসূলে খোদা (সাঃ) তাঁর অস্থিরতা ও আবেগময় নীরব আবেদন বুঝতে পারলেন। তাঁর মাথায় হাত রেখে বললেন, যাও তৈরি হয়ে নাও, তোমার আবেদন মঞ্জুর করা হলো।

আমর ইবনে জামুহ লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ও নিজ বস্তির দিকে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে এগুতে লাগলেন। আনন্দে আত্মহারা এ বয়োবৃদ্ধ খোঁড়া নিজেকে সংবরণ করতে পারছিলেন না। চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'আমি আমার এ খোঁড়া পা নিয়েই জান্নাতে যাবো। আমার এ সৌভাগ্য হয়েছে। নবীজী আমাকে জেহাদে যাবার অনুমতি দিয়েছেন। ওহে আমার ছেলেরা, তোমরা আমার সব হাতিয়ার পত্র ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করে দাও দেখি।'

আজ জেহাদে যাবার তারিখ। সাহাবাগণ দলে দলে ঘরবাড়ি ছেড়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসছেন। নবীজীর দরবারে আমরের বাড়ি থেকে চার পুত্রের পিছনে পিছনে তাদের বৃদ্ধ পিতাও খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে আসছেন। আজ তাঁর হাতে লাঠির বদলে বর্শা। সূর্যের আলোকে বর্শাটির ফলা ঝিকমিক করে উঠছে। তার থেকেও বেশি চমকাচ্ছে আমর ইবনে জামুহ এর চেহারা। আমরের স্ত্রী তাঁর ছেলেদের উদ্দেশে বললেন, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, তোমাদের পিতা যুদ্ধের ময়দান থেকে যুদ্ধ না করেই ফিরে আসবেন। শুনে আমরের মেযাজ চড়ে গেল। তিনি কাবার দিকে ফিরে বললেন, আল্লাহ! তুমি আমাকে আর বাড়িতে ফিরিয়ে এনো না।

ওহুদের ময়দানে তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে। আবু তালহা নামের এক সাহাবী একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি দেখলেন, বৃদ্ধ ব্যক্তি খোঁড়া পা নিয়েই কেমন তীব্রগতিতে সামনে এগুচ্ছেন, তাঁর হাতে বর্শা। তিনি বর্শা হাতে শত্রুদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন বীরদর্পে। মুখে তাঁর রণহুংকার 'আল্লাহু আকবার'। তিনি এমন তেজোদীপ্ত ভঙ্গিতে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন যে, তাঁর হেফাযতের লক্ষ্যে সাথে চলা তাঁর এক ছেলেকে মাঝে মাঝেই লম্বা পায়ে আগে বাড়তে হচ্ছে। আবু তালহা দেখলেন, বৃদ্ধ পিতা সামনে পাওয়া শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তিকে বর্শা দিয়ে আক্রমণ করলেন। তাঁর সহযোগিতা করতে ছেলেও পাশে দাঁড়িয়ে হামলা চালালেন। কিন্তু কিছুক্ষণের সে মোকাবিলার পর পিতা-পুত্র, একই সাথে শাহাদত বরণ করলেন।

যুদ্ধের বিভীষিকা শেষ। কাতারে কাতারে শোয়ানো হয়েছে শহীদানের লাশ। আমর ইবনে জামুহ ও তাঁর ছেলের লাশ নেয়ার জন্যে অন্য ছেলেরা ও আমরের স্ত্রী

এগিয়ে এসেছেন। একটি উটে উঠানো হয়েছে এ দু'জনের লাশ। কিন্তু উটটি মদীনার পথে কিছুতেই এগুতে চাচ্ছে না। বহু চেষ্টা-চরিতের পরও লাশবাহী উটটি মদীনা যাচ্ছে না দেখে অবশেষে আমরের স্ত্রী হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন ও তাদের এ সমস্যার কথা জানালেন। নবী (সাঃ) তাঁকে বললেন, আমর কি বাড়ি থেকে বের হয়ে আসার সময় কিছু বলেছিলেন? তাঁর স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, তিনি কাবার দিকে মুখ করে বলেছিলেন, আল্লাহ! আমাকে তুমি আর বাড়িতে ফিরিয়ে এনো না। এ কথা শুনে রাসূলে খোদা (সাঃ) বললেন, 'তোমার স্বামীর দোয়া আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন। আর তাই উটের প্রতি মদীনা না যাওয়ার নির্দেশ এসেছে।' আমরের লাশ রণাঙ্গনেই দাফন করা হলো। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা ঘরে ফিরে এলেন। সন্ধ্যায় সব লাশ দাফন করার পর প্রিয়নবী (সাঃ) কবরস্থান দেখতে এলেন। শহীদদের রূহের উদ্দেশে দোয়া করলেন, সকল সাহাবী সে দোয়ায় অংশ নিলেন। আমরের কবরের পাশে এলে হুযুর বললেন, 'আল্লাহর কিছু বান্দা থাকেন, যাদের দোয়া আল্লাহ সাথে সাথেই কবুল করে নেন। আমর সেসব বান্দারই অন্তর্ভুক্ত। আমি তো তাকে তার খোঁড়া পা নিয়ে জান্নাতে ঘুরে বেড়াতে দেখছি।

বীর মুজাহিদ পিতা ও তাঁর আলেম পুত্র

আবু আব্দুর রহমান। অপর নাম ফররুখ। মদীনার অধিবাসী। কিন্তু তাঁর জীবনটা কেটেছে মদীনার বাইরে বাইরে। কারণ, তিনি লড়াকু যোদ্ধা।

ফররুখ বিয়ে করেছেন অল্প ক'মাস হলো। এখনো বছর পুরোয়নি। তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী। খবর এলো, জেহাদে যেতে হবে খোরাসান। আল্লাহর পথে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সামানপত্র নিয়ে স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নিলেন আবু আব্দুর রহমান। যাবার সময় স্ত্রীর কাছে গচ্ছিত রেখে গেলেন ত্রিশ হাজার দীনার।

যুদ্ধে গিয়ে তাড়াতাড়ি ফেরা সম্ভব হলো না। এক যুদ্ধ থেকে অবসর নিতে না নিতে অপর যুদ্ধে যোগদান- এভাবে কেটে গেলো সাতাশ বছর। এর মাঝে তিনি আর মদীনায় ফিরে আসতে পারলেন না। সাতাশ বছর পর ছুটি মিললো। তিনি বাড়িতে রওয়ানা হলেন।

বাড়ির দরোজায় এসে ঘোড়া থেকে নামলেন আবু আব্দুর রহমান। হাতের বর্শা দিয়ে দরোজায় আঘাত করলেন। দরোজা খুলে বেরিয়ে এলো এক যুবক। এভাবে

দরোজায় এক বর্শাধারীকে দেখে যুবকটি বললো– 'আমার বাড়িতে হামলা করতে এসেছো, আমি তার মজা দেখাচ্ছি। আবু আব্দুর রহমানও নিরুদ্বেগ গলায় বললেন, আমার বাড়িতে তুমি থাকছো কোন্ অধিকারে? হে যুবক!' দু'জনের তর্ক বাড়তে থাকলো। ফলে লোকজন কিছু কিছু করে ভীড় করতে লাগলো। দু'জনেই শাসক সমীপে বিষয়টি উত্থাপন করার ও তার হাতে ফয়সালা করার উদ্যোগ নিলো।

উপস্থিত লোকজন নানা কথা বলতে লাগলো। এ সময় সেখানে উপস্থিত হলেন মালেক ইবনে আনাস। লোকজন তাঁকে দেখে কথা বলা বন্ধ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মালেক ইবনে আনাসের এ ব্যক্তিত্ব দেখে আবু আব্দুর রহমান তাঁর কাছেই বিচার প্রার্থনা করলেন। বললেন, দেখুন! আমি যুবকটিকে চিনি না, অথচ সে এ বাড়িটা তার বলে দাবী করছে। শুধু তাই নয়, সে আমার বাড়ির অন্দর মহলেও যাতায়াত করছে। তিনি বিচার চেয়ে এতকিছু বলার পরও সে যুবক কিন্তু মালেকের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করলো না।

মালেক এ যুবককে এ বাড়ির অধিবাসী হিসেবেই জানতেন। তাই তিনি যুবকের পক্ষ নিয়ে বয়স্ক যোদ্ধা ব্যক্তিটিকে বুঝাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। ফলে আবু আব্দুর রহমানের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। তিনি জোর আওয়াজে বলে উঠলেন, 'আমি আমার বাড়িতে ঢুকতে পারবো না। আর আপনারাও একটি অন্যায়ের সমর্থন করতে থাকবেন। তা হবে না। তাঁর এ জোর আওয়াজ বাড়ির ভিতর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছালো। এতক্ষণ বাইরের হুলস্থুলটি বাড়ির ভিতর থেকে বুঝা যাচ্ছিল না। এবার এ আওয়াজ শুনে আবু আব্দুর রহমানের স্ত্রী দেউড়ীর মুখে এসে বললেন ঃ ইনি আমার স্বামী, তাঁকে ভিতরে ঢুকতে দিন। আর রবীয়া, ইনি তোমার আব্বা। যাঁকে তুমি কোনদিন দেখনি।

পিতা-পুত্র একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন। কান্নায় দু'জনেরই বুক ভেসে গেল। উপস্থিত লোকজন যার যার পথে চলে গেলো। মালেক ইবনে আনাস মসজিদে নববীতে চলে এলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন হাসান ইবনে যায়েদ, ইবনে আবু আলী ও মদীনার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অনেকে। রবীয়াও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল মসজিদে নববীতে।

আবু আব্দুর রহমান সাথে নিয়ে এসেছেন কয়েক হাজার স্বর্ণমুদ্রা। তিনি বিভিন্ন আলাপ-আলোচনার মাঝে ত্রিশ হাজার দীনার সম্পর্কে জানতে চাইলেন। স্ত্রী বললেন, তা আমি গচ্ছিত রেখেছি। এখনই তা বের করতে চাচ্ছি না। আলাপ-আলোচনা শেষে আবু আব্দুর রহমান মসজিদে এলেন। দেখলেন, মালেক ইবনে আনাস ও আরও অনেকে গোল হয়ে বসে কারো কথা শুনছেন। তিনি

লোকটিকে দেখতে চাইলেন, কিন্তু লোকটি তাঁর মাথা এত বেশি ঝুঁকিয়ে বসে আছেন যে, তাঁকে পুরোপুরিভাবে চেনা যাচ্ছে না। তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা যার আলোচনা শুনছেন, তার নাম কি?' লোকজন জবাব দিল, 'রবীয়া ইবনে আবু আব্দুর রহমান।' এ সময় লোকটি খানিকটা মাথা উঁচু করলে দেখতে পেলেন, এ যে তাঁরই সন্তান। স্ত্রীর পেটে রেখে যাওয়া না দেখা পুত্র তাঁর। আনন্দিত পিতা বাড়িতে ফিরে এসে স্ত্রীকে বললেন, 'আমার অবর্তমানে তুমি পুত্র সন্তান প্রসব করেছ, তাকে লালন-পালন করেছ? লেখাপড়া শিখিয়েছ এতটুকু, যোগ্য করে গড়ে তুলেছো যে, সে মসজিদে নববীতে বসে শিক্ষাদান করে আর মসজিদভর্তি লোকজন তার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। সত্যিই আমি আনন্দিত ও গর্বিত।' স্ত্রী বললেন, 'তুমি কি ত্রিশ হাজার দীনারকে বেশি মূল্যবান মনে কর, না এ সুযোগ্য সন্তানকে?' আবু আব্দুর রহমান বললেন, 'অবশ্যই সন্তানের এ মর্যাদা অনেক বেশি দামী ও মূল্যবান।' স্ত্রী বললেন, 'আমি ঐ ত্রিশ হাজার দীনার ব্যয় করে আমাদের পুত্র রবীয়াকে এই মর্যাদালাভের যোগ্য করে তুলেছি।'

প্রবন্ধে আলোচিত মালেকই ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহঃ), যিনি মালেকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। রবীয়া ছিলেন তাঁর উস্তাদ, যিনি রায় বা গবেষণাভিত্তিক সিদ্ধান্ত প্রদানে ছিলেন খুবই পারদর্শী। যার দরুন তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিল 'রবীয়াতুর রায়' বা 'সিদ্ধান্তদাতা রবীয়া।'

– অব্যবহিত বিগত ছোট লেখা দুটি মুহাদ্দেস মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

মহান মুসলিম সুফী পরিব্রাজক ইবনে বতুতা

পৃথিবীর বিখ্যাত ভ্রমণকারীদের মধ্যে ইবনে বতুতার স্থান স্বতন্ত্র এবং বৈশিষ্ট্যময়। কলম্বাস, ভাস্কো ডা গামা, মার্কোপোলো বেরিয়েছিলেন ভারত ও চীনের জল এবং স্থলপথ অনুসন্ধানে। তাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এসব দেশ থেকে স্বর্ণ, বাণিজ্যদ্রব্য এবং ক্রীতদাস আমদানি। প্রাচ্যের ঐশ্বর্য তাঁদের করেছিল প্রলুব্ধ। কিন্তু মরক্কোর তরুণ মুসলিম পরিব্রাজক ইবনে বতুতা বেরিয়েছিলেন দূর-দূরান্তের বিভিন্ন দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও আর্থসামাজিক অবস্থা এবং কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করার উদ্দেশ্যে। তাঁকে তাই আখ্যায়িত করা হয় পরিব্রাজকদের রাজপুত্ররূপে। কিন্তু ইউরোপীয় লেখকরা তাদের আবিষ্কারক ও ভ্রমণকারীদের সম্বন্ধেই বেশি লিখে থাকেন। ইবনে বতুতা তাঁদের কাছে উপেক্ষিত।

পাঁচশ' বছর আগে কলম্বাস ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে জাহাজ ভাসিয়ে ছিলেন স্পেন থেকে। কিন্তু পথ না জানায় আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে উপস্থিত হলেন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে এবং দক্ষিণ আমেরিকায়। কিন্তু ইবনে বতুতা বিভিন্ন দেশের মানুষের সভ্যতা, সস্কৃতি এবং কর্মকাণ্ডের জ্ঞান অর্জনের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে যাত্রা করেছিলেন মরক্কো থেকে স্থলপথে সওদাগরদের শত শত উটের বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে।

সেই চতুর্দশ শতাব্দীতে যখন মানুষের যাতায়াত এখনকার মত সুগম ছিল না, ইবনে বতুতা উনত্রিশ বছরে দু'টি মহাদেশের ৪৪টি দেশে ভ্রমণ করেছিলেন সর্বমোট ৭৫০০০ মাইল, যা মার্কোপোলোর ভ্রমণ পথের তিনগুণ। অতিক্রম করেছিলেন দুর্গম মরুভূমি, বিপদসংকুল পথ। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে আছে– তিনি যা কিছু দেখেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ ভ্রমণের কষ্ট বিপদ এবং দুঃসাহসিক ঘটনার কাহিনী।

তানজিয়ারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। ১৩২৫ সালের ১৩ ই জুন ২১ বছর বয়সে তিনি ভ্রমণে বের হন। তিনি ছিলেন সুফী এবং সাধক। বিখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক শেখ আবু আব্দুল্লাহ মুর্শিদীর নিকট তিনি শিক্ষালাভ করেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ বিবরণে একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। এক রাতে তিনি শেখ মুর্শিদীর বাড়ির ছাদে ঘুমিয়েছিলেন। তিনি তখন স্বপ্ন দেখেন- একটি প্রকাণ্ড পাখীর ডানায় সওয়ার হয়ে আছেন। পাখিটি প্রথমে উড়ে গেল মক্কার দিকে, তারপর ইয়েমেনের দিকে।

অবশেষে উড়ে গেল পূর্বদিকে এবং নামল অন্ধকার ও সবুজ এক দেশে। পরদিন ইবনে বতুতা অবাক হয়ে দেখলেন শেখ তাঁর স্বপ্নের খবর আগেই জানেন। তাঁর এ মূল্যবান পুস্তকটি বর্তমানে সংরক্ষিত আছে প্যারিসের Bibliotheque Nationale-এ। এটা ৬৩০ বছরের পুরানো মহামূল্যবান গ্রন্থ।

তিনি কায়রোতে যখন উপস্থিত হলেন, তখন মিসরের মামলুক সুলতানদের রাজত্বকাল। তিনি আর্শ্চযান্বিত হলেন- মিসর, তার লোকজন এবং এর শহরগুলোর সমৃদ্ধি ও বিশাল নীলনদ দেখে। সেখান থেকে তিনি লোহিত সাগর, গাজা, দামেস্ক এবং প্যালেস্টাইনে যান। তিনি হযরত ঈসা (আঃ), ইসহাক (আঃ) এবং ইয়াকুব (আঃ)-এর মাযার জিয়ারত করেন। আল-আকসা মসজিদে নামায পড়েন।

ইবনে বতুতা জেরুজালেম থেকে বৈরুত, ত্রিপলী এবং সিরিয়ায় গমন করেন এবং প্রায় দু'মাস আরব মরুভূমির উপর দিয়ে ভ্রমণ করে পবিত্র নগরী মক্কায় উপস্থিত হন এবং পান করেন জম্‌জম কূপের পানি। তিনি তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতে বলেছেন, মক্কা থেকে কাফেলার সঙ্গে বাগদাদ ভ্রমণ করেন। সেখান থেকে হজ্ব পালন করতে আবার মক্কায় ফিরে এসে সেখানে দু'বছর অধ্যয়ন করেন। মক্কা থেকে তাঁর প্রথম দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রায় প্রথম ইয়েমেন তারপর পূর্ব-আফ্রিকার উপকূলে এবং সেখান থেকে তানজানিয়ায় গমন করেন। সেখান থেকে আবার ফিরে আসেন মক্কায়। ফেরার পথে ওমান, পারস্যোপসাগর এবং বাহরাইন ভ্রমণ করে আসেন। তারপর সিদ্ধান্ত নেন স্থলপথে আনাতোলিয়ায় এবং বিখ্যাত সূফী জালালুদ্দীন আল-রুমীর শিক্ষাকেন্দ্র কেনিয়াতে যেতে। তিনি রাশিয়ার স্তেপ তৃণভূমির উপর দিয়ে এগিয়ে যান মোঙ্গল অধিকৃত রাজ্যে। সেখান থেকে কনস্টান্টিনোপলে যান এবং হাজিয়া সোফিয়া মসজিদ পরিদর্শন করেন। তিনি সেখানে পাঁচ সপ্তাহ অবস্থান করে ফিরে আসেন এবং শীতে জমে যাওয়া ভলগা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন। সেখানকার প্রচণ্ড শীত থেকে বাঁচার জন্য তিনটি পশম কোট পরিধান করতেন। ভলগা থেকে ইবনে বতুতা মধ্যএশিয়ার তৎকালীন খাওয়াজিম রাজ্যে আসেন এবং পরিদর্শন করেন বোখারা ও চেঙ্গিস খান কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত সমরকন্দ নগরী। সমরকন্দ থেকে আমুদরিয়া পার হয়ে ইবনে বতুতা পারস্য এবং আফগানিস্তানে আসেন। কানদুজে ছয় সপ্তাহ অবস্থান করে বরফ ঢাকা-দুরারোহ আফগানিস্তানের সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিন্দুকুশের গিরিপথ অতিক্রম করে বর্তমান পাকিস্তান এলাকায় আসেন এবং ভারতের দিকে অগ্রসর হন। দিল্লীতে এসে বিখ্যাত সুলতান মোহাম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গে তাঁর এক হাজার স্তম্ভবিশিষ্ট দরবার কক্ষে সাক্ষাত করেন। সুলতান তার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সাত বছর তাঁর দরবারে স্থান দেন। সুলতান

ইবনে বতুতাকে তাঁর দূত নিযুক্ত করে চীনে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু চীনে যাওয়ার পথে চীনের সম্রাটের জন্য প্রেরিত কিছু উপঢৌকন সামগ্রী চুরি হয়ে যায় এবং কিছু সামুদ্রিক ঝড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে, এ দুর্ঘটনার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে সুলতানের অসন্তুষ্টির ভয়ে দিল্লী ফিরে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

তিনি ভারত থেকে চার শত মাইল দূরে মালদ্বীপে অবতরণ করেন। মালদ্বীপের রাণী খাদিজা তাঁকে সেখানে থাকতে রাজি করান এবং ব্যবস্থা করে দেন চাকর-বাকর ও সকল রকম আরাম আয়েশের। তিনি সেখানকার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং কাজীর পদে নিযুক্ত হন। এখানে তিনি বিয়ে করেন এক সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যাকে। সেখানের দ্বীপবাসীদের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে লিখতে শুরু করেন। তিনি লিখেছেন- দ্বীপের লোকেরা একখণ্ড কাপড় পরিধান করত এবং রাস্তায় চলাফেরা করত খালি পায়ে। তিনি সেখানের অনেক লোককে দীক্ষিত করেন ইসলামধর্মে।

দ্বীপগুলোর অধিবাসীরা বিশ্বাস করত, সেখান দৈত্যদানব বাস করে। ইবনে বতুতা তাদের সে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করেন। তিনি তাদের আরবী ভাষা শিক্ষা দেন। বর্তমান সময় পর্যন্ত বেশীরভাগ লোক এ ভাষায় কথা বলে। তিনি সিংহলেও গমন করেন এবং সেখানে পরিদর্শন করে আসেন মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর পদচিহ্ন। একজন মহান ধর্মপ্রচারকরূপে দূর প্রাচ্যের ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন পর্যন্ত ধর্মপ্রচার করেন।

অবশেষে ইবনে বতুতা দক্ষিণ-পূর্ব চীনে পৌছেন। চীনে অনেক মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বিশেষ করে কোয়াংজোতে। সেখানে মধ্যএশিয়া এবং আফগানিস্তান থেকে অনেক সওদাগর আসতেন। তিনি সেখানের প্রথম মসজিদ দেখতে পান। ইবনে বতুতার মতে চীন এক মহান সভ্যতার ধারক আশ্চর্যজনক দেশ।

সে দেশের রেশম বস্ত্র সম্বন্ধেও তিনি লিখে গেছেন। চীন থেকে ইবনে বতুতা মওসুমী বায়ু প্রবাহের সময় ভারতের দিকে জলপথে অগ্রসর হন। তিনি বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা, ভারতের কালিকট, ইরাকের বাগদাদ, অতঃপর মক্কা শরীফ হয়ে অবশেষে মরক্কোতে পৌছেন। এখানে তিনি জানতে পারেন যে, তিনি মরক্কোর যখন বিশ্বভ্রমণ করছিলেন তাঁর মা তখন ইন্তেকাল করেছেন। তিনি মরক্কোর বাদশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর ভ্রমণ পুস্তক দেখান এবং সমুদ্রভ্রমণের বিবরণ দেন।

দক্ষিণ-স্পেন তখনও ছিল মুসলিম শাসনাধীনে। তিনি স্পেনের মালাগা এবং গ্রানাডায় যান ও নিজের দেশ মরক্কোতেও ভ্রমণ করেন। মরক্কোর সুলতান তাঁকে

প্রেরণ করেন আফ্রিকার কৃষ্ণ মানুষ অধ্যুষিত অঞ্চলে। ইবনে বতুতা প্রথমে মালি গমন করেন তারপরে যান তারহাজ্জা লবণ খনি অঞ্চলে। তিনি দেখতে পান লোকেরা তাদের বাড়ি-ঘরের এবং মসজিদের ছাদ লবণ এবং উটের চামড়া দিয়ে নির্মাণ করছে।

মালি থেকে প্রথমে পূর্বদিকে তারপর উত্তরে আইজারে ভ্রমণ করেন। পরে দক্ষিণ আলজেরিয়া হয়ে মরক্কো সীমান্তে পৌছান। তিনি যখন জুমায়ভা গিরিপথে পৌছেন তখন প্রচণ্ড তুষারপাত এবং খারাপ আবহাওয়ায় পতিত হন। তিনি লিখেছেন সে তুষারপাত ছিল আফগানিস্তান এবং তুরস্কের বরফপাতের চেয়েও প্রচণ্ড। কিন্তু মহান এ পরিব্রাজক তাঁর গৌরবময় দেশভ্রমণের পরে তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন- 'দেশগুলোর মধ্যে এ দেশটিই শ্রেষ্ঠ। কারণ এখানে ফলে প্রচুর ফল। এর প্রবাহমান পানি এবং পুষ্টিকর খাদ্য কখনও শেষ হয় না।' ফেজ শহর দেখে তিনি এর সৌন্দর্য, অধিবাসী এবং মসজিদের মিনার থেকে নামাযের আহ্বানের প্রশংসা করেছেন। দেশে ফিরে ইবনে বতুতা আন্দালুসের একজন কবির সঙ্গে দু'বছর পরিশ্রম করেছেন। তার ভ্রমণকাহিনী সুবিন্যস্ত করার কাজে। এ দু'বছর বিচারকের পদেও তিনি কাজ করেন।

১৩৬৯ সালে চৌষট্টি বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। তানজানিয়ারে তাঁকে দাফন করা হয়। এ মহান মুসলিম পরিব্রাজককে জানাচ্ছি আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা।

ইবনে বতুতার বলখ সফর রূপকথাকেও হার মানায়

ইবনে বতুতা সমরকন্দ থেকে নাসাফ হয়ে যাবেন তিরমিযে। বিশাল নগরী তিরমিয। তিরমিযে রয়েছে বিরাট বিরাট বাজার আর সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি। প্রাচীন নগরীটি বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জীহুন নদীর তীরে। আঙ্গুর আর আপেল বাগানে ফসল পাকার মওসুম। নয়নাভিরাম দৃশ্য। ভোলা যায় না। কিন্তু এ সুন্দর নগরীটিও রেহাই পায়নি চেঙ্গিস খানের বর্বর হাত থেকে।

ইবনে বতুতা বলেন, মনোমুগ্ধকর শহরটি যখন চেঙ্গিসী হামলায় বিধ্বস্ত, তখন শহরবাসীরা জীহুন নদী থেকে দু'মাইল দূরে গিয়ে আবার নতুন করে শহরটি গড়ে তোলে। এটাই আজকের তিরমিয।

পথ চলতে চলতে জীহুন নদী পেরিয়ে ইবনে বতুতা দেড় দিনে পাড়ি দিলেন একটা উষর মরু। খোরাসানের উদ্দেশ্যে দীর্ঘপথ পাড়ি দেয়া সত্ত্বেও তিনি সেদিন খোরাসান পৌঁছতে পারেননি। পথিমধ্যে তার যাত্রাবিরতি করতে হল অন্য শহর 'বলখে।' মহান তাপস ইবরাহীম আদহামের রাজ্য এই বলখ। দূর থেকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল শহরটি ইবনে বতুতার চোখে। কিন্তু একি! শহরটি যে প্রায় জনমানব শূন্য। রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, মসজিদ ও বাজারগুলো কেমন যেন হাহাকার করছে এবং প্রায় ইমারতই বিধ্বস্ত। যে দু'একজনকে সামনে পেলেন, ইবনে বতুতা তাদের থেকে জেনে নিলেন এ বিজন শহরের ধ্বংসের ইতিকথা। শহরবাসীরা বলল, চেঙ্গিস খানের সৈন্যবাহিনী এ শহর ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। তারা ইবনে বতুতাকে একটা মসজিদ দেখালেন, যার তিনভাগের একভাগ জায়গা ভাঙ্গা। ইবনে বতুতা জানতে চাইলেন, এ মসজিদটির এই দশা কেন? কেনই বা এর মাত্র একাংশ তিনি ভাঙলেন?

লোকেরা জবাব দিল- এই মসজিদের একটি পিলারের নীচে কিছু অর্থ-সম্পদ রয়েছে, এ সংবাদ কেউ কেউ চেঙ্গিস খানকে দিয়েছিল। তাই চেঙ্গিস খান অর্থ আত্মসাতের জন্য মসজিদের একটা অংশ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়।

ইবনে বতুতাকে প্রকৃত কাহিনীটি খুলে বললেন একজন প্রবীণ। তিনি বললেন, বলখের আমীরের বিবি এ মসজিদটি স্থাপন করেন। আমীর-পত্নীর একটি বহু মূল্যবান হীরা মতি পান্না খচিত কাপড় বিক্রি করে এ মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। অতঃপর উদ্বৃত্ত ধনসম্পদ আমীর-পত্নীর নির্দেশেই মসজিদের স্তম্ভের নিচে পুঁতে দেয়া হয়।

এ কাপড় বিক্রি করে দেয়ার পেছনেও রয়ে গেছে এক চিত্তাকর্ষক গল্প। একবার মুসলিম বিশ্বের তদানীন্তন খলীফা বলখবাসীর ওপর নতুন কর ধার্য করলেন। জনগণ করারোপের পরিমাণকে বোঝা মনে করলো। বলখের জনগণ তখন ছুটে গেলেন তাদের আমীরের কাছে। অন্দরমহল থেকে এ খবর জানলেন বেগম সাহেবা। নিজের বাক্সে রক্ষিত মূল্যবান এক হীরে-জওহর খচিত কাপড় পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, নিয়ে যাও এ কাপড়। সমস্ত বলখবাসীর পক্ষ হতে খাজনার বিনিময়ে এ কাপড় জমা দাও খলিফার দরবারে।

রাষ্ট্রীয় খাজাঞ্চী হিসেব করে দেখলেন এ কাপড়ের মূল্য গোটা বলখবাসীর দেয় খাজনার চেয়েও বেশি।

এদিকে আমীর-পত্নীর বদান্যতা ও নাগরিকদের প্রতি তাঁর দরদ দেখে খলিফা এ কাপড় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। সাথে সাথে বাড়তি খাজনা মওকুফ করার আদেশও এসে পৌঁছালো বলখে।

নিজেদের করমুক্তি ও বেগম সাহেবার প্রিয় পোশাকটি ফেরত পাওয়ার খবর শুনে বলখবাসী তো মহা-উল্লাসিত। কিন্তু বেগম সাহেবা অত্যন্ত ধীর ও শান্তকণ্ঠে কাসেদকে প্রশ্ন করলেন, মুসলিম জাহানের খলিফা কি আমার এ কাপড় স্বচক্ষে দেখেছেন?

বলা হলো, জী, বেগম সাহেবা, তিনি মাত্র এক নজর দেখেছেন।

উত্তরটা শুনামাত্রই অত্যন্ত দীপ্তকণ্ঠে বললেন আমীর-পত্নী, যে কাপড়ের উপর পর পুরুষের নজর পড়েছে সেটা আর আমি ব্যবহার করবো না। যাও এটা বিক্রি করে দিয়ে নির্মাণ কর একটা সুন্দর মসজিদ।

এরপর যখন তাঁর কাছে খবর এলো যে মসজিদের কাজ শেষ হওয়ার পরও কিছু অর্থসম্পদ রয়ে গেছে তখন বেগম সাহেবা বললেন, এগুলো মসজিদেরই কোন অংশে হেফাজত করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে মসজিদের কাজেই তা ব্যবহার করা যায়।

ঘটনার এখানেই সমাপ্তি। এরপর ইবনে বতুতা দীর্ঘ সাতদিন ধরে কোহিস্তান পর্বতমালা ধরে চলতে লাগলেন হিরাত শহরের দিকে। দেখলেন পুরো পর্বত এলাকাতেই ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ছোট ছোট বস্তি। এ জনপদে কিছুদিন অবস্থান করে আবার পথ চলতে লাগলেন ইবনে বতুতা।

শায়খ আহমদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী

উপমহাদেশে ইসলামের উজ্জীবনে নির্ভীকতম কণ্ঠ

প্রত্যেক শতাব্দী অন্তে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য 'মুজাহিদ' বা ধর্ম-সংস্কারের আর্বিভাব ঘটবে– এই মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস আছে। ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল শাসনামলে, বিশেষ করে বাদশাহ আকবর ও জাহাঙ্গীরের কালে, শাহী-দরবারের ইসলাম বৈরিতা এবং ইসলামের মূল নীতি-বিরোধী কিছু কার্যকলাপ ও রীতি-নীতির প্রবর্তনের ফলে ইসলাম দারুণভাবে বাধাপ্রাপ্ত ও মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। সময়ের ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে একজন মুজাদ্দিদের আবির্ভাব না ঘটলে উপমহাদেশের ইসলামের পুনরুজ্জীবন হয়ত আর সম্ভব হত না। তখন সময়টা ছিল এমন যে, হিজরী প্রথম সহস্র বছর প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। ঠিক সেই পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ তাআলা তার অপার করুণায় এক দীপ্ত চরিত্র ইসলাম ধর্মবিদকে মুসলিম জাতির মুজাদ্দিদ হওয়ার তওফীক দান করেন।

এই উপমহাদেশের সেই ক্ষণজন্মা মুসলিম মনীষী হলেন হযরত আবুল বারাকাত বদরুদ্দীন। সংক্ষেপে তিনি শায়খ আহমদ সেরহিন্দী লকবে পরিচিত। হাদীসের মর্মানুসারে তিনি ইতিহাস-খ্যাতি হয়ে রয়েছেন 'মুজাদ্দিদ আলফে সানী' উপাধিতে। তাঁর সংক্ষিপ্ত পারিবারিক পরিচয় এই যে, তিনি ছিলেন দ্বিতীয় খলিকা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর বংশধর। তাঁর পিতা শায়খ আবদুল আহাদ একজন সুপণ্ডিত সূফী ব্যক্তি ছিলেন। হিজরী ৯৭১ সনের ১৪ই শওয়াল (মুতাবেক মে, ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে) রোজ শুক্রবার তিনি বর্তমান ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত সেরহিন্দ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

বুজর্গ পিতার উদ্যোগ ও যত্নে হযরত শায়খ আহমদ অতি অল্প বয়সেই কোরআনের হাফেয হন। অতঃপর বিদ্যালয়ের শিক্ষার সংগে অনেক খ্যাতনামা আলেমের নিকট হাদীস, তাফসীর, ফেকাহ ইত্যাদি ইসলামী বিষয় অধ্যয়ন করেন এবং মাত্র ১৭ বছর বয়সে অধ্যাপনা কাজে নিযুক্ত হন। এই কাজে অনেক বছর ধরে তিনি মুঘল বাদশাহদের তৎকালীন রাজধানী আগ্রায় বসবাস করেন এবং বাদশাহ আকবরের বিশিষ্টতম সভাসদ মোল্লা আবুল ফজলের সাথে ঘণিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। বাদশাহ আকবরের ৪৯ বছরের রাজত্বের শেষভাগে যখন তাঁকে

বাদশাহর ইসলাম-বিরোধী তৎপরতার সাথে জড়িত দেখতে পান, তখন তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ও আগ্রা ত্যাগ করে নিজ জন্মভূমি সেরহিন্দে প্রত্যাবর্তন পূর্বক আধ্যাত্মবাদের নীরব সাধনায় লিপ্ত হন। অধ্যাপনা শুরুর পূর্বে তিনি তাঁর পিতার নিকট তাসাওউফের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সূফীবাদের উচ্চতর তত্ত্বজ্ঞানের জন্য পরে তিনি দিল্লীর খ্যাতনামা পীর হযরত বাকী বিল্লাহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

বাদশাহ আকবর তাঁর রাজত্বের শেষভাগে ধর্মীয় ব্যাপারে, বিশেষ করে ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধানের বিষয়ে হস্তক্ষেপ ও স্বেচ্ছামূলক কার্যকলাপ শুরু করলে হযরত শায়খ আহমদকে তাঁর নীরব সাধনার জীবন ত্যাগ করে প্রতিবাদী কণ্ঠ নিয়ে সংগ্রামী জীবনে অবতীর্ণ হতে হয়। সাধারণভাবে নিরক্ষর আকবরের ধর্মীয় বিষয়ে অজ্ঞতা সত্ত্বেও ইসলামী শরীয়তের প্রতি আনুগত্যহীন মুসলিম মোল্লা এবং সুযোগসন্ধানী অন্য ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা চালিত হয়ে রাষ্ট্রীয় প্রধান ধর্মগুরুর 'অভ্রান্ত ও সর্বময় কর্তৃত্ব আইন' নামে একটি ফরমান জারি করেন, যার বিধানমতে ব্যাখ্যাদানের সর্বময় ক্ষমতা লাভ করেন। তদুপরি তিনি ১৫৮১ সনে সর্ব ধর্মের মূলনীতির সমন্বয়ে 'দ্বীনে ইলাহী' নামে একটি নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। ঐতিহাসিক বদায়ূনীর বর্ণনা মতে, 'দ্বীনে ইলাহী' প্রবর্তনের পর বাদশাহ কতিপয় ইসলাম-বিরোধী আইন জারি করেন, যেগুলোর মধ্যে সম্রাটকে সিজদা প্রদান, কোরআন ও হাদীস পাঠ বন্ধকরণ, আরবী ভাষা শিক্ষা নিষিদ্ধ ঘোষণা, বার বছরের পূর্বে 'খতনা' নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত ছিল।

এসব ইসলাম বিরোধী আইন ও ফরমান জারির ফলে মুসলিম সমাজে অনেক শরীয়ত-বিরোধী রীতি ও প্রথার সৃষ্টি হয় এবং প্রকৃত ইসলাম বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। হযরত শায়খ আহমদ বলিষ্ঠকণ্ঠে সম্রাটের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হলে তাঁর অনেক ভক্ত ও মুরীদ তাঁকে সহযোগিতাদানে এগিয়ে আসেন। তাঁর বলিষ্ঠ প্রতিরোধে 'দ্বীনে ইলাহী'র প্রচার বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং মাত্র ১৮ জন সমর্থক সংগ্রহ করার পর তার অপমৃত্যু ঘটে। আকবরের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র জাহাংগীরের সময়ে 'শেরক' ও 'বেদআত'পূর্ণ কার্যকলাপের প্রাদুর্ভাবের সংগে মদ্যপান ব্যাপকতা লাভ করে। বাদশাহকে সিজদা করা পিতার প্রবর্তিত প্রথা তিনি অবশ্য পালনীয়রূপে প্রয়োগ করতে থাকেন। এসবের নিয়মতান্ত্রিক বিরোধিতার মুখে জাহাংগীরের শিয়াপন্থী প্রধানমন্ত্রী আসফ খানের প্ররোচণায় হযরত শায়খের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনীত হয় এবং রাজাদেশে তাঁকে শাহী দরবারে হাযির হতে হয়, কিন্তু তিনি প্রথামতে বাদশাহকে সিজদা করলেন না। দরবারীদের কথার উত্তরে তিনি বললেন : "এই মস্তক আল্লাহ ব্যতীত আর কারো সামনে নত হবে না।" স্বয়ং বাদশাহ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে সিজদা করার আদেশ দিলেন তাঁকেও তিনি একই উত্তর দেন। বাদশাহ

তখন তাঁকে বন্দী করে অনির্ধারিত মেয়াদের জন্য গোয়ালিয়রের দুর্গে প্রেরণ করেন।

শাহী দরবারের রাজপুরুষ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে হযরত শায়খ আহমদের অনেক মুরীদ ও সমর্থক ছিলেন। বাদশাহর গৃহীত পদক্ষেপে তাঁরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তাঁরা কাবুলের শাসনকর্তা মহব্বত খানের নেতৃত্বে সৈন্য সংগ্রহ করে রাজধানী আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হন। হযরত শায়খ বন্দীখানা থেকে পত্র লিখে তাদেরকে নিবৃত্ত করেন। প্রতিবাদীদের এই সাময়িক তৎপরতায় শায়খের জনপ্রিয়তা ও প্রভাব আরো বৃদ্ধি পায়। আল্লাহর পথের সৈনিক এ মুজাদ্দিদকে নিপীড়ন করে বাদশাহ সাময়িক নিষ্কৃতি পেলেও খোদায়ী রোষ থেকে রক্ষা পেলেন না। এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তিনি একদিন আকস্মিকভাবে সিংহাসন থেকে মাটিতে পড়ে যান। এই ঘটনায় তিনি ভয়ংকর ভীত ও পীড়িত হয়ে পড়েন এবং তার আরোগ্যলাভের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এ সময় হযরত মুজাদ্দিদ (রহঃ)-এর কথা তাঁর মনকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে এবং তিনি অনুতপ্ত হয়ে তাঁর শরণাপন্ন হন।

অনুতপ্ত ও বিপন্ন জাহাংগীর বন্দী শায়খের মুক্তির আদেশ দিলেন এবং তাঁকে সম্মান সহকারে দিল্লীতে আনা হল। স্বয়ং শাহজাদা খুররম এবং প্রধানমন্ত্রী আসফ কান নগরের বাইরে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তাঁর পরামর্শমত বাদশাহ আল্লাহর কাছে তওবা করলে হযরত মুজাদ্দিদ (রহঃ) তাঁর জন্য প্রার্থনা করেন এবং বাদশাহ শীঘ্রই রোগমুক্ত হয়ে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর রাজদরবার থেকে সিজদা ও অন্যান্য কুপ্রথা রদ করা হয়, ধর্মানুষ্ঠানের উপর আরোপিত সকল প্রকার বিধি-নিষেধ রহিত করা হয় এবং ইসলামী শিক্ষার জন্য মুসলিমপ্রধান শহরগুলোতে ও গ্রামাঞ্চলে মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাদশাহ ও মুসলিম সভাসদদের সালাত আদায়ের সুবিধার্থে রাজ দরবারের সন্নিকটে একটি সুন্দর মসজিদও নির্মাণ করা হয়।

ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর সংগে সংঘর্ষ মিটে যাবার পর শুরু হয় হযরত শায়খের জিহাদের দ্বিতীয় পর্যায়। ইসলামী শরীয়তের উপর 'শেরক' ও 'বেদআত' এর যেসব আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়েছিল, তার সংস্কার ও সংশোধন খুব কঠিন কাজই ছিল। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাতিলপন্থী পীরদের উৎখাত এবং ভ্রান্ত তাসাউফ-পন্থীদেরকে সংশোধিত না করে দ্বীন ইসলামকে সঠিকভাবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। এজন্য তিনি বাতিল তরীকা ও ধ্যান-ধারণা থেকে তাসাউফকে মুক্ত করে একটি শরীয়তসম্মত পথ রচনা করেন, নামকরণ হয় 'মুজাদ্দেদিয়া তরীকা'। শরীয়ত ও তরীকতকে যারা দুটো ভিন্ন জিনিস মন করে নিয়েছিল, তিনি তাদেরকে জাহেল ও বিভ্রান্ত লোক বলে অভিহিত করেন। তাঁর

কথায়– "এরা শরীয়তকে চামড়া, অর্থাৎ বহিরাবরণ মনে করে বসে আছে, আর হাকীকতকে মনে করে নিয়েছে মূল ও আসল। প্রকৃত ব্যাপার কি, তা তারা আদৌ বুঝতে পারছে না।" তিনি শরীয়ত ও মারেফাতের যথার্থ সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত 'মাকতুবাত'-এ বলেন ঃ

"কাল কিয়ামতের দিন শরীয়ত সম্পর্কেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তাসাউফ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হবে না। জান্নাতে যাওয়া এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া শরীয়তের বিধান পালনের উপর নির্ভরশীল। নবী-রাসূলগণ– যারা গোটা সৃষ্টিলোকের মাঝে সর্বোত্তম শরীয়ত অনুসরণ করারই দাওয়াত দিয়েছেন। পরকালীন নাযাতের জন্য শরীয়তই একমাত্র উপায় বলে ঘোষণা করেছেন। এ মহান মানবদের দুনিয়ায় আগমনের উদ্দেশ্যই হল শরীয়তের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। সবচেয়ে নেকীর কাজ হল শরীয়তকে চালু করা এবং আদেশসমূহের মধ্যে একটি হুকুমকে হলেও জিন্দা করার চেষ্টা করা, বিশেষ করে এমন সময়, যখন ইসলামের নাম-নিশানা মুছে গেছে, কোটি কোটি টাকা আল্লাহর পথে খরচ করাও শরীয়তের মাসআলাকে চালু করার সমান সওয়াবের কাজ হতে পারে না।"

বাতিলপন্থীদের সৃষ্ট 'শেরক' ও 'বেদআত'-এর পন্থা থেকে দ্বীনে হককে উদ্ধার করে সঠিক পন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁকে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল, একথাই বলা বাহুল্য। এ সময় হযরত শায়খ আহমদের মত শক্তিশালী ধর্মীয় নেতার আবির্ভাব না ঘটলে উপমহাদেশে ইসলামের কি অবস্থা দাঁড়াত, তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। ইসলামের আলো নিভে যেত না সত্য। কারণ, আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ঃ "আল্লাহ তাঁর আলো পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন যদিও প্রত্যাখ্যানকারীরা তা অপছন্দ করে।" (৬১ ঃ ৮) তবুও উপমহাদেশে ইসলামের তৎকালীন বিপর্যয় যে প্রবল ঝঞ্ঝার আকার ধারণ করেছিল, তাকে সামাল দিতে হযরত শায়খ আহমদের মত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব অপরিহার্য ছিল, একথা অনস্বীকার্য। তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর বিচারে এবং সময়ের পরিমাণে সঠিকভাবে চিহ্নিত হয়ে তিনি মুজাদ্দিদরূপে বরিত হয়েছেন। হিজরী দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাহিদ বা 'মুজাদ্দিদ আলবে সানী'রূপে তিনি সমধিক পরিচিত এবং উপমহাদেশ তার মাধ্যমে আলোকোজ্জ্বল ইসলাম জ্ঞান-ভাণ্ডার লাভ করে ধন্য হয়েছে।

হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (রহঃ) তাঁর বিরচিত পুস্তকাবলীর মধ্যে নির্ভেজাল ইসলামী জ্ঞানের দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তাঁর রচিত 'মাকতুবাত', 'মাবদা ও মাআদ এবং 'মারিআফে লাদ্দুনিয়া' অমূল্য গ্রন্থরূপে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। এই জ্ঞান-তাপস মনীষী ১০৩৪ হিজরী সনের ২৮শে সফর (৩০ নভেম্বর ১৬২৪ খৃঃ) রোজ বুধবার ইন্তেকাল করেন। নিজ জন্মস্থান সেরহিন্দে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মদীনায় মহানবীর প্রথম দূত অমর আত্মত্যাগী মুজাহিদ সাহাবী হযরত মুস'আব ইবনে উমায়ের (রাঃ)

নবুওতের প্রাথমিক বছরগুলোতে সত্য ধর্মের আহ্বান কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই ধনসম্পদের সুখ ও বিলাসপূর্ণ জীবনের আয়েশ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে অতি অল্প যে কয়েকজন সম্মানিত সাহাবী আল্লাহর দ্বীনের কৃচ্ছতাপূর্ণ জীবন বেছে নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে হযরত মুস'আব ইবনে উমায়ের (রাঃ) ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। তিনি ছিলেন মক্কার কোরাইশদের বনু আবদুদ্দার গোত্রের এক ধনবান পরিবারের আদরের লালিত সন্তান। তাঁর মত সুবেশী, সুদর্শন যুবক মক্কায় দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না। তাঁর সুশ্রী চেহারা মানুষকে মুগ্ধ করত। তাঁর ইসলামপূর্ণ জীবন সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি সর্বোত্তম মানের পোশাক পরতেন, যে রাস্তা দিয়ে তিনি হাঁটতেন তা সুবাসিত হয়ে যেত এবং তাঁর পায়ে জমিদার হাজরামী জুতা শোভা পেত। এসবের উপরে মহান আল্লাহ তাঁকে সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। এহেন কান্তিময় বিলাসপূর্ণ জীবনের অধিকারী মানুষটি আল্লাহর রসূলের ডাক শুনামাত্রই সামাজিক সকল পদমর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা ত্যাগ করে তার মুষ্টিমেয় অনুসারীদের কাতারে সামিল হয়েছিলেন।

পরিবারের সদস্যরা তাঁর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পেয়ে হাত-পা বেঁধে তাঁকে এক নির্জন কক্ষে বন্দী করে রাখল, কিন্তু শত অত্যাচারও তাঁকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করতে পারল না। অবশেষে তাঁকে বাড়ী থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হল। মক্কায় আনুষ্ঠানিক এবাদতে অংশ গ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় নবুওয়তের পঞ্চম বছরে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশে আবিসিনিয়া হিজরতকারী সাহাবাদের সংগে হযরত মুসা'আব (রাঃ) আবিসিনিয়ায় গমন করেন এবং হযরত মহানবী (সাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের পূর্বেই প্রত্যাবর্তন করে। হযরত মহানবী (সাঃ) তাঁর সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর উপর নতুন করে অনুষ্ঠিত অত্যাচার-নির্যাতনে তাঁর সুশ্রী চেহারা নিঃশেষিত হয়ে যায়। তিনি এমন বৈরাগ্য অবলম্বন করেন এবং তাঁর অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, রেশমের পোশাকের পরিবর্তে তিনি একখানা কম্বলের অর্ধেক পরিধান করতেন এবং বাকী অর্ধেক গায়ে জড়াতেন।

নবুওয়তের দ্বাদশ বছরে ইয়াসরিববাসীদের বার জনের দ্বিতীয় দলটির সংগে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর ইতিহাস-খ্যাত আকাবার প্রথম 'বাইয়াত' অনুষ্ঠিত

হয়। হযরত মুস'আব ইবনে উমায়ের (রাঃ) সেই অনুষ্ঠানে হযরত নবীজীর সংগে উপস্থিত ছিলেন। ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করে বার ব্যক্তি যখন ইয়াসরিবে ফিরে যান, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন হযরত মুস'আবকে ইসয়াসরিববাসীদেরকে কোরআন ও ইসলামের বিষয়ে শিক্ষা দানের জন্য তাদের সাথে প্রেরণ করেন। পবিত্র কোরআনে তাঁর অগাধ অধিকার ছিল এবং উঁচুমানের সাধারণ শিক্ষাও তাঁর ছিল।

প্রচারকার্যে হযরত মুস'আব বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, মিষ্টভাষী ও সুকৌশলী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ধৈর্যশীল বিনয়-নম্র ব্যবহার তাঁর প্রচারকার্যে অনেক সহায়ক হয়েছিল। তাঁর প্রচার-দক্ষতায় হযরত মহানবী (সাঃ) হিজরত করে ইয়াসরিবে পৌছার পূর্বেই বহুসংখ্যক পৌত্তলিক ইয়াসরিববাসী তাঁর হাতে ইসলামে দ্বীক্ষিত হন এবং সেখানকার সমাজ জীবনে ইসলামের জন্য তিনি একটা অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হন।

ইয়াসরিবে সর্বপ্রথম জুম্মার নামায অনুষ্ঠিত হয় হযরত মুস'আব (রাঃ)-এর ইমামতিতে। জুম্মার নামায ইতিপূর্বেই ফরয করা হলও মক্কায় তখনও সে আদেশ বাস্তবায়িত করা সম্ভব ছিল না। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুমতিক্রমেই ইয়াসরিবের স্বচ্ছন্দ পরিবেশে সেখানে তিনি জুমার প্রচলন করেন। তাঁর প্রচার এবং ইমামতি কাজে তাঁর সহকারীরূপে এবং স্থলাভিসিক্তরূপে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) নামক একজন অন্ধ সাহাবীকেও তাঁর সংগে পাঠিয়েছিলেন। এরা দু'জনই ছিলেন আল্লাহর দ্বীনের জন্য মক্কা থেকে ইয়াসরিবের হিজরতকারী প্রথম মুহাজির।

এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় যে, মূসা ইবনে উকবা (রাঃ) হযরত মু'আবের পূর্বেই ইয়াসরিবে জুম্মার নামায প্রবর্তন করেছিলেন। অন্য এক রেওয়ায়েত মতে ইয়াসরিববাসী হযরত আস'আদ ইবনে যুরারা (রাঃ) প্রথম থেকেই এ নামাযের ইমামতি করতেন। এ দুটি দাবীই এ কারণে ভ্রান্ত মনে হয়ে যে, হযরত মুস'আব ইবনে উমায়ের (রাঃ) আকাবার প্রথম বাইয়াত গ্রহণকারী বার ব্যক্তির সংগে ইয়াসরিবে পৌছার পূর্বে সেখানে জুম্মার নামায প্রবর্তনের কোন প্রশ্নই ছিল না এবং তিনি বা হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম উপস্থিত থাকতে অন্য কারোর ইমামতি করার প্রশ্নই ছিল না। প্রথমোক্ত দু'জন সাহাবীই হযরত মুস'আবের হাতে ইসলামের দীক্ষালাভ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলেম। অন্যের ইমামতিতে তিনি মোক্তাদি হয়ে নামায পড়বেন, এরকম ভাবা যায় না। এমন হতে পারে যে, হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নিযুক্ত দুই ইমামের অনুপস্থিতে নৈমিত্তিকভাবে অন্য কেউ কখনও ইমামতি করেছেন, কিন্তু তা উল্লেখের মত নয়।

হিজরত পরবর্তী সময়ের মাথায় মুহম্মদ ইবনে কা'ব আল-কুরাজীর হযরত আলী ইবনে আবু তালিবে (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে-

"একদিন আমরা যখন হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সংগে মসজিদে উপবিষ্ট ছিলাম, তখন তালি-লাগানো তাঁর একমাত্র পরিধান বস্ত্র কম্বল পরিহিত হয়ে মুস'আব ইবনে উমায়ের সেখানে উপস্থিত হন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-তাঁর এ পোশাক দেখে তাঁর অতীত জাঁকজমক ও স্বচ্ছলতার কথা স্মরণ করে অশ্রুবর্ষণ করলেন। (তিরমিযী)

হযরত মুস'আব (রাঃ) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। সেই যুদ্ধে তাঁর ভ্রাতা কোরাইশদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে মুসলিম বাহিনীর হাতে কোরাইশদের ৭০ জন যুদ্ধবন্দীর অন্যতম হয়ে মদীনায় আনীত হলে হযরত মুস'আব তাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছিলেন। তাঁর মাতা অত্যন্ত কমনীয় চরিত্রের অধিকারীণীরূপে পরিচিতা ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও মাতার প্রতি তিনি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। এ থেকে অনুমান করা যায়, তাঁর পরিবারের কাছ থেকে তিনি কি পরিমাণ যন্ত্রণা পেয়েছিলেন এবং কত গভীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন আসাদ বংশীয় হান্না বিনতে জাহশ, কিন্তু তার ভূমিকার বিষয়ে কিছু জানা যায় না।

ওহুদের যুদ্ধে হযরত মুস'আবের ভূমিকা তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। মুসলিম তীরন্দাজদের কর্তব্যে অবহেলার ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়ের পরে কোরাইশ বাহিনীর তীব্র আক্রমণের কালে হযরত রসূলে খোদা আবদুদ্দারের অতীত প্রভাব-প্রতিপত্তির বিবেচনায় মুসলিম বাহিনীর পতাকার দায়িত্ব দিলেন হযরত মুস'আব ইবনে উমায়েরের হাতে। পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্য মুস'আবকে প্রথম থেকেই আক্রমণের উপর আক্রমণ সহ্য করতে হয় এবং শত্রুবাহিনীর তীর ও তরবারীর আঘাতে তাঁর আপাদমস্তক একেবারে জর্জরিত হয়ে যায়। তাঁর এ অবস্থার মধ্যে ইবনে কামিয়া নামক এক দুর্ধর্ষ কোরাইশ বীর এগিয়ে এসে তাঁর ডান বাহুর উপর এক প্রচণ্ড আঘাত হানে। আঘাতে বাহুখানা কেটে পড়ে যাওয়ার সংগে সংগে তিনি বাম হস্তে পতাকা ধারণ করেন। কিন্তু অবিলম্বে ইবনে কামিয়ার দ্বিতীয় আঘাতে বাম বাহুখানাও কেটে পড়ে গেল। পরক্ষণেই শত্রুপক্ষের একটা তীর এসে বক্ষ ভেদ করে চলে গেল। হযরত মুস'আব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে অমনি শহীদের জীবনলাভ করলেন।

হযরত মুস'আবের শাহাদতবরণে যুদ্ধের গতি সহসা স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং এ অবস্থাটা প্রায় অরক্ষিত হযরত রসূলুল্লাহর জীবন রক্ষার সহায়ক হয়েছিল একটা গুজবের ভেতর দিয়ে। হযরত রসূলে খোদার বাহ্যিক চেহারার সাথে মুস'আবের চেহারার কিছু সাদৃশ্য ছিল। অন্ততঃ ইবনে কামিয়া সে রকমই দেখেছিল। এ বাহ্যিক সাদৃশ্যে বিভ্রান্ত হয়ে মহা-উল্লাসে সে চিৎকার করে ছুটল– "ইন্না মুহাম্মাদান ক্বাদ কুতেলা"– মুহাম্মদ নিহত হয়েছেন। তারপরের বিবরণ দিতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। ভ্রান্ত সংবাদটার নিরসনের পূর্বেই মুসলিম বাহিনীর মধ্যে

বিশৃংখলা দেখা দেয়। মাত্র অল্প কয়েকজন নবীপ্রাণ সাহাবী মহানবী (সাঃ)-কে ঘিরে রেখেছিলেন। সেই অবস্থায় দুরাত্মা ইবনে কামিয়ার তরবারীর আঘাতে তাঁর শিরস্ত্রাণের দু'টি কড়া তাঁর পবিত্র মস্তকে ও কপালে বিদ্ধ হয়ে যায়, শত্রুর নিক্ষিপ্ত একটি প্রস্তরের আঘাতে তাঁর একটি মোবারক দাঁত (বর্ণনান্তরে ৪টি) শহীদ হয় এবং তিনি শত্রুর একটি গর্তের মধ্যে পড়ে যান। তীরন্দাজদের অবহেলায় সংঘটিত বিপর্যয়ের আগেই মুসলিম সৈন্যদের প্রবল আক্রমণে কোরাইশ বাহিনীর অধিকাংশই পরাজয় মেনে চলে গিয়েছিল এবং অনেক ক্ষতির ভেতর দিয়ে বিজয় হয়েছিল মুসলিম বাহিনীরই। প্রিয়নবী (সাঃ)-কে গর্ত থেকে উঠানোর পরে তাঁর যথাযথ শুশ্রূষা করা হয় এবং তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এ যুদ্ধে হযরত মুস'আব ইবনে উমায়ের (রাঃ) এবং প্রিন্স নবীজীর প্রিয় পিতৃব্য হযরত হামযা (রাঃ)সহ মোট ৭০ জন মুসলিম সৈন্য শহীদ হয়েছিল।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর প্রাণপ্রিয় সাহাবী মুস'আব (রাঃ)-কে হারিয়ে যারপরনাই দুঃখ পেয়েছিলেন। যুদ্ধের ময়দান শান্ত হওয়ার পর শহীদদের লাশসমূহ যখন সংগ্রহ করা হয়, হযরত নবীজী তখন মুস'আবের লাশের পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে যান এবং পাক কোরআনের এ আয়াতটি আবৃত্তি করেন ঃ

"বিশ্বাসীদিগের মধ্যে অনেকে আল্লাহর সংগে কৃত তাহাদিগের অংগীকার পূর্ণ করিয়াছে, উহাদিগের কেহ কেহ শাহাদতবরণ করিয়াছে এবং কেহ কেহ প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। উহারা তাহাদিগের ইচ্ছায় কোন পরিবর্তন করে নাই।" (৩৩ ঃ ২৩)

এরপর প্রিয়নবী (সাঃ) শোকার্তচিত্তে বললেন ঃ "মক্কায় আমি তোমার মত সুদর্শন এবং সুন্দর পোশাক পরিধানকারী আর কাউকে দেখিনি। কিন্তু আজ দেখছি যে, তোমার চুল অবিন্যস্ত ও মাটিতে লেপ্টে রয়েছে এবং তোমার শরীরের উপর একটি মাত্র কম্বল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কেয়ামতের দিন তোমরা আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হবে।"

শহীদগণকে তাদের রক্তরঞ্জিত বস্ত্রে বিনা গোসলে ও বিনা জানাযায় দু'তিন জন করে এক কবরে সমাহিত করা হয়। হযরত মুস'আব ইবনে উমায়ের (রাঃ)-কে কবরস্থ করার জন্য প্রস্তুত করতে যেয়ে দেখা গেল যে, তাঁর পরিধেয় কম্বলখানা দৈর্ঘ্যে এত খোটো যে, তদ্বারা তাঁর মস্তক আবৃত করলে তার পা-দুখানা অনাবৃত হয়ে যায় এবং পা-দু'খানা আবৃত করলে মস্তক অনাবৃত হয়ে পড়ে। তখন হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন– "তাঁর মস্তক আবৃত করো এবং এজখের ঘাস দ্বারা তার পা আবৃত করো।" (বোখারী ও মুসলিম)। এককালের সর্বোত্তম পোশাকধারী সুন্দর সুন্দরতম মানুষটি এভাবেই দ্বীনহীন বস্ত্রে এ নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করলেন।

সুলতান ফতেহ্ আলী টিপু ও নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সম্পর্ক

আজাদী আন্দোলনের অজানা উপাখ্যান

মহিশূরের সিংহ সুলতান টিপুর প্রতি নেপোলিয়নের পত্র ঃ

জাতীয় কনভেনশন মেম্বার জেনারেল ইন চীফ বোনাপার্টের পক্ষ থেকে, মহান সুলতান আমাদের মহান বন্ধু টিপু সাহেবের প্রতি ঃ

আপনি ইতিপূর্বে জানতে পেরেছেন যে, আমি দিগ্বিজয়ী অগণিত সেনাবাহিনী নিয়ে আপনার দেশকে ইংরেজ সাম্রাজ্যেবাদের হিংস্র থাবা থেকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। লোহিত সাগরের তীর পর্যন্ত আমি এসে পৌঁছেছি।

আমি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আপনাকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিচ্ছি। আমার ইচ্ছা, আপনি আমাকে মাসকাট ও মুসার (ইয়েমেনের বন্দর) রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবেন। তদুপরি আমার এটাও আশা যে, আপনার বিশ্বস্ত একজন ধীমান ব্যক্তিকে কায়রো অথবা সুয়েজে পাঠাবেন। আমি তার সাথে আলাপ-আলোচনা করব। মহান আল্লাহ আপনার শত্রুকে ধ্বংস করে দিন।

(স্বাক্ষর)
বোনাপার্ট

এ চিঠির সাথে সাথে নেপোলিয়ন মক্কা শরীফের কাছে মিসরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করে আবেদন করেন যে, সংগের চিঠিখানা আমাদের বন্ধু টিপু সুলতানের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হোক। মক্কা শরীফের নামে লিখিত চিঠির অনুবাদ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

জাতীয় কনভেনশন সদস্য, জেনারেল ইন চীফ বোনাপার্টের পক্ষ থেকে মক্কার শরীফের প্রতি ঃ

জাহাজের কাপ্তানদের মাধ্যমে আপনি পূর্ণ অবগত আছেন যে, কায়রো ও সুয়েজের মধ্যবর্তী অঞ্চল পূর্ণ শান্ত। সমগ্র এলাকা সার্বিকভাবে নিরাপদ। বর্তমানে দেশের কোন জালেম শাসকের অস্তিত্ব নেই। অত্র এলাকার অধিবাসীরা নির্ভয়ে কৃষি ও শিল্পকর্ম এবং অন্যান্য পেশায় পূর্বের ন্যায় নিয়োজিত। খোদার ফজলে এ সমস্ত ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি ঘটবে। ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে ট্যাক্স মাশুল কমিয়ে দেয়া হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের বর্তমান মাশুল পূর্ববর্তী শাসক কর্তৃক আরোপিত নতুন করের পূর্বে যেমন ছিল সে অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছে। ব্যবসায়ীদেরকে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও সাহায্য দেয়া হচ্ছে।

কায়রো ও সুয়েজ মধ্যবর্তী সড়ক পর্যটকদের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে এবং জোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনি আপনার দেশের ব্যবসায়ীদের সুয়েজ নির্ভয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করার আশ্বাস দিন। ফলে, তারা এখান থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে সমস্ত মালামাল ক্রয় করতে চায়, তা তারা নির্বিঘ্নে করার মনোবল পাবে।

আর আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের বন্ধু টিপু সুলতানের নামে একটি চিঠি পাঠাচ্ছি। চিঠিটি পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করে আমাকে ধন্য করবেন।

(স্বাক্ষর)
বোনাপার্ট

মক্কার শরীফ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যের বিনিময়ে ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। সে টিপুর প্রতি লেখা নেপোলিয়নের চিঠিটি বৃটিশ ক্যাপ্টেন উইলসনের কাছে হস্তান্তর করে। মূলতঃ নেপোলিয়ন মিসরে আগমনের পর থেকেই ইংরেজরা এশিয়াব্যাপী গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক বিস্তার করে রাখে। এর পাশাপাশি তারা মোটা অংকের বেতনের বিনিময়ে আরবের শেখ সর্দার ও শাকদের সহযোগিতা লাভ করে। যাতে টিপু নেপোলিয়নের মাঝে আদান-প্রদানকৃত গোপন চিটিপত্র ইংরেজদের হস্তগত হয়।

এভাবে পথে চিঠিপত্র পাকড়াও হওয়ার কারণে পত্র যোগাযোগের পথ বন্ধ ছিল। তবুও নেপোলিয়ন মধ্যপ্রাচ্যের পথ ধরে ভারতে আসার ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তখন ভূমধ্যসাগর থেকে নিয়ে আরব সাগর পর্যন্ত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল ওসমানী খেলাফত। ফ্রান্স ও এশিয়ার ঐক্যের ব্যাপারে পত্রযোগাযোগের সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়ার পর ইংরেজরা ওসমানী সাম্রাজ্যের খলীফা সলীমের সহযোগিতা লাভের প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করে।

ওসমানীয় খলীফা এতে তার কৌশলগত সুবিধা দেখতে পেয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করতে লাগলো। সুতরাং কনস্টান্টিনোপল থেকে খলীফা সলীম সুলতান টিপুর নামে লিখিত এক দীর্ঘ চিঠিতে তুর্কীদের বিরুদ্ধে ফরাসীদের অপরাধের এক দীর্ঘ ফিরিস্তি তুলে ধরেন। চিঠিতে এ বিষয়ের প্রতিও বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয় যে, ফ্রান্স ইসলামের মারাত্মক দুশমন। পক্ষান্তরে ইংরেজরা মুসলমানদের বন্ধু।

তুর্কীর সুলতান আরো অভিযোগ করেন যে, নেপোলিয়নের মিসর আগমন আন্তর্জাতিক আইনে লংঘন। সর্বোপরি এটা ইসলামের বিরুদ্ধে চরম আঘাত। কেননা, মিসর মুসলমানদের কেবলা মক্কা-মুনাওয়ারা নিকটবর্তী হওয়ার কারণে আমাদের জন্য তা চরম মানহানিকরও বটে।

সুলতান সলীম লিখেন, নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য স্থানীয় শাসকদের উৎখাত করে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংস করা। ফরাসীদের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, আরব ভূমিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম দেশ ও জাতি তথা খোদ ইসলামের ওপর আঘাত হানা এবং ক্রমান্বয়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে মুসলমানদের অস্তিত্ব নিঃশেষ করে দেয়া।

টিপু সুলতান ও নেপোলিয়নের মধ্যকার 'দৃঢ় ঐক্য'-এর প্রতি ইঙ্গিত করে তুর্কীর সুলতান টিপুকে সতর্ক করে দেন যে, আমরা অবগত হয়েছি যে, ফরাসীরা তাদের স্বভাব গোপন ষড়যন্ত্র ভারতেও চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে করে ইংরেজদের নিরাপদ জনপদ ও প্রদেশসমূহে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের সৃষ্টি হয়। আপনার এবং ফ্রান্সের মাঝে 'দৃঢ় ঐক্য' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ফরাসী সেনাবাহিনীর একটি দল মিসর থেকে আপনার কাছে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস, আপনার মতো জ্ঞানী ও বিচক্ষণ শাসকের কাছে ফরাসীদের মূল প্লানের উদ্দেশ্য অস্পষ্ট থাকতে পারে না। অতএব, আমার একান্ত আশা যে, আপনি তাদের প্লানকে চিরতরে ব্যর্থ করে দেয়ার লক্ষ্যে যথার্থ ব্যবস্থা নিবেন। সুলতান সলীম তার পত্রে আরো লিখেন যে সাম্য ও স্বাধীনতার নতুন শ্লোগানের নেপথ্যে ফরাসীরা অপরাপর জাতিকে তাদের গোলাম বানানোর গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। খলীফা লিখেন একথা স্পষ্ট যে, ফরাসীরা বিশ্বের সমগ্র জাতি ও ধর্মকে খতম করে দেয়ার জন্য স্বাধীনতার নামে এক নতুন চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছে। তাছাড়া ফরাসীরা খোদাকে স্বীকার করে না, তারা নাস্তিক। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, খেলাফতে ওসমানীয়ার বিরুদ্ধে তাদের বর্তমান ষড়যন্ত্র একটি গৃণ্য পদক্ষেপ। যার পিছনে রয়েছে প্রাচ্যের সম্পদ লুণ্ঠনের বাসনা। আল্লাহ তাদের এ ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দিন। ইংরেজ রাজশক্তিকে উৎখাত করার কথা বলে তারা মূলতঃ ভারতে প্রবেশ করতে চায়। এরপর তারা তাদের মূল লক্ষ্যের দিকে ফিরে যাবে। মুসলিম জাতির নেতা হওয়ার কারণে তুর্কীর সুলতান টিপুকে আরো জোর দিয়ে লিখলেন যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে তার যেসব অভিযোগ রয়েছে তা যেন তিনি তার সাথে আলাপ করেন। সাথে সাথে সুলতান সলীম টিপুকে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করে দিলেন যে, "গ্রেট বৃটেনের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থাকুন।" দীর্ঘ চিঠির শেষে ওসমানী খলীফা লিখেন, জনাবের কাছে আমাদের বিশেষ আবেদন থাকবে, আল্লাহর ওয়াস্তে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ষড়যন্ত্র থেকে বিরত থাকবেন। ফরাসীদের কথায় কান দিবেন না। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যদি আপনার কোন অভিযোগ থাকে, তাহলে তা আপনি আমাদের জানান, অবশ্য আমরা তা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মেটাতে চেষ্টা করবো। আমাদের আশা ফরাসীদের সাথে বর্তমান আপনার যে সম্পর্ক তা আপনি বর্জন করে গ্রেট বৃটেনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলবেন।

সুলতান সলীমের এই পলিসির কারণে মধ্যপ্রাচ্যের সমাজপতি ও সাধারণ মানুষ নেপোলিয়ন ও সুলতান টিপুর বিরুদ্ধে চলে যায়। ইংরেজরা বিভিন্ন স্থানে চৌকি বসায় এবং গোয়েন্দা জাল বিছিয়ে দেয়, যাতে করে নেপোলিয়নের বাহিনী ভারতে প্রবেশ করতে না পারে। নেপোলিয়ন ইউরোপের সংঘাত প্রাচ্যে মিটানো এবং বৃটেনকে তার এ নয়া উপনিবেশ থেকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে মিসর এসেছিলেন। গ্রীসের মহান আলেকজান্ডারের যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করে তিনি উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ভারতে প্রবেশের চিন্তা করতেন। এদিকে টিপুও নেপোলিয়নের সাক্ষাৎকার সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক পানিপথের ময়দানে হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অতঃপর এখান থেকে সম্মিলিত বাহিনী সমগ্র হিন্দুস্তানে ছড়িয়ে পরে ইংরেজদের সেনা ছাউনিগুলো ধ্বংস করে ইংরেজদের হাত থেকে ভারত মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ মহান উদ্দেশ্যের মাঝে একটি দুর্বল দিক ছিল এই যে, উভয় জেনারেলের সশস্ত্র বাহিনীতে নৌ-শক্তির কোন অস্তিত্ব ছিল না।

১৭৯৮ সালের আগস্ট মাসে বৃটেনের নৌ-বাহিনী প্রধান নেলসন আবু কায়রের যুদ্ধে ফরাসী নৌ-বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এরপর নেপোলিয়নের মিসরে অবস্থান একেবারে অর্থহীন হয়ে গেল। নেলসনের হাতে মার খাওয়ার পর ফরাসী নৌ-বাহিনী এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, তাদের পক্ষে ফরাসী বোম্বাই ও মাদ্রাজের মত দূরতম সাগর পাড়ের এলাকায় অভিযান চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বৃটিশের পক্ষে ছিল। আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক সব শাসকই ইংরেজদের সহযোগিতে পরিণত হয়েছিল। পক্ষান্তরে ইংরেজরা হায়দ্রাবাদের নিজাম মারাঠী ও খোদ মহিশূরের সরদার, জায়গীরদার ও হিন্দু পুঁজিপতিদের সাথে গাটছড়া বেঁধে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে রেখেছিল, যার ফলে সুলতান তার নিজের সীমান্তও অতিক্রম করতে পারছিলেন না।

১৭৯৯ সাল ইংরেজ, হায়দ্রাবাদের নিজাম ও মারাঠীয় সেনাবাহিনী মহিশূরকে ঘিরে ফেলে। ১৭৯৯ সালের ৪ঠা মে উত্তপ্ত দুপুরে সুলতান ফতেহ আলী টিপু শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যান। (ইন্না লিল্লাহে ......রাজেঊন)। এদিকে ভারত মহাসাগর সম্পূর্ণভাবে বৃটেনের নৌ-বাহিনীর দখলে ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের শাসকরা ইংরেজদের পক্ষে ছিল। আর জনগণের মাঝে ফরাসীদের ইসলাম বিরোধিতার প্রচারণা এমন রূপ ধারণ করেছিল যে, কোনভাবে যদি নেপোলিয়ন তার সেনাবাহিনী নিয়ে আরব সাগরের পাড়ে অবতরণ করতেনও তবুও স্থানীয় জনগণের বিরোধিতা, খাদ্য পানীয়ের স্বল্পতা, রাস্তা-ঘাটের অপ্রতুলতা ও আবহাওয়ার প্রতিকূলতার কারণে তার বাহিনীর একজন সৈন্যও জীবিত অবস্থায় তাদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারতো কি না সন্দেহ। তবে সুলতান টিপু ও নেপোলিয়নের মধ্যকার ঐক্য বাস্তবায়িত হলে, তাদের পরিকল্পনা ভণ্ডুল না হলে হয়তঃ ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস ভিন্নভাবে লেখা যেতো।

ইতিহাসের দুর্ধর্ষ সমরনায়ক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট
(১৭৬৯-১৮২১)
ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন

বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় আজও যাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে, এক সময় যাঁর ভয়ে সারা ইউরোপ কাঁপত, যাঁর নাম বলে এককালে ইউরোপের মায়েরা দুষ্ট ছেলেদের ভয় দেখাতেন তিনি ইতিহাসের দুর্ধর্ষ সমরনায়ক এবং ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। অতি সাধারণ এক অবস্থান থেকে তিনি তাঁর ভাগ্য দ্বারা কিছুটা পরিচালিত হয়েই যেন একদিন শুধু ফ্রান্সেরই নন বরং ধরতে গেলে সমগ্র ইউরোপের সম্রাট হতে পেরেছিলেন। জয় করেছিলেন বহু দেশ। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিশাল এক ফরাসী সাম্রাজ্য।

ইতিহাসের কিংবদন্তির মহানায়ক, বিখ্যাত ফরাসী সেনাপতি এবং সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের জন্ম হয়েছিল ভূমধ্যসাগরের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত কার্সিকা নামের একটি ছোট্ট দ্বীপের অ্যাজাক্সিও নামক স্থানে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট। পিতা ছিলেন চার্লস মোর বোনাপার্ট (Charles Mori Bona-Parte)। তিনিও ছিলেন সামরিক অফিসার। কিন্তু তার আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। নেপোলিয়ানের যখন জন্ম হয় তখনও তিনি ছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। নিজ প্রদেশ কার্সিকাকে ফ্রান্সের কবলমুক্ত করার সংগ্রামে ছিলেন চার্লস মোরি বেনাপার্ট। অবশ্য চার্লস মোরীর সেই স্বপ্ন আর সংগ্রাম সফল হয়নি। কার্সিকা ফ্রান্সের কবলমুক্ত হয়নি। বরং চিরস্থায়ীভাবে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলো ফ্রান্সের সাথে। নেপোলিয়ানরা ছিলেন পাঁচ ভাই এবং তিন বোন। নেপোলিয়ান ছিলেন তাদের মধ্যে দ্বিতীয়। ছোট বেলা থেকেই লেখাপড়ার প্রতি একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল নেপোলিয়নের। ইতিহাস, ভূগোল আর অঙ্কের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। ফ্রান্স কার্সিকা দ্বীপের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেছিল নেপোলিয়নের জন্মের মাত্র পনের মাস আগে। কৈশোরে তিনি ছিলেন কার্সিকান জাতীয়তাবাদী এবং তখন তিনি ফরাসীদের মনে করতেন অত্যাচারী দখলদার শত্রু। তা সত্ত্বেও নেপোলিয়ান ফ্রান্সের মিলিটারী একাডেমিতে র্ভতি হন এবং ১৭৮৫ সালে ষোল বছর বয়সে ফরাসী সেনাবাহিনীতে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। চার বছর পর ফরাসী বিপ্লব শুরু হলো আর অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ফরাসী সরকার

বিবিধ বহিঃশক্তির সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো। ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের পর ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই এবং তাঁর পরিবারবর্গকে হত্যা করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হলো। কিন্তু তাতেও দেশের গোলযোগ বন্ধ হল না। ফরাসী বিপ্লবের সেই সকল অগ্নিঝরা দিনগুলোতে যখন প্যারিসের রাজপরিবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিলের দুর্গের পতন ঘটেছিল, সেই সময় তিনি বিপ্লবী সেনাবাহিনীতে তাঁর পূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। ১৭৯৩ সালে নেপোলিয়ান নিজের কৃতিত্ব দেখানোর প্রথম সুযোগটি পেলেন তুলো শহর অবরোধের সময়। এখানে উল্লেখ্য যে, ফরাসীরা এই যুদ্ধে বৃটিশদের কবল থেকে শহরটিকে অবরোধমুক্ত করে। এ সময় পেনোলিয়ান গোলন্দাজ বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর কার্সিকান জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ করে রীতিমতো 'ফরাসী' হয়ে উঠেছিলেন। তুলোর যুদ্ধের কৃতিত্ব তাঁর জন্য নিয়ে এলো পদোন্নতি, তিনি হলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। ১৭৯৪ সালে যখন তিনি ইতালিতে প্রেরিত হয়েছিলেন, তখন তিনি ফরাসী বাহিনীর নেতৃত্ব এত চমৎকারভাবে দিতে পেরেছিলেন যে, পরবর্তী বছর তাকে সর্বাধিকনায়ক করা হয়েছিলো। একটার পর একটা বিচিত্র সব সাফল্য তিনি অর্জন করে যাচ্ছিলেন যুদ্ধের ময়দানে। ১৭৯৬ সালে লাভ করলেন ইতালিতে অবস্থানরত ফরাসী সেনবাহিনীর কমান্ডার পদ। ১৭৯৬-৯৭ সালে ইতালিতে একের পর এক বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধজয় করে নেপোলিয়ান প্যারিসে ফিরলেন বীরবেশে। ১৭৯৭ সালে অস্ট্রিয়ান বাহিনীকে পরাভূত করলেন। এর পরের অভিযাত্রা মিশরে ১৭৯৮ সালে। এ অভিযাত্রা শেষ হলো বিপর্যয়ে। স্থলপথে নেপোলিয়ানের সেনাবাহিনী মোটামুটি সাফল্য লাভ করেছিল। কিন্তু লর্ড নেলসনের নেতৃত্বাধীন বৃটিশ নৌবাহিনী ফরাসী নৌবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। ১৭৯৯ সালে নেপোলিয়ান মিশরে তাঁর সেনাবাহিনীকে ফেলে রেখে ফ্রান্সে ফিরে এলেন। ফ্রান্সে ফিরে নেপোলিয়ান দেখলেন যে, জনগণ তাঁর ইতালি অভিযানের সাফল্যের কথা যতটা মনে রেখেছে, মিশরীয় বিপর্যয়ের কথা ততোটা রাখেনি। এই জনপ্রিয়তাকে মূলধন করে দেশে ফেরার এক মাসের মধ্যেই নেপোলিয়ান এ্যাবেসিয়েস ও অন্যান্যের সাথে একটি অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেন। এই অভ্যুত্থানের ফলে একটি নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো, যার নাম হলো কনসুলেট এবং নেপোলিয়ান সে বছর নভেম্বর মাসে নিজেকে এর পধান কনসাল হিসেবে ঘোষণা করেন।

ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে নেপোলিয়ানের এই উত্থান ছিলো অভিশ্বাস্য রকম ক্ষিপ্র। ১৭৯৩ এর আগস্ট মাসে তুলো অভিযানের আগে নেপোলিয়ান ছিলেন কেবলই

একজন চব্বিশ বছর বয়স্ক, জন্মগতভাবে আধা-ফরাসী ক্ষুদে অফিসার। আর ছয় বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ত্রিশ বয়স না হতেই তিনি হলেন ফ্রান্সের অবিসংবাদিত এক শাসক। সে অবস্থান তিনি বজায় রাখেন পরবর্তী আরো চৌদ্দটি বছর। ক্ষমতায় থাকাকালে নেপোলিয়ান ফ্রান্সের প্রশাসন এবং আইন ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। যেমন, তিনি অর্থনৈতিক কাঠামো ও বিচার বিভাগ সংস্কার করেন, ব্যাংক অব ফ্রান্স এবং ফ্রান্স বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ফরাসী প্রশাসনকে কেন্দ্রীয়করণ করেন। নেপোলিয়ানের একটি সংস্কার ফ্রান্সের সীমানা পেরিয়ে গিয়েছিলো। সেটি হচ্ছে ফরাসী সিভিল কোর্ডের প্রবর্তন, যা কোড নেপোলিয়ান (Code Napoleon) নামে বিখ্যাত। বহুদিক দিয়েই এই কোডে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের আদর্শসমূহ। উদাহারণতঃ এই কোড অনুসারে জন্মগত কোন বিশেষ সুবিধা কারো থাকবে না এবং আইনের চোখে সবাই সমান। একই সঙ্গে, এই কোড আবার সনাতন ফরাসী আইন-কানুন এবং প্রথার সাথেও যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। যার ফলে এটি ফরাসী জনগণ এবং আইন ব্যবসায়ীদের কাছেও গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। সামগ্রিকভাবে এই কোডটি ছিলো মধ্যপন্থী, বিন্যস্ত এবং প্রশংসনীয়ভাবে সংক্ষিপ্ত, অথচ প্রাঞ্জল লিখিত। এর ফলে, কোডটি শুধু ফ্রান্সেই নয়; সামান্য সংশোধনসহ অন্যান্য বহু দেশেও গৃহীত হয়েছে। আজকের ফ্রান্সে প্রচলিত সিভিল কোড বহুদিক থেকেই মূল 'কোড নেপোলিয়ান'-এর অনুরূপ।

১৮০০ সালে নেপোলিয়ান আবার ইতালিতে গেলেন এবং যুদ্ধে বিজয়ী হলেন। নেপোলিয়ানের অন্যতম নীতিই ছিল নিজেকে ফরাসী বিপ্লবের রক্ষাকর্তা হিসেবে উপস্থাপন করা। তা সত্ত্বেও নেপোলিয়ান সংবিধান রচনা করে ১৮০৪ সালে নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। ১৮০২ সালে এমিয়েন্স নামক স্থানে ইংল্যান্ডের সাথে তিনি সন্ধি করেন।

যার ফলে ফ্রান্স প্রায় এক দশকের বিরামহীন যুদ্ধ থেকে কিছুটা স্বস্তি পায়। অবশ্য পরের বছরই সন্ধির অবসান ঘটে, ইংল্যান্ড ও তার মিত্রদের সাথে ফ্রান্সের যুদ্ধ শুরু হয় আবার। নেপোলিয়ানের বাহিনী স্থলযুদ্ধ অবিজিত থাকলেও ইংল্যান্ডের শক্তিশালী নৌ-বাহিনীর সাথে এঁটে উঠতে পারছিলো না। ১৮০৫ সালে ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধে বৃটেনের নেলসন মৃত্যুবরণ করলেও ফরাসী নৌবাহিনীকে পরাজিত করে দিতে সক্ষম হলেন। এরপর থেকে সমুদ্রপথে ইংল্যান্ডের কর্তৃত্ব হয়ে ওঠে নিরঙ্কুশ। নেপোলিয়ান ট্রাফালগার যুদ্ধের ছয় সপ্তাহ পরে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ২ ডিসেম্বর তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম বিজয়টি অর্জন করেছিলেন। ইউরোপের দুই

বিরাট শক্তি অষ্ট্রিয়া এবং রাশিয়াকে অস্টারলিজের বিখ্যাত যুদ্ধে পরাজিত করলেন। কিন্তু ট্রাফালগারের মহাবিপর্যয়ের ক্ষতি আর তিনি পুষিয়ে নিতে পারেননি। এরপর প্রুশিয়ার বাহিনীকে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ অক্টোবর এক যুদ্ধে পরাভূত করেন। এভাবে একমাত্র বৃটেন ছাড়া ধরতে গেলে বাকী সব ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে তিনি পরাজিত করেছিলেন। ১৮০৮ সাল পর্যন্ত সারা ইউরোপে তাঁর ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত। ১৮০৮ সালে নেপোলিয়ান নির্বোধের মতো সাইবেরীয় উপদ্বীপে একটি অর্থহীন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। বেশ কয়েক বছর ফরাসী বাহিনী এই যুদ্ধে ব্যস্ত থাকে। নেপোলিয়ান এদিকে বৃটেনকে কিভাবে পদানত করা যায় তা নিয়ে চিন্তিত হলেন। সেই জন্য তিনি একটি মহাদেশীয় ব্যবস্থার পরিকল্পনা নিলেন। যার ফলশ্রুতিতে বৃটেনের সমস্ত সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়া সম্ভব হতো এবং বৃটেন তার কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হতো। কিন্তু রাশিয়া এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করলো না। ১৮০৭ সালে নেপোলিয়ান এবং রাশিয়ার জার টিলসিট চুক্তি সম্পাদন (Treaty of Tilsit) করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে, তাঁরা চিরকাল মিত্র থাকবেন। কিন্তু এই মৈত্রী শীঘ্রই মনান্তরে পরিণত হয় এবং ১৮১২ সালের জুন মাসে নেপোলিয়ান তাঁর "অজেয় বাহিনী" নিয়ে রাশিয়া আক্রমণ করেন। কিন্তু এ যুদ্ধে তাঁর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠল। মস্কো অভিযান ছিল নেপোলিয়ানের মস্ত বড় ভুল। রুশ বাহিনী সাধারণত মুখেমুখি যুদ্ধ পরিহার করায় নেপোলিয়ান অপ্রতিহতভাবে এগিয়ে চললেন। সেপ্টেম্বরের মধ্যেই দখল করে নিলেন মস্কো। রুশরা অবশ্য শহরটিতে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করে দিলো। নেপোলিয়ান পাঁচ সপ্তাহ ধরে মস্কোতে অবস্থান করলেন এই আশায় যে, রুশরা শান্তির প্রস্তাব নিয়ে আসবে। কিন্তু তা ঘটলো না। অবশেষে নেপোলিয়ান প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু ততো দিনে খুব দেরী হয়ে গেছে। রাশিয়ায় প্রচণ্ড শীত নেমে এলো। তার সাথে যুক্ত হলো রুশ সেনাবাহিনী এবং ফরাসী সেনাদের ফুরিয়ে যাওয়া রসদ। যেন মরার উপর খাড়ার ঘা। সব মিলে নেপোলিয়ানের প্রত্যাবর্তনমুখী দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। নেপোলিয়ানের 'গ্রান্ড আর্মি'-এর শতকরা দশভাগেরও কম সৈন্য রাশিয়া থেকে জীবিত ফিরেছিল। নেপোলিয়ানের এই রাশিয়া ত্যাগ ইতিহাসে 'মস্কো থেকে প্রত্যাবর্তন' নামে খ্যাত হয়ে আছে। ফ্রান্সের সব শত্রু-দেশগুলো তাঁর এই ব্যর্থ অভিযানে খুবই উৎসাহিত হলো এবং তারা ফ্রান্সকে পরাজিত করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। অস্ট্রিয়া এবং প্রুশিয়ার মতো ইউরোপীয় দেশগুলো ফরাসী দখলদারীর জোয়াল কাঁধ থেকে নামাবার একটা সুযোগ পেয়ে গেলো। তারা একত্রিত হলো নেপোলিয়ানকে পরাস্ত করতে এবং প্যারিস নগরীতে প্রবেশ করতে সিংহাসন

ত্যাগে তাকে বাধ্য করলো। এর পরের বছর তিনি পদত্যাগ করলেন। তাঁকে ইতালীয় তটরেখার কাছাকাছি এলবা নামক ছোট দ্বীপে নির্বাসিত করা হলো। জানা যায়, ক্রমাগত ৪৮টি ছোট বড় বিভিন্ন প্রকারের যুদ্ধে একাধারে বিজয়ের পর জীবনে সেই যুদ্ধে তাঁর ঘটলো প্রথম পরাজয়। এর পরের বছরই অর্থাৎ ১৮১৫ সালে তিনি এলবা থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হলেন। ফিরলেন ফ্রান্সে এবং পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁর পুরনো সেনাবাহিনীকে তাদের অফিসারদেরসহ আবার তাদের একত্রিত করলেন বৃটিশ এবং প্রুশিয়ান বাহিনীর যৌথ নেতৃত্বের মোকাবিলা করতে। কিন্তু অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করলো তাঁর বিরুদ্ধে। অবশেষে ১৮১৫ সালের ১৮ জুন বেলজিয়ামের অন্তর্গত ওয়াটারলুর ইতিহাসে খ্যাত যুদ্ধে আবার ভাগ্যের বিরূপ কষাঘাতে নেপোলিয়ানের ঘটলো পরাজয়। সিংহাসনে পুনরারোহণের একশ দিন পরে তিনি শেষবারের মতো এবং চূড়ান্তভাবে ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটনের হাতে পরাজিত ও বন্দী হন। নেপোলিয়ানকে পূর্ব আফ্রিকা থেকে ১৮০০ কিলোমিটার দূরবর্তী সেন্ট হেলেনা নামক দক্ষিণ আটলান্টিকের একটি ছোট দ্বীপে নির্বাসিত ও বন্দী করে রাখা হলো এবং কঠোর প্রহরাধীনে রাখার ব্যবস্থা হলো।

পর্তুগীজ নাবিকরা এই সেন্ট হেলো দ্বীপটি আবিষ্কার করেন ১৫০২ খৃস্টাব্দে। উনিশ শতক পর্যন্ত দ্বীপটি ছিলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকারে। পরে বৃটিশ সরকার দ্বীপটির শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করেন। দ্বীপটির অবস্থান হলো দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন শহর থেকে ২৮১৭ কিলোমিটার দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে। চারদিকে অনন্ত বিস্তৃত সাগর। বিশ্বের সভ্যতা এবং মানবজাতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি স্থান। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এর দূরত্ব হলো ২৮৯৮ কিলোমিটার এবং ইংল্যান্ড থেকে দূরত্ব হলো ৬৪৪০ কিলোমিটার। দ্বীপটি থেকে সবচেয়ে কাছের যে ডাঙ্গাভূমি, সেটিও ১১২৭ কিলোমিটার দূরে। এই দূরত্ব এবং নির্জনতার জন্যই ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে দ্বীপটিকে নেপোলিয়ানের নির্বাসন স্থান হিসেবে পছন্দ হয়েছিলো, যাতে বন্দী শত চেষ্টা করেও পালাতে না পারেন। এমনকি বাইরের পৃথিবীর সাথেও কোন রকম যোগাযোগ রক্ষা না করতে পারেন। মোটামুটিভাবে তাঁকে একেবারে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে ফেলা হলো। শুধু নিয়মমাফিক মৃত্যু হলো না, এই পার্থক্য। ৬ ই মে ১৮২১ খৃস্টাব্দে মাত্র বায়ান্ন বছর বয়সে প্রাণত্যাগ করলেন ফরাসী দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব, ইতিহাসের এক কিংবদন্তী ও মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। ১৮৪০ খৃস্টাব্দে তাঁর লাশ আবার প্যারিসে এনে একটা চমকপ্রদ কবরে শায়িত করা হলো। কিন্তু

নেপোলিয়ানের মৃত্যু কিভাবে হয়েছিল তা নিয়ে অনেক রহস্য রয়ে গেলো। অতি সম্প্রতি এই রহস্যের জট খুলেছে।

সারা বিশ্বের মানুষকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়ে সম্প্রতি উদঘাটিত হয়েছে এক অবিশ্বাস্য নেপথ্য কাহিনী। ফ্রান্সের সম্রাট ও সমরনায়ক, মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। অথচ ইতিহাসে আজো লেখা রয়েছে ভিন্ন কথা। ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নেপোলিয়ান দ্বিতীয়বারের মতো বন্দী হন ইংরেজদের হাতে ১৮১৫ সালে। তাঁকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিলো নির্জন সেন্ট হেলেনা (St-Helena) দ্বীপে। সেখানে পাঁচ বছরের বন্দী জীবন কাটিয়ে নেপোলিয়ান মারা যান ক্যান্সার জাতীয় এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে। এই ছিলো ইতিহাসে প্রচারিত তথ্য– বিজয়ী ইংরেজ কর্তৃক রচিত ইতিহাস। কিন্তু সে তথ্য সত্যি নয়। সেন্ট হেলেনা দ্বীপে বন্দী নেপোলিয়ানের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। তাঁকে সচুতুর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কৌশলে আর্সেনিক বিষ প্রয়োগে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই চরম সত্যকে চাপা দেয়া হয়েছিল পরে। সেই চাপা দেয়া সত্য দুদিন পরে হরেও প্রকাশিত হয়েছে। আর এই চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর কাহিনীর আবিষ্কারক ডাঃ স্টেন ফরসোফবাড (Sten Forshufvud) হলেন সুইডেনের এক দন্ত চিকিৎসক।

সমরনায়ক হিসেবে নেপোলিয়ানের জীবন একটি বিস্ময়কর ধাঁধার মতো। যুদ্ধ কৌশলে তাঁর প্রতিভা ছিল চোখ ধাঁধিয়ে দেয়ার মতো। শুধু এই একটি দিকের বিচারে তাঁকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জেনারেল আখ্যা দেয়া যায়। কিন্তু বৃহৎ সমর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তিনি প্রায় বিশাল ভুল করেছেন, মিশর এবং রাশিয়ার অভিযান তার দৃষ্টান্ত।

নেপোলিয়ানের একটি কাব্য পরবর্তীকালে সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে আনে। ১৮০৩ সালে তিনি বিশাল এক ভূখণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিক্রি করে দেন। তিনি বুঝেছিলেন যে উত্তর আমেরিকার ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলকে ভবিষ্যতে বৃটিশ আগ্রাসন থেকে বাঁচানো কঠিন হবে। তাছাড়া তাঁর অর্থ সংকটও হয়েছিলো। “লুই জিয়ানা পার্চেচ” নামে খ্যাত ইতিহাসের বৃহত্তর এই শান্তিপূর্ণ ভূমি হস্তান্তরের ফলে যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রায় মহাদেশ আকারের দেশ হিসেবে গড়ে উঠে। ‘লুইজিয়ানা পার্চে’ না হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি রকম হতো তা বলা কঠিন, তবে তা আজকের যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটা বৃহৎ শক্তি হতে পারতো কি না সন্দেহ।

নেপোলিয়ান এক সময় বিশ্ব জয় করতে চেয়েছিলেন, অনেক বড় বড় যুদ্ধে অবিশ্বাস্য ও চরমভাবে জয়ী হয়েছেন। তাই অনেকের হয়তো জানতে ইচ্ছে করে,

তিনি মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন। তাঁর প্রাত্যহিক জীবনটা ছিল খুব সুশৃঙ্খল। তিনি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতেন। কিন্তু বিছানা ত্যাগ করতেন না। বিছানায় শুয়েই বাইরের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করতেন। এটা ছিল তাঁর শখ। তিনি অনেক রাতে ঘুমাতে যেতেন। কিন্তু দেরীতে ঘুমাতে গেলেও এক ঘন্টার বেশী ঘুমাতেন না। দুপুর রাতে উঠে আবার কাজ শুরু করতেন। শোনা যায়, অনেকবার যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়ার পিঠেই নাকি আধঘন্টা খানেক ঘুমিয়ে নিতেন।

মহাবীর নেপোলিয়ান ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছিলেন, এ কথা শুনে অনেকেই হয়তো চমকে উঠবেন। কেউ কেউ এ কথা বিশ্বাসই করতে চাইবেন না। কিন্তু জগতে এমন অনেক বাস্তব ঘটনাও ঘটে যা রূপকথাকেও হার মানায়। তেমনি এক আশ্চর্যজনক সত্য যে, নেপোলিয়ান ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে কায়রোর জাম-ই আজহারের বিখ্যাত 'গ্রান্ড মসজিদে' প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তখন থেকেই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমানের ন্যায় জীবন যাপন করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি যখন Sent Helena দ্বীপে অন্তরীণ ছিলেন তখনও ফরাসী ভাষায় অনূদিত পবিত্র কুরাআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন. মিশরের ইতিহাসে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। ইসলাম গ্রহণ উপলক্ষে নেপোলিয়ান সে বাণী প্রচার করেন তার দলিল কায়রোর দপ্তরখানায় এখনো রক্ষিত আছে। নেপোলিয়ানের জীবনী বা তাঁর বিজয় অভিযানের বিষয় নিয়ে যে সমস্ত পুস্তক রচিত হয়েছে সেগুলোতে তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত না হওয়া গেলেও তৎকালীন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের ডায়েরিতে তাঁর ইসলাম গ্রহণের সত্যতার বহু প্রমান মেলে। Blint-এর Future of Islam নামক গ্রন্থে নেপোলিয়ানের ইসলাম গ্রহণের আভাস আছে। Las cases এর Diary তে এ সম্বন্ধে আরো অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। Las cases নেপোলিয়ানের সমসাময়িক এবং তাঁর পরম সুহৃদ ছিলেন। উক্ত ডায়েরিটি ফরাসী সরকার আটক করে এ সম্পর্কে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে আসছেন। কাউকে তা পাঠ করতে দেয়া হয় না। ফ্রান্স নিজে ক্যাথলিক ধর্মের কেন্দ্র হিসেবে নেপোলিয়ানের ন্যায় জগৎখ্যাত বীরশ্রেষ্ঠ সিংহপুরুষ যে খৃষ্ট ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, সে কথা জগৎ সমক্ষে প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করবে, তাতে আর সন্দেহ কি! বিশিষ্ট ইংরেজ নওমুসলিম ধর্ম প্রচারক Dr. Khaled Sheldrake বলেন, নেপোলিয়ান যখন মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানকালে উক্ত দেশে কিছুকাল অবস্থান করেন, সে সময় বিখ্যাত জামে-আল-আজহারে তিনি স্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক ইসলামের শান্ত-শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নেপোলিয়ান

মিশর অবস্থানের সময় তিনি যখনই কোন বিবৃতি ঘোষণা করতেন, ইসলামী নিয়মানুযায়ী– "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" ব্যবহার করতেন। পরবর্তীকালে তিনি যখন ফ্রান্সে অবস্থান করেন ও ইংরেজ কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে Sent Helena দ্বীপে কারাবরণ করেন সে সময়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বহুবার তাঁকে We Muslims (আমরা মুসলমান) এ বাক্যটি ব্যবহার করতে শোনা গেছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি শুধু নামে মাত্র মুসলমান ছিলেন না। ইসলামকে তিনি অন্তরের সাথেও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি লুকায়িত ছিল না। বরং ইসলামের মধ্যে শাশ্বত সুন্দর সত্য ও মুক্তির পথ পেয়েই তিনি এর প্রতি আকৃষ্ট হন। Pope কর্তৃক তিনি মুকুট গ্রহণ করতে স্বীকৃত হননি। পক্ষান্তরে ইসলামের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। যা কোন খৃস্টান পাদ্রীই আশা কতে পারেনি। মহান বীর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট তাঁর নবী সম্বন্ধে সর্বজনবিদিত যে উক্তি করেছেন তা একজন খাঁটি মুসলমানের পক্ষেই সম্ভব। তিনি বলেছেন, "আমি প্রশংসা করি স্রষ্টার এবং আমার শ্রদ্ধা রয়েছে নবী ও পাক কুরআনের প্রতি। ... আমি আশা করি সে সময় খুব দূরে নয়, যখন সবক'টি দেশের বিজ্ঞ ও শিক্ষিত লোকদেরকে আমি একতাবদ্ধ করতে এবং কুরআনের যে নীতিসমূহই একমাত্র মানুষকে শান্তির উপর ভিত্তি করে এক সমরূপ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।"

(Star of India তে প্রকাশিত Dr. Khaled Sheldrake এর বক্তৃতা, ১৩৪১ সালের আশ্বিন সংখ্যার গুলিস্তান থেকে সংগৃহীত, তর্জমা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ)

বিপ্লবী সাহাবী বীর মুজাহিদ হযরত বারায়া বিন মালেক আল-আনসারী (রাঃ) জীবন ও যুদ্ধ

হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) এর একনিষ্ঠ খাদিম, জলিলুল কদর সাহাবী হযরত আনাস বিন্ মালেক (রাঃ) এর ছোট ভাই ছিলেন বারা'য়া বিন্ মালেক আল আনসারী। তিনি অত্যন্ত হালকা-পাতলা গড়নের ছিমছাম দেহবিশিষ্ট ছিলেন। মাথায় ছিল কোঁকড়ানো চুল। এই যুবক সাহাবী ছিলেন এতই হালকা পাতলা দেখলে মনে হতো খুবই দুর্বল। অথচ তার বুদ্ধিমত্তা, অদম্য সাহসিকতা, প্রবল ঈমানী চেতনা ও অসাধারণ সমর কৌশল রীতিমত ইতিহাস হয়ে আছে।

এই ক্ষীণ দেহের অধিকারী বারা'য়া বিন মালেক আল আনসারী শুধু মল্লযুদ্ধেই শতাধিক মুশরিক যোদ্ধাকে পরাভূত করে জাহান্নামে প্রেরণ করেন। মল্লযুদ্ধ ছাড়াও সম্মুখ সমরে যে কত কাফির ও মুশরিককে জাহান্নামে পাঠিয়ে ইসলামের বিজয়কে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। যুদ্ধের দামামা তার রক্তে এমন ক্ষীপ্রতা ও তেজস্বিতার সৃষ্টি করতো যে নিজ দলবল পিছনে রেখে একাই শত্রুপক্ষের প্রাচীর ভেদ করে দু'মুখো তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর এই ব্যাকুল অগ্রগামিতা লক্ষ্য করে খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ফারুক (রাঃ) তাঁর প্রতি সমগ্র মুসলিমবিশ্বের সেনাপতিদের কাছে এই বলে ফরমান জারি করেনঃ

"বারা'য়া মালেক আল আনসারীকে যুদ্ধক্ষেত্রে কোন ইউনিটের দায়িত্ব যেন না দেয়া হয়। কারণ আমি আশংকা করছি যে, শত্রুবাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বারা'য়া বিন মালেক আল আনসারী যুদ্ধ করার যে মানসিকতা রয়েছে, যার ফলে তার অধীনস্থ সমগ্র বাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সমুহ বিপদের সম্মুখীন হবে।"

বারা'য়া বিন মালেক আল আনসারী (রাঃ) এর ইতিহাস সৃষ্টিকারী অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে একটিমাত্র ঘটনা সম্মানিত পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে।

হযরত বারা'য়া বিন মালেক আল আনসারী (রাঃ)-এর সাহসিকতার পরিচয় ফুটে উঠে রাসুলে কারীম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর। যখন নবদীক্ষিত মুসলমানেরা দলে দলে ভণ্ড নবীদের দলে শামিল হচ্ছিল। ইসলামের এই চরম দুর্যোগ মুহূর্তে আল্লাহ যাদের দৃঢ় মনোবল এবং ঈমানী মজবুতি দান করেছিলেন, শুধু তাঁরা ব্যতীত অন্য সকলেই মুরতাদদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তায়েফ, মক্কা ও মদীনাসহ বিক্ষিপ্ত কিছু গোত্র ছাড়া বাকি সর্বত্রই এই ফেতনা ব্যাপকভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল ।

এই দুর্যোগ মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামের হিফাজতের জন্য আমিরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)কে চতুর্মুখী ফেতনা মোকাবেলার যোগত্যা ও দৃঢ়তা দান করেন। তিনি পাহাড়সম অটল হয়ে একাধারে যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের এবং ভণ্ডনবী ও তাদের অনুসারী মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন। আনসার এবং মুজাহিদদের সমন্বয়ে তিনি সশস্ত্র দশটি বিশেষ বাহিনীকে তৈরি করে প্রত্যেক বাহিনীর জন্য আলাদা আলাদা ঝাণ্ডা নির্ধারণ করলেন। ভণ্ডনবীদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে বিপদগামী ও ধর্মত্যাগী মুরতাদদের এসব বাহিনীকে আরব বিশ্বের চতুর্দিকে প্রেরণ করেন।

ভণ্ডনবী ও তাদের অনুসারী মুরতাদদের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ছিল বনু হানিফা সম্প্রদায়ের মুসায়লামাতুল কায্যাবের। মুসায়লামাতুল কায্যাব তার নিজস্ব গোত্র এবং সন্ধিতে আবদ্ধ সম্প্রদায়সমূহের সুদক্ষ চল্লিশ হাজার যোদ্ধার এক বিশাল বাহিনী গড়ে তুলেছিল। এই বাহিনী ইসলামের জন্য বিরাট এক চ্যালেঞ্জ ছিল। যাদের অধিকাংশই ছিল সংকীর্ণ ভৌগলিক ও বংশীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। যারা ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধের পরিবর্তে গোত্রীয় গোড়ামী, সংকীর্ণতা ও আঞ্চলিকতার শিকারে পরিণত হয়েছিল। তাদের মতে অনেকের ভাষ্য এই ছিল ঃ

"আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে মুসায়লামাতুল কায্যাব একজন ভণ্ডনবী এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সত্যবাদী নবী। কিন্তু আমাদের কাছে সত্যবাদী নবীর চেয়ে স্বগোত্রীয় ভণ্ডনবী ও মিথ্যাবাদী মুসায়লামাতুল কায্যাবই ভাল।"

আমিরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর (রাঃ) মুসায়লামাতুল কায্যাবের মোকাবেলা করার জন্য আবু জেহেলের ছেলে একরামার নেতৃত্বে যে বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, মুসায়লামাতুল কায্যাবের বিশাল বাহিনীর প্রচণ্ড হামলার মুখে পরাজিত হয়ে তারা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) খালিদ বিন্ ওয়ালিদের নেতৃত্বে আনসার এবং মুহাজির সাহাবাদের মধ্যে বিশিষ্ট যোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত যে বাহিনী প্রেরণ করেন তাদের মধ্যে হযরত বারা'য়া বিন্ মালেক আল আনসারীও ছিলেন।

হযরত খালিদ বিন্ ওয়ালিদ (রাঃ) ভণ্ডনবী মুসায়লামাতুল কায্যাব এবং তার অনুসারীদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে পুণরায় ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য সাহাবী যোদ্ধাদের এই বিশেষ বাহিনী নিয়ে দ্রুতগতিতে নজদের 'ইয়ামামা' নামক প্রান্তরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মুহূর্তের মধ্যেই উভয়পক্ষের মধ্যে এক প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধ শুরুর প্রায় সাথে সাথেই মুসায়লামাতুল কায্যাবের বিশাল সশস্ত্রবাহিনী মুসলিম বাহিনীকে কাবু করে ফেলে। অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, সুশৃংখল

মুসলিম বাহিনীর পায়ের নীচের মাটি যেন ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিল। নিজেদের অবস্থান থেকে ক্রমেই তারা পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছিল। এ নাজুক মুহূর্তে মুসায়লামাতুল কায্যাবের বাহিনী অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি খালিদ বিন্ ওয়ালিদের তাঁবুতে হামলা করে তাঁবুর খুঁটি উপড়ে ফেলে। এমনকি সেখানে অবস্থানরত খালিদ বিন্ ওয়ালিদের স্ত্রীকে হত্যার জন্য উদ্যত হলে মুসায়লামাতুল কায্যাব বাহিনীরই একজন যোদ্ধা জাহেলিয়াতের প্রথানুযায়ী 'যুদ্ধক্ষেত্রে শিশু ও নারীদের হত্যা করা কাপরুষোচিত ও গর্হিত কাজ'- এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে রক্ষা করেন।

এ চরম বিশৃংখল অবস্থায় মুসলিম যোদ্ধারা নিশ্চিত পরাজয়ের আশংকায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। তারা একথা মনে করছিলেন যে, মুসায়লামাতুল কায্যাবের কাছে আজ পরাজয়ের পর এই আরব বিশ্বে ইসলামের নাম উচ্চারণ করার মত আর কোন ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকবে না। শিরকমুক্ত এই জাজিরাতুল আরবে তৌহিদীদের বাণী উচ্চারণ ও আল্লাহর ইবাদত করার জন্য কেউ সাহস করবে না। সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের নিজ তাঁবু আক্রান্ত হওয়ার পর এই চরম নাজুক মূহূর্তে খালিদ বিন ওয়ালিদ বিক্ষিপ্ত মুসলিম বাহিনীকে তৎক্ষণাৎ পুনর্গঠিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সাথে সাথে তিনি মুহাজির, আনসার, শহরবাসী ও মরুবাসী বন্ধু যোদ্ধাদের ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীতে বিভক্ত করে প্রত্যেক কোম্পানীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঝাণ্ডা নির্ধারণ করেন। যেন প্রত্যেক বাহিনী স্বীয় অস্তিত্বের স্বার্থেই শত্রু বাহিনীর মোকাবেলায় মরণপণ চেষ্টা চালায় এবং কোন গ্রুপের পক্ষ থেকে দুর্বলতা প্রকাশ পায় তাও চিহ্নিত করা সহজ হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উভয় বাহিনীর মাঝে পুনরায় যুদ্ধ বেঁধে গেল। ভয়াবহ সে যুদ্ধ! মুসলিম যোদ্ধারা এর পূর্বে এমন মারাত্মক কোন সংঘর্ষ কখনও প্রত্যক্ষ করেননি। এবার বীর বিক্রমে মুসলিম বাহিনী শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা মুসায়লামাতুল কায্যাবের বাহিনীর যোদ্ধাদের ধরাশায়ী করে ইয়ামামার ময়দান লাশের স্তুপে পরিণত করে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। অপরপক্ষে, মুসায়লামাতুল কায্যাবের বাহিনী তাদের এই মারাত্মক ক্ষয়-ক্ষতি প্রত্যক্ষ করেও যুদ্ধ ময়দানে তখনও পাহাড়ের মত অটল হয়ে মুসলমানদের মোকাবেলা অব্যাহত রাখল। মুসলিম যোদ্ধারা ঈমানী চেতনায় বলিয়ান হয়ে যুদ্ধের ক্ষিপ্রতাকে আরও তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলছিল।

হযরত ছাবেত বিন্ কায়েস (রাঃ) মুসলিম যোদ্ধাদের আনসার বাহিনীর ঝাণ্ডাবরদার ছিলেন। তিনি যুদ্ধের এই তীব্রতাকে লক্ষ্য করে তার পরিচালিত

বাহিনীর এই ঝাণ্ডাকে পিছনে সরিয়ে নিতে হতে পারে, তা আঁচ করে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ ময়দানে তাঁর দু'পায়ের হাঁটু পর্যন্ত মাটির নিচে গেড়ে ফেললেন। মুহূর্তেই শত্রু সৈন্যরা তার বহনকৃত ঝাণ্ডাকে ভূলুণ্ঠিত করার জন্য তার ওপর আঘাত হানতে শুরু করল। তিনি একহাতে ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রেখে অন্যহাতে তরবারী পরিচালনা করে এ আক্রমণ প্রতিহত করতে করতে এক পর্যায়ে দুশমনের তরবারীর আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

যুদ্ধের এই তীব্রতা ও প্রচণ্ডতার মাঝে মুহাজির বাহিনীর মধ্য হতে আমিরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রাঃ)-এর ভাই যায়েদ ইবনুল খাত্তাব দুশমনদের উপর আরও তীব্রগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য মোহাজিরদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলছিলেন ঃ

'হে যোদ্ধারা! আরও ক্ষীপ্রগতিতে আঘাত হান, সম্মুখ পানে অগ্রসর হও, শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়। হে যোদ্ধারা! জেনে রাখ, এটাই তোমাদের প্রতি আমার শেষ আহ্বান। হয় আজ মুসায়লামাতুল কায্যাবকে নিশ্চিহ্ন করবো অথবা শহীদ হয়ে আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যাব।'

এ আহ্বানের সাথে সাথেই সমস্ত মুসলিম মুজাহিদ নবচেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে শত্রু বাহিনীর উপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে শুরু করল। হযরত যায়েদ বিন্ খাত্তাব (রাঃ) দু'হাতে তরবারী চালাতে চালাতে ক্ষীপ্রগতিতে দুশমনদের ধরাশায়ী করার এক পর্যায়ে শত্রুর আঘাতে তিনি শাহাদাতের কোলে ঢলে পড়ে তাঁর কৃত ওয়াদাকে বাস্তবে প্রমাণিত করেন।

আবু হুযায়ফার কৃতদাস হযরত ছালেম (রাঃ)-এর উপর মুহাজির বাহিনীর ঝাণ্ডা বহন করার দায়িত্ব অর্পিত হয়। মুহাজিরগণের অনেকেই তাঁর প্রতি আশংকা পোষণ করছিল যে, যুদ্ধের ভয়াবহতার কারণে তিনি সন্ত্রস্তবোধ করবেন। তারা তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমরা আশংকা করছি যে, তুমি যুদ্ধের প্রচণ্ডতায় ভীত হয়ে পশ্চাদপসরণ না করে বস'। প্রতি উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি যদি এ যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করি তাহলে আমার চেয়ে নিকৃষ্টতম হাফেজ কুরআন আর কে হতে পারে? অতঃপর তিনি বীর বিক্রমে দুশমনদের প্রতি আঘাত হানতে হানতে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। মুরতাদদের তরবারীর আঘাতের পর আঘাতে তাঁর গোটা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি ইসলামের ঝাণ্ডাকে এক মুহূর্তের জন্য ভূলুণ্ঠিত হতে দেননি।

কিন্তু এ যুদ্ধে বারা'য়া বিন্ মালেক আল আনসারীর বীরত্বের কাছে এসব ঘটনা একেবারে নগণ্য বলে মনে হবে। হযরত খালিদ বিন্ ওয়ালিদ উভয়পক্ষের প্রাণপণ

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের এই প্রচণ্ডতার মধ্যে চূড়ান্ত আঘাতের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় ছিনিয়ে আনার জন্য হযরত বারা'য়া বিন্ মালেক আল আনসারী (রাঃ)কে উদ্দেশ্যে করে বলেন, 'দুশমনদের উপর ঝাঁপিয়ে পড় হে আনসার যুবক...!' হযরত খালিদ বিন্ ওয়ালিদের এই নির্দেশ পেয়ে হযরত বারা'য়া (রাঃ) তাঁর বাহিনীর যোদ্ধাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন ঃ

'হে আনসার ভাইয়েরা! কখনো আপনারা মদীনায় ফিরে যাওয়ার চিন্তা করবেন না। এ মুহূর্ত হতেই আপনাদের জন্য আর মদীনা নয়। তাওহীদের বাণীকে চিরসমুন্নত করে জান্নাতের পানে অগ্রসর হোন।'

এই বলে তিনি তাঁর বাহিনীর নিয়ে শত্রু বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হযরত বারা'য়া বিন্ মালেক (রাঃ) দক্ষতার সাথে দু'ধারী তরবারী চালিয়ে তার দু'পার্শ্বের দুশমনদের ধরাশায়ী করে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। মুসায়লামাতুল কায্যাব-এর যোদ্ধাদের শিরোশ্ছেদ করতে করতে তিনি এক মহাকাণ্ড সৃষ্টি করলেন। এ আঘাতে মুসায়লামাতুল কায্যাব ও তার বাহিনীর মধ্যে হঠাৎ ভীতি ও ত্রাসের সৃষ্টি হলো। অবস্থা বেগতিক দেখে তারা যুদ্ধ ময়দান সংলগ্ন বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। যে বাগানটি পরবর্তী সময়ে অগণিত মৃতদেহের স্তূপের কারণে 'হাদিক্বতুল মাউত' বা 'মৃত্যুর বাগান' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নানাবিধ ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাগানটি উঁচু ও প্রশস্ত দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত ছিল। যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে প্রাণ রক্ষার জন্য মুসায়লামাতুল কায্যাব ও তার অনুসারী যোদ্ধারা বাগানে আশ্রয় নিয়ে দ্রুত এর একমাত্র গেটটি বন্ধ করে দেয়। অতঃপর নিজেরা নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে তার ভিতর থেকে মুসলমান বাহিনীর উপর বৃষ্টির মত তীর বর্ষণ শুরু করে। এতে মুসলমানদের নিশ্চিত বিজয় আবার অনিশ্চয়তার দ্বারপ্রান্তে যেন উপনীত হয়। মুসলিম যোদ্ধাদের পক্ষে তাদের মোকাবেলা করার সমস্ত পথ যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। এ অবস্থায় মুসলিম বাহিনীর অন্যতম বীরযোদ্ধা হযরত বারা'য়া বিন্ মালেক আল আনসারী (রাঃ) যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তনের মাধ্যমে শত্রুদের প্রতি এক চরম ও শেষ আঘাত হানার জন্য পরিকল্পনা নেন। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি ঢাল সংগ্রহ করে তার বাহিনীর লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমি এ ঢালের উপরে বসে পড়ি, তোমরা ১০/১২টি বর্ষা ফলকের সাহায্যে উপরে তুলে আমাকে এ গেটের ভিতরে নিক্ষেপ কর। হয় আমি দুশমনদের হাতে শহীদ হয়ে যাব অথবা ভিতরে গিয়ে তোমাদের জন্য এ সুরক্ষিত বাগানের গেট খুলে দিব।'

দেখতে না দেখতেই হযরত বারা'য়া উন্মুক্ত তরবারী হাতে বৃহদাকার ঢালটির উপর বসে পড়লেন। অত্যন্ত হালকা-পাতলা ও ছিপছিপে আনসার যুবক হযরত

বারা'য়াকে কয়েক জনে খুব সহজেই ঢালে বসিয়ে মাথার উপরে তুলে নিলেন এবং সাথে সাথে অন্য কয়েকজন বর্শাধারী তাদের বর্শা ফলকে তাকে উপরে তুলে গেটের ভিতরে মুসায়লামাতুল কায্যাবের হাজার হাজার অনুগত যোদ্ধার মাঝে সজোরে নিক্ষেপ করলেন। হযরত বারা'য়া অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের মাঝে বজ্রপাতের ন্যায় লাফিয়ে পড়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে গেট রক্ষী বাহিনীর উপর আক্রমণ শুরু করলেন। অন্যদিকে মুসায়লামাতুল কায্যাবের দুর্ধর্ষ সৈন্যরা চতুর্দিক থেকে ভিমরুলের মত তাঁর গোটা দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেললো। কিন্তু হযরত বারা'য়া বিন্ মালেক আল আনসারী (রাঃ) সিংহের মত বর্শার আঘাতে হুংকার ছেড়ে তাদের বেষ্টনী ভেদ করে পরিশেষে গেট খুলে দিতে সমর্থ হলেন। এদিকে সাথে সাথে অপেক্ষমান বীর মুসলিম যোদ্ধারা আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ-পাতাল প্রকম্পিত করে বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত ভিতরে ঢুকতে শুরু করলেন। সে ছিল এক নজীরবিহীন ভয়াল চিত্র। মুহূর্তেই উভয়পক্ষের মধ্যে পুনরায় ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মুসলমানদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে মুসায়লামাতুল কায্যাবের বাহিনী প্রাণভয়ে দিক্‌বিদিক ছুটাছুটি করতে লাগলো আর মুসলিম যোদ্ধারা এ সুযোগে তাদের দলে দলে নিঃশেষ করে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত সেখানে মুসায়লামাতুল কায্যাবের অবশিষ্ট বিশ হাজার সৈন্যের কবর রচনা করে তাকে তার দেহরক্ষী বাহিনীসহ ঘিরে ফেলে তাদেরকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা হলো। সমস্ত বাগান বিশ হাজার মুরতাদের লাশের স্তূপে পরিণত হয়ে গেল।

অন্যদিকে এই দুঃসাহসী বীরযোদ্ধা হযরত বারা'য়া বিন্ মালেক আল আনসারী (রাঃ) যিনি এ গেট খুলতে গিয়ে তাঁর শরীরে আশিটির অধিক তীর, বর্শা ও তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন, তাঁকে বিশেষ চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা তাঁবুতে প্রেরণ করা হলো। হযরত খালিদ বিন্ ওয়ালিদ (রাঃ) দীর্ঘ এক মাস ধরে নিজে হযরত বারা'য়া (রাঃ)-এর খিদমতে নিয়োজিত থাকলেন। ধীরে ধীরে হযরত বারা'য়া (রাঃ) সুস্থ হয়ে উঠলেন। তাঁর এই মহান ত্যাগ এবং কোরবানীর বদৌলতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁরই হাতে মুসলমানদের এ যুদ্ধে বিজয় দান করে জাজিরাতুল আরবকে চিরদিনের জন্য ভণ্ডনবী ও মুরতাদদের হাত থেকে পবিত্র করলেন।

মুসায়লামাতুল কায্যাব বাহিনীর সাথে ইয়ামামার প্রান্তরে 'হাদিকাতুল মাউতে'র রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে শাহাদাতের মৃত্যুর গৌরব থেকে মাহরুম হয়ে হযরত বারা'য়া বিন্ মালেক আল আনসারী (রাঃ) শাহাদাতের তামান্নায় পরবর্তীতে একের

পর এক সব যুদ্ধে বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা তিনি যেন শাহাদাতের মৃত্যুর মাধ্যমে হযরত রাসূলে কারীম (সাঃ) এর সাথে জান্নাতে মিলিত হতে পারেন।

সর্বশেষে তিনি পারস্য সম্রাটের সাথে মুসলমানদের 'তুসতর' কেল্লা বিজয়ের জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের এক পর্যায়ে সৈন্যরা দুর্ভেদ্য 'তুসতর' কেল্লায় আশ্রয় নিয়ে এর দরজামুখ বন্ধ করে দেয়। মুসলিম যোদ্ধারা এই কেল্লার চতুর্পার্শ্বে অবস্থান নিয়ে কেল্লাটিকে অবরুদ্ধ করে রাখে। ধীরে ধীরে সব রসদ ও সরমঞ্জামাদি নিঃশেষ হয়ে আসলে পারস্য বাহিনী জীবন রক্ষার লড়াইয়ে এক ধ্বংসাত্মক কৌশল অবলম্বন করে। তারা লম্বা শিকলের মাথায় মাছ ধরা বড়শির মত লৌহমির্নিত বড় বড় আংটাগুচ্ছ আগুনে পুড়িয়ে লাল করে কেল্লার উপর থেকে মুসলমানদের উপরে নিক্ষেপ করে তাতে আটকিয়ে যাওয়া যোদ্ধাদের ক্রেনের মত তুলে নিতে শুরু করে। এভাবে বেশ ক'জন মুসলিম যোদ্ধা এর নির্মম শিকারে পরিণত হয়। অকস্মাৎ একটি আংটাগুচ্ছ হযরত বারা'য়া বিন্ মালেকের বড় ভাই হযরত আনাস বিন্ মালেক (রাঃ)-এর দেহে বেষ্টিত হয়ে তাকে তুলে নিতে শুরু করে। হযরত বারা'য়া বিন্ মালেক আল আনসারী কালবিলম্ব না করে এক লাফে শিকলটি ধরে ফেলে এক হাতে ঝুলন্ত অবস্থায় অন্য হাতে আনাস (রাঃ)-এর শরীরে বিদ্ধ গরম আংটাকে খুলতে শুরু করেন। লাল টকটকে পোড়া আংটার দাহে তাঁর হাতের গোশ্ত পুড়ে ধোঁয়া বের হতে লাগলো। কিন্তু তিনি তাঁর জ্বলন্ত হাতের অসহ্য কষ্টের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে হযরত আনাস (রাঃ)কে আংটার হাত থেকে ছাড়ানো মাত্রই এক লাফে নিচে নেমে আসেন।

তখন তাঁর পোড়া হাতে শুধু হাড়গুলো ছাড়া আর কোন গোশ্ত অবশিষ্ট ছিল না।

এই 'তুসতর' কেল্লা বিজয়ের যুদ্ধে তিনি আল্লাহর দরবারে শাহাদাতের মৃত্যুর জন্য দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর এই দোয়া কবুল করে নেন। এই যুদ্ধেরই এক পর্যায়ে তিনি শত্রুর তরবারীর আঘাতে শাহাদাতের মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। বহু আকাংক্ষিত শাহাদাতের মৃত্যুর মাধ্যমে তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যের পথ রচনা করে পরবর্তী উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জান্নাতে হযরত বারা'য়া বিন্ মালেক আল আনসারীর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করুন ও চক্ষুদ্বয় শীতল করুন, তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁকে আনন্দিত করুন এবং আল্লাহ তাঁর প্রতি সহায় হোন।

উদাস ও অনুভূতিপ্রবণ বীর মুজাহিদ কবি আবু মিহ্‌জানের স্মরণীয় কাহিনী

কাদসিয়ার যুদ্ধ। ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা যুগান্তকারী সিদ্ধান্তকর যুদ্ধ। একদিকে প্রায় সোয়া তিন শত বছর ধরে শান-শওকতের সাথে রাজ্য পরিচালনা করে আসা সাসানী খান্দানের যৌবনদীপ্ত সম্রাট "ইয়াজদা গিরদ'। অপরদিকে ইসলামী খেলাফতের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী খলিফা হযরত উমর ফারুক (রাঃ)। একদিকে পারস্যবাসীদের সোনার ছেলে 'পারশ্য' উপন্যাসের কিংবদন্তীর নায়ক বীরবাহু রুস্তম বিন খাল, অপরদিকে মরু হিজাযের শার্দুল রাসূলের মাতুল হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)। এ যুদ্ধেই সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে সাসানীদের পতাকা ধুলায় গড়াগড়ি খাবে, নাকি ইসলামী নূরের ছটায় অগ্নিউপাসকদের অনির্বাণ অনলকুণ্ডগুলো বিবর্ণ ও ফ্যাকাশে হয়ে যাবে চিরদিনের জন্যে।

তৎকালীন দুনিয়ার সেরা পরাশক্তি হিসেবে পারস্যবাসীদের যেমন ছিল জনবল তেমনি ছিল অস্ত্রবল। অহংকারেও তারা ছিল টইটুম্বুর। বিজয়কে তারা মনে করত উত্তরাধিকার সম্পদের মত তাদের একান্ত প্রাপ্য। এতদ্ব্যতীও তাদের সেনাপতির হাতে ছিল সম্রাট ফরিদুনের স্মৃতি স্মারক "দরফশে কাভিয়ানী" নামক পয়মন্ত পতাকা। সব মিলিয়ে তাদের মনোবল ছিল হিমালয় প্রমাণ উঁচু। পক্ষান্তরে মুসলিম বাহিনীতে জনবল ও অস্ত্রবল কম হলেও তাদের দুর্জয় সাহস ছিল সাহারার মত বিস্তৃত। শাহাদতি মৃত্যুর প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল জীবন্ত থাকার আগ্রহের মতই অদম্য। আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণীর "মুসলমানদের এক বাহিনী কিসরার কাসরে আর ইয়াজ (হোয়াইট হাউজ) জয় করে নিবে" স্মরণে তাদের মনোবল ছিল আকাশচুম্বী উঁচু।

যুদ্ধের প্রস্তুতিলগ্নেই খলিফা উমর (রাঃ) যুদ্ধের গুরুত্বের প্রতি খেয়াল করে এই মর্মে এক ফরমান জারি করেছিলেন যে, যেখানেই তোমরা কোন বীরসৈনিক প্রাজ্ঞ কূটনৈতিক, অনলবর্ষী বক্তা ও যাদুকরী ছন্দ প্রতিভার অধিকারী কোন কবির সাক্ষাৎ পাবে তাকেই তোমরা মদীনায় আমার কাছে পাঠিয়ে দিবে। এ ফরমান প্রচারিত হবার পর দলে দলে যে বাগ্মী বীর ও কবিরা ছুটে আসেন তাদের মধ্যে কবি আবু মিহ্‌জান সাকিফী (রাঃ)ও ছিলেন একজন।

সাধারণতঃ যুদ্ধ করা কবিদের ধাতে থাকে না। যুদ্ধের মাঠে তাদের কাজ হচ্ছে, পূর্বসূরীদের শৌর্য-বীর্যের অতীত ইতিহাসকে আবেগময় ছন্দে উপস্থাপন

করতঃ নিজ পক্ষকে উদ্বেলিত করে তোলা। দুর্বলতা দেখামাত্রই তেজিয়ান ছন্দে ধিক্কারের দেয়াল খাড়া করে পালাতে না দেয়া। শত্রুদের করুণ অবস্থার কথা তুলে ধরে উৎসাহিত ও বেপরওয়া করা। প্রতিপক্ষের শত্রুতার পর্যায় বয়ান করে উত্তেজিত করা। আর মল্লযুদ্ধের বীরদের বীরত্ব, তরবারীর চাকচিক্য, রণাঙ্গণের নৈসর্গিক দৃশ্যের বর্ণনা এবং বিজয়ীদের উচ্ছ্বাস ও পরাজিত আর্তনাদকে ছন্দের শিল্পিত বিন্যাসে এনে শ্রোতাদের শ্রবণেন্দ্রীয়ে সুখকর অনুভূতির জন্ম দেয়া। কিন্তু কবি আবু মিহ্‌জান সাকিফী (রাঃ) সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির। তিনি একদিকে ছিলেন একজন অসম সাহসী বীর মুজাহিদ। সুতরাং ইসলাম ও কুফরের মধ্যকার এ যুদ্ধে মরু ওয়েসিসের এ চারণ কবি ছিলেন সকলের আগে আগে। কিন্তু হায়! বিপুল উৎসাহ নিয়ে হিজায থেকে সুদূর কাদসিয়ায় এসে তিনি হয়ে গেছেন এক নির্জন তাঁবুতে কঠিন শৃংখলে বন্দি। অপরাধ হল তিনি মদ পান করেছেন।

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তলওয়ারের ঝন ঝন মিছিল, ঘোড়ার হ্রেষা, মুসলিম মুজাহিদদের পুরা জোশ নারায়ে তাকবির এবং আহতদের আর্তনাদ শুনে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠেন। তাঁর শমশের যেন খাপকোষে থেকে কেঁপে কেঁপে তাকে রক্ত পান করানোর জন্যে ডাকছে। হাত দুটো চুলকাচ্ছে। অদম্য ইচ্ছায় যখনই বেরিয়ে আসতে চাইছেন তখনই লোহার কঠিন শৃংখল তাকে আহত করছে। শেষ পর্যন্ত তিনি কোন মতে নিজেকে জানালার কাছে ঠেলে দিয়ে এতিমের মত চেয়ে থাকেন রণাঙ্গণের প্রিয় দৃশ্যের দিকে।

যুদ্ধের তীব্রতার সাথে সাথে পাল্লা দিতে তাঁর অস্থিরতাও ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। কাছে এমন কাউকে দেখা যাচ্ছে না, যাকে একটু সময়ের জন্য ছেড়ে দেয়ার আবেদন করতে পারেন। এভাবে অসহ্য ৪টি মুহূর্ত কেটে গেলে হঠাৎ করেই দেখতে পান সেনাপতির স্ত্রী হযরত যাবরা (রাঃ) এদিক দিয়ে যাচ্ছেন। কবি আবু মিহ্‌জান তখন অত্যন্ত কাতরস্বরে তাকে ডেকে বললেন ঃ অনুগ্রহ করে আমাকে কিছু সময়ের জন্য ছেড়ে দিন। এ জীবন-মরণ খেলায় আমাকেও একটু অংশ নেয়ার সুযোগ দিন। আমি আপনাকে ওয়াদা দিচ্ছি যে, বেঁচে থাকলে নিজেই এসে শৃংখল পরে নিব। কিন্তু যাবরা (রাঃ) জানেন আবু মিহ্‌জান কোন অপরাধে বন্দি। সুতরাং তিনি ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দেন। আবু মিহ্‌জান তখন হৃদয়ের সমস্ত আকুতি উজাড় করে দরাজকণ্ঠে গেয়ে উঠলেন ঃ

'হায়রে আমার লাঞ্ছিত ভাগ্য!! বীর অশ্বারোহীরা যখন আপন আপন শামশেরের জৌলুস দেখিয়ে চলছেন সে মুহূর্তে আমি বন্ধ প্রকোষ্ঠ নিষ্ঠুর শিকলে বাঁধা। যখনই আমি অদম্য উত্তেজনায় দাঁড়াতে চাই তখনই কঠিন শিকল আমাকে

বসিয়ে দেয়। আর জানালাগুলোও আমার জন্যে অর্গল বন্ধ করে দেয়া হয়, যেন এক অসহায় চিৎকার দিতে দিতে ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে কাতরাতে থাকে।"

করুণ অভিব্যক্তিপূর্ণ একটা পঙক্তি শুনে যাবরার (রাঃ) আর বদরাশত হলো না। তিনি এগিয়ে এসে আবু মিহ্জানের বাঁধন খুলে দিলেন। মুক্ত আবু মিহ্জান তখন মুহূর্তকাল দেরী না করে নিজেকে বর্মাচ্ছিত করে বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুবুহ্যের উপর। এতক্ষণের ফুঁসে ওঠা জোশ গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে তার সূতীক্ষ্ণ তরবারীর অগ্রভাগে। তিনি যে দিকেই ঝাঁপিয়ে পড়েন সে দিকের শত্রুবুহ্যই তছনছ হয়ে যায়। আর্তনাদের রোল পড়ে যায় শত্রুদের খিমায় খিমায় এবং অল্পক্ষণের মধ্যে যুদ্ধের মোড়টাই পাল্টে যায় অলৌকিকভাবে।

সেনাপতি সা'দ (রাঃ) অপলক চেয়ে আছেন আপাদমস্তক বর্ম পরিহিত এ বীর মুজাহিদের ঝলসানো তরবারীর দিকে। আক্রমণের ভঙ্গিতে একবার বলছেন, এতো আবু মিহ্জান। কিন্তু পরক্ষণেই বলছেন, না। আবু মিহ্জান আসবে কি করে, তাকে তো আমি খিমার ভেতর বন্দি করে রেখে এসেছি। আচ্ছা যে কেউই হোক না কেন, ওকে আজ পরস্কৃত করতেই হবে আমাকে। সেনাপতি সা'দ অধীর অপেক্ষায়। কবে সন্ধ্যা হবে, কবে যুদ্ধ শেষ হবে। আর কবেই বা তিনি এই বীর মুজাহিদকে ডেকে আনবেন নিজের কাছে। কিন্তু আবু মিহ্জান তাঁকে সে সুযোগ দিলেন না। যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্রই তিনি সকলের অগোচরে দ্রুত চলে আসলেন সেই খিমায় আর নিজ হাতেই পরে নিলেন অপরাধের জিঞ্জির।

সা'দ (রাঃ)ও ফিরে এসেছেন। আপন তাঁবুয় বিশ্রাম নিচ্ছেন তিনি। যুদ্ধ শেষে লোকটির সাক্ষাত না পেয়ে মনে মনে ভাবছেন, এখন কাউকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, কে ছিল সেই বাহাদুর মুজাহিদ। সা'দ (রাঃ)-এর এ খেয়ালে আঘাত হেনে প্রবেশ করলেন হযরত যাবরা (রাঃ)। এসেই তিনি ঘটনাটি উল্লেখ করতঃ ক্ষমা চাইলেন তার অজ্ঞাতে আবু মিহ্জানকে মুক্ত করে দেয়ার অপরাধে। সেনাপতি তখন নিজের আবেগকে আর সামলিয়ে রাখতে পারলেন না। বলে উঠলেন ঃ আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি মুসলমানদের উপর নিজেকে এমন করে কোরবান করার জন্যে ব্যাকুল, তাকে আমি আর কয়েদখানায় আটকে রাখতে পারি না। আবু মিহ্জানকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। আবু মিহ্জান একথা জানতে পেরে বলে উঠলেন ঃ তাহলে আল্লাহর কছম করে বলছি, আমিও আর কোনদিন মদ স্পর্শ করব না।

ইসলামের ইতিহাসে প্রদীপ্ত সূর্য
মহান সেনানায়ক আল্‌প আরসালান

যে কয়েকজন সেনানায়ক তাদের রণকুশলতা ও দক্ষতায় ইসলামের ইতিহাসে রেখে গেছেন অক্ষয় অম্লান উজ্জ্বল স্বাক্ষর আল্‌প আরসালান তাঁদেরই একজন। তাঁর কীর্তি আমাদের করে গৌরবান্বিত আবার তাঁর করুণ মৃত্যু আমাদের করে বেদনাহত।

ইসলামের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয় ঘটনা হচ্ছে, একদা যারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, মুসলিম জাহানে চালিয়েছে নির্বিচারে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলা কালের গতিপথে তারাই ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের ছায়াতলে এসে ইসলামের নিশান বরদাররূপে খ্যাতি অর্জন করেছে। চেঙ্গিস খান এবং হালাকু খানের অসভ্য নৃশংস তাতার বাহিনী ঝড়ের বেগে আপতিত হয়েছিল মুসলিম জাহানের উপর। তাদের নৃশংস ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ডের ফলে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল মুসলিম জাহানের অভিশাপরূপে। সেলজুকগণও ছিল বিধর্মী। পরবর্তীকালে তারা ইসলাম গ্রহণ করে খ্যাতি অর্জন করেছিল ইসলামের শক্তিস্তম্ভ এবং বন্ধুরূপে।

সেলজুকগণ গর্ব করতে পারে তাদের দু'জন মহান সুলতানের জন্য, যাঁরা পারস্যের সিংহাসনকে মহিমান্বিত করেছিলেন, যাঁদের কীর্তি এবং খ্যাতি ইসলামের ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে আছে প্রদীপ্ত সূর্যের মত। তাঁদের একজন আল্‌প আরসালান আর ইতিহাসিকরা যাঁকে উল্লেখ করেছেন আরসিলার্ম বলে (১০২৯ অথবা ১০৩৩ খৃষ্টাব্দে)। আর অন্যজন হচ্ছেন মালিক শাহ।

এক সামরিক গোত্র থেকে এসেছিলেন আলপ আর সালান। তিনি ছিলেন মহান সুলতান, ইসলামের পতাকাবাহী তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ রণকুশলী সেনানায়ক।

পারস্যের সেলজুক সুলতান তুঘরল বেগের ভ্রাতুষ্পুত্র হিসেবে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু অচিরেই ঘনিয়ে আসে অশান্তির কাল মেঘ। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহ দেখা দেয় রাজ্যের প্রায় সর্বত্র।

প্রথমে তাঁর ভাই সুলাইমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তারপর বিদ্রোহ করে তাঁর বেগরা। এই গুরুতর বিপদ তিনি কাটিয়ে ওঠেন তাঁর শাসন ও সামরিক

দক্ষতায়। দ্রুত এবং কঠোর হস্তে দমন করে সিংহাসনে তাঁর অবস্থান করেন নিরাপদ। বাগদাদে আব্বাসীয় খলিফা তাঁকে দেন স্বীকৃতি। বিশেষ দূত মারফত প্রেরণ করেন সম্মানী পোশাক এবং পতাকা। পারস্য ভাষায় অমরগ্রন্থ 'সিয়াসত নামার' রচয়িতা মহান নিজামুল মুল্‌ককে তিনি নিযুক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী রূপে। দুর্ভাগ্য নিজামুল মুল্‌কের। বৃদ্ধ বয়সে নিহত হন গুপ্ত ঘাতকের হাতে। ১০৬৭ খৃস্টাব্দে তাঁর ভাই কারা আরসালান আবার বিদ্রোহ করে বসেন। কিন্তু আল্‌প আরসালান তাঁকে ক্ষমা করেন এবং কিরমানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

এরপর আনাতোলিয়া আক্রমণ করেন তিনি। বর্তমান তুরস্কের এশীয় অঞ্চলকে আনাতোলিয়া বলা হয়। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল পূর্বদিক থেকে আগত তুর্কী মুসলিমদের সেখানে বসতি স্থাপন করা। গুরুত্বপূর্ণ কোসরা শহর দখল করেন ১০৬৭ সালে।

দীর্ঘকাল যাবত মিসরের ফাতেমীয় সুলতান বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফাদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে আসছিলেন। এমনকি আরসালান বাসাসিরী নামে একজন তুর্কী আমীরের সাহায্যে ফাতেমীগণ বাগদাদও দখল করে নিয়েছিলেন।

মিসরের শিয়া খলিফারা বাগদাদের সুন্নী আব্বাসীয় খেলাফতের বিরোধী ছিলেন। এদিকে পূর্ব রোমক সাম্রাজ্য যাকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বলা হয় তার খৃস্টানরা ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিল। আব্বাসীয় খেলাফতের বিরুদ্ধে ফাতেমীগণ এবং বাইজান্টাইন খৃস্টানরা মিলিত হতে পারে এমন আশংকাও ছিল। কাজেই বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগে মিসরের ফাতেমীয় ক্ষমতা ধ্বংস করার প্রয়োজন হয়েছিল। তাছাড়াও আব্বাসীয় খেলাফতের পতাকাতলে মুসলিম অঞ্চলগুলোকে একত্র করার মহৎ আকাংক্ষা ছিল আল্‌প আরসালানের।

১০৭০ খৃস্টাব্দে তিনি উত্তর তুরস্কের উরফা দখল করেন এবং আলেপ্পোতে প্রবেশ করেন ১০৭১ সালে। শহরের শাসনকর্তা শহরের দ্বার খুলে দেন এবং স্বীকার করেন আল্‌প আরসালানের কর্তৃত্ব। সিরিয়াতে সাফল্যের পর আরসালান মিসর আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল চিরকালের জন্য সেখানে ফাতেমীয় শাসনের অবসান ঘটানো। এজন্য যখন সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন এ সময়ে হাজির হলো ইস্তাম্বুল হতে এক দূত চিঠি নিয়ে। এ চিঠি লিখেছেন বাইজান্টাইন সম্রাট রোমানস ডাইজিওস। তিনি দাবী করেছেন আরসালানের দখলকৃত আনাতোলিয়ার সকল অঞ্চল তাঁর নিকট সমর্পণ করতে হবে। সুলতান যদি এ দাবী মেনে না নেন তবে সম্রাট এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁর

বিরুদ্ধে অগ্রসর হবেন। এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে আরসালান অত্যন্ত বিব্রত হলেন। কারণ এ সময়ে তাঁর হাতে ছিল মাত্র একটি ক্ষুদ্র সেনাদল। তাঁর এই ক্ষুদ্র বাহিনীকে বাইজান্টাইন সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রেরণ করতে হলে তাঁকে সিরিয়া ছেড়ে যেতে হবে। পরিত্যাগ করতে হবে কায়রো আক্রমণের পরিকল্পনা।

এই গুরুতর সংকট সময়ে এর বাসঘাম নামে একজন সেলজুক আমীর আরসালানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসল এবং আনাতোলিয়ায় পৌঁছে মিলিত হতে চেষ্টা করল বাইজান্টাইনদের সঙ্গে। পূর্ব তুরস্কের একজন অনুগত সেলজুক বেগ আফশিন সুলতানকে জানালেন খৃস্টানরা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠবে না। আফশিন এর বাসঘামের অনুসরণ করে তাঁকে পরাজিত করলেন। পরাজিত আমীর খৃস্টানদের সঙ্গে যোগ দিল এবং দেখা করল তাদের সম্রাটের সঙ্গে। সুলতান যখন সিরিয়াতে ছিলেন আফশিন বিদ্রোহী বেগের পশ্চাদানুসরণ করলেন এবং বাইজান্টাইন সম্রাটের নিকট দাবী করলেন বিদ্রোহী বেগকে সমর্পণ করতে। কিন্তু সম্রাট রাজী হলেন না।

সম্রাট রোমানোস বলকান জাতিগুলোর মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর সৈন্যদল ছিল স্লাভ, হগ্রীক, আরমেনিয়াম এবং জর্জিয়ান জাতির লোক। বহু সহস্র অমুসলিম তুর্কী সম্রাটের সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল। বাইজান্টাইন সম্রাটের সৈন্য সংখ্যা ছিল দু' লক্ষ। এই বিশাল বাহিনীর রসদ এবং সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করার জন্য সংগ্রহ করেছিলেন চার হাজার যান। তাছাড়াও ছিল বহুসংখ্যক নিক্ষেপণ যন্ত্র। খৃস্টান সম্রাট ঘোষণা করলেন তিনি তুর্কীদের নিকট থেকে শুধু আলাতোলিয়া কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হবেন না মধ্যএশিয়ার তুর্কীদের স্থান পর্যন্ত সমস্ত মুসলিম এলাকা জয় করে চিরকালের জন্য সেলজুকদের ক্ষমতা ধ্বংস করবেন। তিনি আরও ঘোষণা করলেন তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে বন্টন করে দেবেন ইরাক, সিরিয়া, খোরাসান ও মার্ভ-এর মসজিদগুলোকে পরিণত করবেন গীর্জায়।

তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য ইস্তাম্বুলে সেন্টসোফিয়া গির্জায় প্রার্থনা করলেন। ১০৭১ সালের ১৩ই মার্চ ইস্তাম্বুল থেকে যাত্রা করেন। হাতে নিলেন ক্রুশ এবং এক বিরাট অনুষ্ঠান করে ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যবর্তী বয়ফরাস প্রণালী অতিক্রম করেন এবং তার সাম্রাজ্যের এশীয় অংশে পূর্ব তুরস্কের সিভাসে পৌঁছে বহু আর্মেনিয়ানকে হত্যা করেন আর অনুসরণ করেন পোড়ামাটি নীতি– যাতে মুসলমানরা জয়লাভ করলেও কোন কিছু না পায়।

বাইজান্টাইন সম্রাটের অভিযানের সংবাদ পেয়ে সম্ভাব্য সকল প্রস্তুতি নিলেন আরসালান এবং খৃস্টানদের মোকাবেলা করার জন্য সৈন্য বিন্যাস শুরু করেন।

জর্জিয়ার দিকে ২০,০০০ এবং ৩০,০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন মালাজাগার্টের দিকে। খৃস্টানদের বামবাহুর অধিনায়কত্ব করছিলেন আলিয়েত ব্রাইয়েনিস এবং মধ্যভাগের অধিনায়কত্বে ছিলেন সম্রাট নিজে। আল্‌প আরসালানকে সাহায্য করছিলেন তাঁর সেনাপতি সাভটেকিন, আভটেকিন আফশিন এবং সান্দুক বেগ।

খৃস্টানদের শক্তির পরিমাপ করার জন্য আরসালান শান্তির প্রস্তাব দিয়ে দূত প্রেরণ করেন। সম্রাট তা প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তিনি তার বিশাল বাহিনী এবং বিপুল সম্পদে নিজেকে বলীয়ান মনে করেছিলেন। কাজেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় সম্বন্ধে তিনি ছিলেন নিশ্চিত।

সুলতানের ইমাম সুলতানকে পরামর্শ দিয়েছিলেন শুক্রবারে নামাযের পরে যুদ্ধ শুরু করতে। সেই পরামর্শ অনুযায়ী আল্‌প আরসালান যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার পূর্বে নতশিরে প্রার্থনা জানালেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার নিকট বিধর্মীদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের জন্য। তাঁর সৈন্যদের একটি অংশকে খৃস্টান বাহিনীর সম্মুখীন রেখে বাকী অংশকে লুকিয়ে রাখলেন যাতে শত্রুরা মনে করেন মুসলামনরা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প এবং দুর্বল। যুদ্ধ শুরু হলে মুসলিম সৈন্যরা এমনভাবে যুদ্ধ করছিল যেন তারা পরাজিত হয়ে পিছু হটে যাচ্ছে। খৃস্টান সম্রাট ভাবলেন মুসলমানরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করছে। তিনি তখন তাঁর সকল সৈন্য নিয়ে মুসলিম সেনাদের পিছনে ধাওয়া করলেন। কিন্তু পরে অবাক হয়ে দেখলেন লুকিয়ে থাকা মুসলিম সৈন্যরা তাঁর বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। খৃস্টানদের দক্ষিণ বাহু সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হলো। মূল বাহিনীকে ধ্বংস হতে দেখে সম্রাটের অমুসলিম তুর্কী সৈন্যরা দক্ষিণ বাহু থেকে পালিয়ে তাদের সেনাপতি তাসিমের নেতৃত্বে সেলজুকদের সঙ্গে যোগ দিল। এদের সঙ্গে ছিল একই রক্ত, সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত ঐক্য। কাজেই তারা সহজেই মিশে গেল।

অবশ্য ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিকগণ বলে থাকেন, অমুসলমান তুর্কীদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মুলমানরা বিজয়ী হয়েছিল। কিন্তু এ বক্তব্য ভুল। সত্য ঘটনা হলো খৃস্টান সৈন্যদের পরাজিত ও বিধ্বস্ত হতে দেখে এই অমুসলিম তুর্কীরা বিজয়ীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। অমুসলিম তুর্কীরা ছিল সামানিস্ট ও খৃস্টান। আরমেনিয়ারাও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ণ করল। বাইজান্টাইন বাহিনীতে তখন দেখা দিল চরম বিশৃংখলা। তাদের সম্রাট রোমানোস তখন তাঁর ধনরত্ন রক্ষার জন্য তার শিবিরের দিকে দৌড়ালেন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলল। ফল হলো এই যে, বাইজান্টাইন বাহিনী সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেল। পলায়নের পূর্বেই সম্রাট শাদি নাম এক সৈন্যের হাতে ধরা পড়ে

গেলেন। যখন সম্রাটকে আল্প আরসালানের সম্মুখে আনা হলো তখন আরসালান হাত দিয়ে তাকে তিনবার আঘাত করে বললেন, "আমি কি আপনাকে শান্তির প্রস্তাব দেইনি? আপনি কি তা প্রত্যাখ্যান করেননি?"

হতভাগ্য সম্রাট বললেন, "আপনার তিরস্কার থেকে আমাকে রেহাই দিন। এখন আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।"

আরসালান– "আপনি যদি আমাকে বন্দী করতে পারতেন তবে আপনি কি করতেন?"

সম্রাট– "আমি আপনার সঙ্গে কর্কশ ব্যবহার করতাম।"

আরসালান– "এখন আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করব বলে আপনি মনে করেন?"

সম্রাট– "হয়ত আমাকে হত্যা করবেন অথবা মুসলিম এলাকাগুলোতে আমাকে দর্শনীয় বস্তু হিসেবে প্রদর্শন করবেন। অথবা তৃতীয় আর একটি কাজ করতে পারেন। ক্ষতিপূরণ নিতে পারেন এবং আমাকে আপনার অধীনস্ত রাজা হিসেবে নিয়োগ করতে পারেন। কিন্তু এ প্রস্তাব গ্রহণ করবেন বলে আমি সামান্যই আশা করতে পারি।"

বিজয়ী সুলতান বললেন, "এই তৃতীয় প্রস্তাবটাই আমি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম।" ফলে খৃষ্টান সম্রাটের পক্ষে অবমানকর এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। চুক্তির শর্তগুলো ছিলো নিম্নরূপ ঃ

(১) ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ১৫ লাখ দিনার।

(২) বার্ষিক কর হিসেবে দিতে হবে ৩,৬০,০০০ দিনার।

(৩) কতকগুলো বড় বড় শহর যেমন এন্তাকিয়া, উরফা, মালাগার্ট ইত্যাদি সর্ম্পূণ করতে হবে।

(৪) সকল মুসলিম বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।

(৫) প্রয়োজনের সময় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্য সুলতানের অধীনে ন্যস্ত করতে হবে।

(৬) সুলতানের পুত্রের নিকট সম্রাটের কন্যাকে বিয়ে দিতে হবে।

(৭) পঞ্চাশ বছর যাবত শান্তি রক্ষা করতে হবে।

সম্রাট রোমানোস চুক্তির শর্তাবলী গ্রহণ করলেন। তাঁকে দেয়া হলো একটি সম্মানী পোশাক, তাঁর ব্যবহারের জন্য একটি তাঁবু এবং খরচের জন্য ১৫,০০০ দিনার। তাঁর কিছু সংখ্যক কর্মচারী এসং সম্ভ্রান্ত লোককে মুক্তি দেয়া হলো। সুলতান তাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেয়ার জন্য পাহারাদার সঙ্গে দিলেন।

সম্রাট রোমানোসের এই শোচনীয় পরাজয় তাঁর কর্তৃত্বের জন্য মারাত্মক হয়ে দাঁড়াল। ঐতিহাসিক আলাবান্দারী বলেন, তাঁর প্রজারা তার নাম নিতে চাইল না এবং রাজ্য থেকে তার কীর্তিসমূহ মুছে ফেললো। তারা মনে করল, যীশু খ্রীষ্ট তাঁর প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন এবং রাজাদের তালিকা থেকে তিনি বাদ পড়েছেন। ইস্তাম্বুলে জনসাধারণ বিদ্রোহ করে বসল। মাইকেল ডুকাস নামে এক ব্যক্তি নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। এই নতুন সম্রাট পরাজিত সম্রাটকে অন্ধ করে ফেললেন।

এই দুঃখজনক ঘোষণা শুনে আল্প আরসালান ঘোষণা করলেন, রোমানদের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল তার অবসান ঘটেছে। এখন তুর্কীদের আনাতোলিয়া দখল করে নিতে এবং তা মুসলিম দেশে পরিণত করতে তার কোন বাধা নেই। এই জয় সমগ্র আনাতেলিয়া জয় করার দ্বার খুলে দিল। সুতরাং আলাতোনিয়ার তুর্কীদের ইতিহাসে আল্প আরসালানকেই গণ্য করা হলো তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারূপে।

দু'বছর পরের কথা। আল্প আরসালান তাঁর সাম্রাজ্যের এক প্রান্তে বিদ্রোহী তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। দু'লক্ষ্য সৈন্য নিয়ে অক্সাস নদীর তীরে পৌঁছলেন। সৈন্যদের নিয়ে পার হতে তিন সপ্তাহেরও বেশী সময় লেগেছিল। সেখানে যখন অবস্থান করছিলেন তখন তাঁর সম্মুখে এক বন্দীকে আনা হলো। তার নাম ইউসুফ নারজোমী (অথবা জামী অথবা খাওয়ারজমী) সে ছিল এক দুর্গের অধিনায়ক। দূর্গটি আরসালানের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, বন্দী প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছিল। এতে আরসালান বিরক্ত হয়ে আদেশ করলেন বন্দীকে তার সিংহাসনের কাছে নিয়ে আসতে এবং হাত পা বেঁধে মাটিতে ফেলে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে মাটিতে ফেলে রাখতে যাতে ঐভাবে তার মৃত্যু ঘটে।

এই দণ্ডের কথা শুনে বন্দী জঘন্যতম ভাষায় সুলতানকে গালি দিল। চীৎকার করে বললো– "আমার মত একজন লোক কি এভাবেই মৃত্যুবরণ করবে?"

সুলতান রাগে অধীর হয়ে বন্দীকে যারা পাহারা দিচ্ছিল তাদের সরিয়ে দিলেন। ধনুক তুলে নিয়ে বন্দীকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লেন। দক্ষ তীরন্দাজ বলে সুলতানের খ্যাতি ছিল। কিন্তু এবার ব্যর্থ হলেন। তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। এদিকে প্রহরীদের সরিয়ে দেয়া হয়েছিল বলে বন্দী ছিল মুক্ত। সে তার লুক্কায়িত ছোরা বের করে সুলতানের তলপেটে বসিয়ে দিল। সেখানে উপস্থিত দু'হাজার লোকের চোখের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে গেল। কেউ বাধা দিতে পারল না। গওহর আইন নামে এক ব্যক্তি ছুটে এলেন সুলতানের সাহায্যে। আক্রমণকারীর আঘাতে তিনিও আহত

হলেন শরীরের কয়েক জায়গায়। অবশেষে একজন আক্রমণকারীর মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে তাকে হত্যা করে।

এই মরণাঘাত পাওয়ার পর একদিন কি দু'দিন বেঁচেছিলেন আল্প আরসালান। এই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর প্রধানমন্ত্রী নিজামুল মুল্ককে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন তাঁর অন্তিম নির্দেশ। তিনি আরোহণ করেছিলেন গৌরবের উচ্চশিখরে। কিন্তু মৃত্যুবরণ করেন অত্যন্ত করুণভাবে। আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে ইহলোক ত্যাগ করেন তিনি। অত্যন্ত অনুতপ্ত হৃদয়ে তিনি বলেছিলেন, "আমি আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা না করে কোন দেশ জয় কিংবা শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হইনি। কিন্তু গতকাল যখন এক পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়েছিলাম আর নীচে আমার বিশাল সৈন্য বাহিনীর পদভারে মাটি কাঁপছিল আমি তখন নিজকে বলছিলাম আমি পৃথিবীর রাজা। কেউ আমাকে পরাজিত করতে পারবে না। তার ফলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালা আমার গর্ব চূর্ণ করে দিলেন তাঁর সবচেয়ে দুর্বল প্রাণীদের একজন দিয়ে। আমি তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমার এই অহংকারের জন্য অনুতপ্ত হচ্ছি।

মার্ভ শহরে তাঁকে কবর দেয়া হয়। তার সমাধিগাত্রে উৎকীর্ণ করার জন্য এক কবি লিখেছেন বিখ্যাত পরিচয় লিপি ঃ

একদা দেখেছ তুমি উঠেছিল আকাশে
গর্বোন্নত শির আল্প আরসালান
মার্ভে এসে দেখ তুমি আজ
দীনহীন হয়ে কেমনে সে শির ধুলিতে শয়ান।

আল্প আরসালান ছিলেন দীর্ঘদেহী মানুষ। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, শক্তিশালী এবং উদার। অত্যাচারীকে শাস্তি দিতেন, গরীবদের দান করতেন। বিশেষ করে রজমান মাসে প্রচুর অর্থদান করতেন। তাঁর বিশাল রাজ্য বিস্তৃত ছিল ট্রান্স অক্সিয়ানার দূরতম অঞ্চল থেকে সিরিয়ার দূরতম অঞ্চল পর্যন্ত। তাঁর এই বিশাল রাজ্যের বহু দরিদ্র লোক তাঁর নিকট থেকে ভাতা পেত।

যদিও তাঁর শাসনকাল ছিল স্বল্পস্থায়ী তবু তা ছিল তাঁর গৌরবময় কীর্তিতে ভরপুর। আল্প আরসালান ছিলেন ইতিহাসের অনুরক্ত ও বোদ্ধা পাঠক। যখন তাঁকে ইতিহাস পড়ে শুনানো হত তখন তিনি আনন্দ আর আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন অতীতের রাজা বাদশাহদের কাহিনী। আর বুঝতে চেষ্টা করতেন তাঁদের চরিত্র, প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং শাসন পদ্ধতি।

আব্বাসীয় খেলাফতের প্রতি তিনি ছিলেন অনুগত। মিসরের ফাতেমীয় সুলতানদের আরবে এবং সিরিয়ায় ক্ষমতা ধ্বংস করে আব্বাসীয় খেলাফতের বিরাট সেবা করেছিলেন।

তাঁর ন্যায়পরায়ণতার জন্য লোকে তাঁকে ডাকত আদিল সুলতান বলে। তিনি আলেমদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন কঠোরভাবে। জ্ঞান সাধনার প্রতি তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। বাগদাদে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বিখ্যাত নিজামিয়া মাদ্রাসা আর তার উদ্বোধন করেন তারই সুযোগ্য পুত্র মালিক শাহ। তিনি আরও অনেক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ সকল বিদ্যাপীঠে শিক্ষাদান করতেন প্রখ্যাত আলেম আবু ইসহাক সিরাজী এবং আবু বকর শশীর মত জ্ঞানী লোক।

ইসলামি দুনিয়ার ইতিহাসে আল্‌প আরসালান নিঃসন্দেহে ছিলেন শ্রেষ্ঠ সেনানায়কদের অন্যতম। তাঁর ছিল লৌহ-কঠিন ইচ্ছাশক্তি ও উজ্জ্বল চরিত্র। তিনি জোড় দিতেন শৃঙ্খলা ও রণ কৌশলের উপর। তাঁর সেনাপতিত্বের এই গুণের জন্যই অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে মোকাবেলা করতে পেরেছেন তার চেয়ে অনেক বড় বড় শক্তিশালী শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে এবং তাদের পরাজিত করেছেন শোচনীয়ভাবে। তিনি সেই অল্প সংখ্যক বিখ্যাত সেনানায়কদের একজন যারা কখনও কোন যুদ্ধে পরাজিত হননি। তিনিই একমাত্র মুসলিম সেনাপতি যিনি অর্জন করেছেন বাইজেনটাইন খ্রীস্টান সম্রাটকে বন্দী করার দুর্লভ সম্মান।

বসনিয়ায় মুজাহিদদের পদার্পণ ঃ মুসলমানদের মনে আশার আলো

পূব-ইউরোপে অবস্থিত একমাত্র স্বাধীন মুসলিম বসনিয়া। যুগোশ্লাভিয়া কম্যুনিস্ট শাসনের পতনের পর পরই সেখানকার যেসব প্রজাতন্ত্র স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল, বসনিয়া-হার্জেগোভিনাও তার একটি। স্বাধীনতা ঘোষণার পর জাতিসংঘসহ বেশ কতিপয় বৃহৎ রাষ্ট্রও একে স্বীকৃতি দান করে। কিন্তু এই স্বীকৃতি সেখানকার মুসলমানদের জন্য 'বরে শাপ' হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পার্শ্ববর্তী সার্বীয় খৃস্টানরা ক্রমাগত বসনীয় মুসলমান নারী-পুরুষ ও শিশুদেরকে নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে। সেখানকার বন্দি-শিবিরগুলোতে চলছে হিটলারের আত্মাকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়ার মত নৃংশস উৎপীড়ন। এ পর্যন্ত এক লাখেরও বেশী বসনীয় মুসলমানকে সার্বীয় হায়েনারা হত্যা করেছে, প্রায় ৪ লাখকে করেছে পঙ্গু এবং অসংখ্য নারীর সতীত্ব হয়েছে লুণ্ঠিত। কারণ, এরা মুসলমান।

প্রতিদিন সারা দুনিয়ার সংবাদপত্র ও টিভির মাধ্যমে সার্বীয় হায়েনাদের বর্বরতার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে কিন্তু মানবতার ঠিকাদার পাশ্চাত্য জগতের মনে কোনরকম ভাবান্তরের লক্ষণ দেখা যাওয়া তো দূরের কথা, সমগ্র খৃস্ট জগতের পক্ষ থেকে বরং একে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পবিত্র ক্রুসেড যুদ্ধ হিসেবে ঘোষণা করতেও লজ্জাবোধ হয়নি এতটুকু। জাতিসংঘের ছত্রছায়ায় বসনিয়ার মুসলমানদের জন্য সাহায্য পাঠানোর অন্তরালে চলছে হীন চক্রান্ত। ইউরোপ, আমেরিকা, ফ্রান্স তথা গোটা খৃস্টজগত কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জনের মাধ্যমে বসনীয় মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের নামে যে নাটক অভিনয় করে যাচ্ছে, তার পেছন থেকে ইতোমধ্যেই বেরিয়ে এসেছে জিঘাংসাপূর্ণ এক বীভৎস ক্রুসেডীয় দৈত্যের চেহারা।

বসনিয়ার প্রেসিডেন্ট আলীজাহ ইজ্জত বেগোভিচ সম্প্রতি বিশ্ব দরবারে সেখানকার মুসলমানদেরকে সার্বীয় হায়েনাদের পৈশাচিকতা থেকে রক্ষা করার আকুল আবেদন নিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত কারো কাছ থেকেই কোন সক্রিয় সাড়া পাচ্ছেন না তিনি। এমনকি কোন একটি মুসলিম দেশ পর্যন্ত নিজেদের বসনীয় মুসলিম ভাই-বোনদের রক্ষা করার জন্য সরাসরি এগিয়ে আসছে না। সত্যি এটা বিস্ময়কর। কিন্তু আল্লাহর এমন কিছু

ফৌজ রয়েছে, যারা অসহায় মুসলমানদের যে কোন বিপদে তাদের পাশে দাঁড়াতে কখনো দ্বিধা করে না। যেমনটা দেখা গেছে আফগানিস্তান, কাশ্মীর কিংবা ফিলিপাইনে।

ইউরোপীয় ঐক্যজোট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ সমগ্র আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো যখন বসনিয়া-হার্জেগোভিনার নিরস্ত্র অসহায় মুসলমানদের সুণিপুন আঁতাতের আওতায় নিজেদেরই দেশের সার্বীয় খৃস্টান হায়েনাদের হাতে অপঘাতে মৃত্যুবরণ করতে দেখেও না দেখার ভান করছে এবং বলতে গেলে গোটা পশ্চিমা জগতই যখন সংগোপনে ও ইশারা-ইঙ্গিতে হিংস্র সার্বীয় হায়েনাদের প্রতিই সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে মজলুম বসনীয় মুসলমানদের পাশে একান্ত আল্লাহর মদদ আকারে দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কয়েকশ' দুর্ধর্ষ মুজাহেদীনের উপস্থিতি সেখানকার গোটা প্রেক্ষাপটটিকেই যেন পাল্টে দিয়েছে? এরা কারা? কোত্থেকে এরা এসেছে? এসব প্রশ্ন যেমন সার্বীয় হায়েনাদেরকে হতচকিত করে দিয়েছে, তেমনি এতে করে আগ্রাসনবাদী পাশ্চাত্যের সমগ্র খৃস্ট জগতেও দুশ্চিন্তার কাল ছায়া নেমে এসেছে বলে মনে হয়।

এ পর্যন্ত বসনীয় মুসলিম ভাইবোনদের পাশে সমবেত মুজাহেদীনের সংখ্যা যদিও শ' পাঁচেকের বেশি নয় তা হলেও অসহায়, নৈরাশ্য জর্জরিত মরণানুখ বসনীয় মুসলমানদের জন্য এই মুজাহিদরা আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়। বসনিয়ার কেন্দ্রীয় শহর তারাওয়াঙ্কে এসব নবাগত মুজাহিদগণ নিজেদের প্রদান কার্যালয় স্থাপন করেছেন। তাতে করে এখানে নতুন করে জীবনের স্পন্দন পরিলক্ষিত হচ্ছে। পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতেও ক্রমান্বয়ে নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তার্ব নামক শত্রু কবলিত একটি জনপদ থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে আসা আলমা হালীফ মুজহিদদের সম্পর্কে সানন্দ ও প্রত্যয়দীপ্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলল, "এরা খুবই ভাল লোক। এমন সময় এরা আমাদের সাহায্য করতে এসেছে, যখন অন্যান্য সবাই আমাদেরকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়। সত্যি আল্লাহ বড়ই মেহেরবান।" এই মুজাহিদদের সম্পর্কে এ আবেগময় অনুভূতি শুধু আলমারই নয়, বরং প্রতিটি বসনীয় মুসলমান তাদের জন্য নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত বলে মনে হয়।

জীবন-মরণের সংঘাতে লিপ্ত বসনীয় মুসলমানদের বুকে স্পন্দন সৃষ্টিকারী এই মুজাহিদদের নেতার নাম আবু আবদুল আজীজ। তিনি এক অসাধারণ মুজাহিদ। তাঁর জীবনের বেশীরভাগ সময়ই কেটেছে আফ্রিকা, ফিলিপাইন, আফগানিস্তান ও

অন্যান্য স্থানে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তার ব্যক্তিত্বের কিছুটা অনুমান এভাবেও করা যায় যে, শুধু তাঁর উপস্থিতিই যে কোন মরণোন্মুখ জনগোষ্ঠীর মুখে চোখের পলকে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারে। বসনিয়ায়ও তাই হয়েছে। সার্বীয় হায়েনাদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত শিশু, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ সবাই আবদুল আজীজকে দেখামাত্র আনন্দধ্বনি করতে করতে বেরিয়ে আসে। আবদুল আজীজ এক আশ্চর্য লোক। যুদ্ধের ময়দানেও যদি নামাযের সময় হয়ে যায়, ঠিক তখনই আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে যেতে এতটুকু দ্বিধা করেন না তিনি।

তারাওয়াঙ্কের কারো কারো ধারণা তিনি সউদী আরবের লোক। সেখানেই নাকি তাঁর স্ত্রী ও ৯ সন্তান বসবাস করে, কিন্তু কদাচিতই তাঁকে সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। তবে তিনি প্রকৃতপক্ষে কোথাকার লোক, তা কেউই নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না। আর তাঁর নিজের কথা হল, "আমি মুসলমান এবং মুসলমানের জন্যই এসেছি।" তিনি বলেন, "জাতিসংঘ, আমেরিকা ও ইউরোপীয় জোট যখন বসনিয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এবং সার্বীয় হায়েনাদের হাতে মুসলমানরা ভেড়া-বকরীর মত জবাই হতে থাকে, তখন বাধ্য হয়ে আমাদেরকে এখানে আসতে হয়েছে। এখানে আমরা বসনিয়ার মুসলমানদের সাহায্য করছি।" বসনিয়ায় সার্বীয়দের বর্বর হত্যাযজ্ঞকে ক্রুসেডীয় নৃশংসতা আখ্যায়িত করে এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে গিয়ে আবদুল আজীজ বলেন, "আমরা এখানে খাদ্য কিংবা ওষুধপত্র নিয়ে আসিনি। এ সাহায্যের জন্য বহু সংগঠনই রয়েছে এবং সেগুলোকে তা করাও উচিত। আমরা মানুষ নিয়ে আসব, যারা ইসলামের দুশমনদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেবে। এখানে আমাদেরও ১৭ জন মুজাহিদ নিহত হয়েছেন ইতিমধ্যেই; এঁরা শহীদ হয়েছেন, আরও শহীদ হবেন হয়তো, কিন্তু আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পিছপা হব না, যতক্ষণ না বসনিয়ার মুসলিম ভাই-বোনেরা সম্পূর্ণরূপে খৃস্টান বর্বরদের আগ্রাসন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়।" একই সঙ্গে আবুদল আজীজ প্রতিদিন ৮ থেকে ১৩ জন শিশু-কিশোরকে একজন দোভাষীর সাহায্যে কোরআন কারীমও পাঠ দান করেন।

এ বিষয়টিকেই পাশ্চাত্য ও মার্কিনী প্রচার মাধ্যমগুলো ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। এতে করে ইসলামবিদ্বেষী শক্তি এক ঢিলে কয়েকটি শিকার করতে চাইছে। একদিকে ওরা নিজেদের সনাতনী ভঙ্গিতে বসনিয়ার মুজাহিদদের আগমনের বিষয়টি প্রচার করে এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে যে, মুসলমানরা ইউরোপসহ গোটা পাশ্চাত্য শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেছে। অবিলম্বে যদি সমগ্র ইসলামবিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়, তাহলে মুসলমানদের

ঐক্যবদ্ধ সাইমুন তাদেরকে খড়ের মতই উড়িয়ে নিয়ে যাবে। অপরদিকে এই সামান্য কয়েকশ' মুজাহিদদের আগমনকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করার অন্তরালে মুসলিম বিশ্বকে এ মর্মে আশ্বস্ত করাও উদ্দেশ্য যে, গোটা বিশ্বই যখন বসনিয়ার নির্যাতিত মুলমানদের থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে, ঠিক তেমনি মুহূর্তে আমেরিকার মিত্র সউদী আরব, ইরান ও টার্কিই সেখানে গোপনে মুজাহিদ পাঠিয়ে তাদের সাহায্য করছে। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, বসনিয়ায় মুসলিম মুজাহিদের আগমন সংক্রান্ত প্রচারণা এমন একসময় চালানো হচ্ছে, যখন বসনিয়ার প্রেসিডেন্ট আলীজাহ্ ইজ্জত বেগোভিচ মুসলিমবিশ্বে ঘুরে ঘুরে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু এটাও সত্য যে, বসনিয়ায় মুজাহিদদের আগমন এবং সাথে সাথে সার্বীয় হায়েনাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্য জগতের বুকে ইতিমধ্যেই কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই তারা মুজাহিদদের ব্যাপারে বসনিয়ার মুসলমানদেরকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলার উদ্দেশে অপপ্রচার চালাতে শুরু করেছে যে, মুজাহিদরা এখানে টিকে গেলে তারা এখানেও নির্ভেজাল ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম করে ছাড়বে এবং তাতে করে দীর্ঘকাল উন্নত জীবন যাপনের পর বসনীয়দের কঠিন ইসলামী জীবন যাপনে বাধ্য হতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এরা হয়তো একথা উপলব্ধি করতে পারছে না যে, ইসলাম অপেক্ষা উন্নত আর কোন জীবনব্যবস্থাই নেই। তদুপরি দীর্ঘকাল তথাকথিত পাশ্চাত্যধারার উন্নত জীবন যাপনের পরেও বর্তমানে তাদের সাথে যে আচরণ পাশ্চাত্যসেবীদের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে, তাতে বসনিয়ার মুসলমানরা পুরোপুরি সজাগ হয়ে গেছে। এসব অপপ্রচারে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা আদৌ সম্ভব নয়।

বসনিয়ায় জেহাদরত বিদেশী কমান্ডার শেখ আবু আব্দুল আজীজের সাক্ষাতকার

বসনিয়ার বহিরাগত মুসলিম মুজাহিদ কমান্ডার শেখ আবু আব্দুল আজীজ আফগানিস্তানের পেশোয়ার থেকে চারজন সাথীসহ যখন বসনিয়া পৌঁছেন, তখন সার্ববাহিনী বসনীয় মুসলমানদের উপর চালাচ্ছিল মানবেতিহাসের ভয়াবহতম নির্যাতন ও নিপীড়ন। শেখ আজীজ ও তাঁর সাথীদের আপ্রাণ চেষ্টা ও সৈন্য সংগ্রহের ফলে সার্ববাহিনীর আগ্রাসনে অনেক ভাটা পড়েছে। উল্লেখ্য, এদিকে সার্ব সরকার আবু আব্দুল আজীজের মাথার দাম ঘোষণা করেছে এক লাখ ডলার। বসনিয়ার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে শেখ আব্দুল আজিজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার এখানে পত্রস্থ করা হল।

প্রশ্ন ঃ পূর্ব ইউরোপ ও বসনিয়া-হার্জেগোভিনা কমিউনিস্ট শাসনাধীন থাকাকালীন ইসলামী তাহযীব-তমদ্দুন থেকে কতটুকু দূরে সরে গিয়েছিল এবং সার্বীয় আগ্রাসনের পর (বর্তমান জিহাদরত অবস্থায়) ইসলামী অনুভূতি কতটুকু জাগ্রত হয়েছে?

উত্তর ঃ আমরা এখানে পৌছে দেখেছি মসজিদগুলো জনশূন্য ছিল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন যুবক-কিশোরসহ অধিকাংশ মুসলমান মসজিদে আসছে। সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে পাশ্চাত্য জীবনধারাই বেশি ছিল, কিন্তু হালে এতেও পরিবর্তন হয়ে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে বোরকা এবং চাদরের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। মেয়েরা এখন আমাদের কাছে খাদ্য সাহায্য না চেয়ে পর্দা পালনে সাহায্য চায়।

প্রশ্ন ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে বসনীয় মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা কত ছিল?

উত্তর ঃ সম্মিলিত যুগোস্লাভিয়ার শাসন ক্ষমতা ছিল সার্বীয়দের হাতে, তাই প্রাথমিক পর্যায়ে বসনীয় মুসলমানদের কোন বাহিনী ছিল না। স্বাধীনতার কিছুদিন পরই যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার ফলে বসনীয়দের সামরিক প্রস্তুতির সুযোগ হয়নি। নিয়মিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য নেই বললেই চলে। বর্তমানে যারা যুদ্ধ করছে তাদের প্রায় সবাই স্বেচ্ছাসেবক। এদের সংখ্যা ৬০ হাজারের মত হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ অ-বসনীয় মুজাহিদদের সংখ্যা কত?

উত্তর ঃ এ মুহূর্তে আমাদের কাছে পাঁচ হাজার বসনীয় এবং পাঁচশ' অ-বসনীয় মুজাহিদ রয়েছেন। এর মধ্যে আরবী, পাকিস্তানী ও তুর্কীসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের মুজাহিদই অন্তর্ভুক্ত। কিছুদিন আগে দু'জন আফগান মুজাহিদ আমাদের সাথে জিহাদ করে শত্রুর হাতে শাহাদতবরণ করেছেন।

প্রশ্ন ঃ এ যুদ্ধের পরিণতিতে বসনিয়ার সাধারণ মুসলমানদের ক্ষতির পরিমাণ কত?

উত্তর ঃ সার্ববাহিনী দশ লাখের বেশি বসনীয় অধিবাসীকে নিজের বাড়িঘর ছেড়ে শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। অসংখ্য মানুষ হয়েছে আহত এবং লক্ষাধিক বরণ করেছে শাহাদত। ষাট হাজারেরও বেশি মহিলার সম্ভ্রমহানি করেছে। বার বছরের একটি মেয়েকে আমি দেখেছি। পর্যায়ক্রমে বিশ জন সার্বীয় সৈন্য ধর্ষণ করেছিল। সার্ববাহিনী আটককৃত বসনীয় মুসলমান ও খৃস্টান মহিলাদের পৃথক করে, তারপর মুসলমান মহিলাদের হয়ত গুলি চালিয়ে শহীদ করে, অন্যথায় চালায় নির্যাতন। সার্বীয় সেনাদের জুলুম অত্যাচার থেকে ১০ বছরের শিশু হতে ৭০ বছরের বৃদ্ধাও রেহাই পায়নি। শিশুদের হত্যা করে পিতা-মাতাকে এদের রক্তপানে বাধ্য করত। এই হল মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী পাশ্চাত্য সভ্যতা। মুসলমানদের দমন করার লক্ষ্যে সার্বরা হিংস্রতা ও বর্বরতার সকল সীমাই ছাড়িয়ে গেছে। এরা ইউরোপে মুসলমানদের স্বাধীন অস্তিত্ব মেনে নিবে না।

প্রশ্ন ঃ এই জুলুম-নির্যাতনের নরকরাজ্যে আপনারা কিভাবে বসনীয় মুসলমানদের সাহায্য করছেন?

উত্তর ঃ আফগানিস্তানের জিহাদ-এর পর আমরা পাঁচ জন বসনিয়ায় পৌছালে মানুষ আমাদের নিয়ে এই বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো যে, তোমরা মাত্র পাঁচজন জিহাদ করবে? এটা আফগানিস্তান নয়, সার্ববাহিনী গোটা ইউরোপে যাদেরকে তৃতীয় শক্তি হিসাবে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত করা হয়েছে। আমরা বলেছি, এসেছি জিহাদ করতে তাই আল্লাহর উপর ভরসা করে পাঁচজনেই জিহাদের প্রচেষ্টা শুরু করে দিলাম। আল্লাহর রহমতে আমাদের আহ্বানে মুসলিম জাহান এমনকি জাপানের মুসলমানগণও সাড়া দিয়েছেন।

ক্যাম্প খুলে বসনীয় সাধারণ মুসলমানদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছি, যারা অস্ত্র চালানো তো দূরের কথা কোনদিন চোখেই দেখেনি। ট্রেনিং ক্যাম্পে আমরা ১৫ দিনের মধ্যে ১২ প্রকার হাতিয়ার চালনা শেখানোসহ ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছি। মুজাহিদরা মাঠে নামার পর অবস্থা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

একদিন সারায়েভোর উপর সার্ববাহিনী তীব্র হামলা করলে মাত্র ৫৫ জন মুজাহিদ নিয়ে আমরা প্রতিহত করেছিলাম। খৃস্টান তাবেদার বিবিস এটাকে ৫ হাজার আরব মুজাহিদদের প্রতিরোধ বলে প্রচার করেছিল। সার্ব নিয়ন্ত্রিত রেডিওর খবর অনুযায়ী এ যুদ্ধে দু'শ সার্ব সৈন্য মৃত্যু এবং আমাদের মাত্র ৮ জন শহীদ হয়েছিল। শহীদদের মধ্যে বাহরাইনের গভর্নরের ভাতিজাও ছিলো- শাহাদতের পর তার পাসপোর্ট দেখে আমরা তা বুঝতে পেরেছি।

প্রশ্ন ঃ ইউরোপ-আমেরিকা তথা জাতিসংঘের শান্তি প্রস্তাবে বসনীয়দের চাহিদার প্রতিফলন হয়েছে কি?

উত্তর ঃ শান্তি প্রস্তাব বসনীয়দের স্বার্থের প্রতিকূলে বলে মুসলামনরা সেটি প্রত্যাখ্যান করে জিহাদ অব্যাহত রেখেছে। অতীতে বহু শান্তি প্রস্তাব করা হয়েছিল, ফলপ্রসূ হয়নি। এটা অতীতের মতই ব্যর্থ হবে।

প্রশ্ন ঃ বসনিয়ার প্রেসিডেন্ট আলীজাহ ইজ্জত বেগ পূর্বে শান্তি প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও এখন তা মেনে নিয়েছেন। তার কারণ কি?

উত্তর ঃ তাঁর উপর খুব বেশী চাপ ছিল। প্রচার করা হচ্ছিল, মুসলমানরা শান্তির (প্রস্তাবের) বিরোধী, জাতিসংঘের এ শান্তি প্রস্তাব ব্যর্থ করে দিতে চায়। এসব অভিযোগ থেকে বাঁচার জন্যই এ তিক্ত ঘোট গিলতে হয়েছে। এরপর আমার জানা মতে মুসলিম দেশসমূহ থেকেও এ প্রস্তাব মেনে নেয়ার জন্য তার উপর চাপ ছিল।

প্রশ্ন ঃ এ চাপ কি সউদী আরব ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ থেকেও ছিল?

উত্তর ঃ নির্দিষ্ট করে কোন দেশের নাম বলা সম্ভব নয়। তবে প্রেসিডেন্ট ইজ্জত বেগ কিছুদিন পূর্বে এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন– জিহাদ চালিয়ে যাওয়াই আমাদের জন্য একমাত্র সমাধান, কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ থেকেই এ শান্তি প্রস্তাব মেনে নেয়ার জন্য আমাকে বেশী চাপ দেয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ সার্বীয় পার্লামেন্ট এ শান্তি প্রস্তাব অস্বীকার করার কারণ কি?

উত্তর ঃ সার্বীয়রা আগে বসনিয়াকে দু'ভাগ করতে চাচ্ছিল। তারপর প্রেসিডেন্ট বেগ কয়েকটি নতুন শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন। যার মধ্যে রাজধানী সারায়েভোর নিয়ন্ত্রণ বসনীয়দের হাতে থাকা ছাড়াও ছিল আরো ক'টি শর্ত। এ জন্য সার্বীয়রা শান্তি প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করেছে।

প্রশ্ন ঃ বসনীয় মুসলমানদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?

উত্তর ঃ এরা ইজ্জতের জিন্দেগী ব্যতীত অন্য কিছু চায় না। প্রকৃতপক্ষে সার্বিয়া বসনিয়ার অধিকাংশ এলাকা নিয়ন্ত্রণ চরতে চায়, যাতে মুসলমানদেরকে

সংখ্যালঘুতে পনিণত করতে পারে– সার্ব নেতাদের তিনটি উদ্দেশ্য ঃ সারাবিশ্বে আর্থোডক্স খৃস্টানদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, অথচ অতীতে খৃস্টানদের মধ্যেই পরস্পর যুদ্ধ বেঁধে গিয়েছিল। যেমন, ক্রোশিয়ার ক্যাথলিক খৃস্টানেরা প্রথমে সার্বিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এদের পরস্পর বিরোধিতার ফলে সার্বিয়ার আর্থোডক্স খৃস্টান এবং ক্রোশিয়ার ক্যাথলিক খৃস্টান এবং ক্রোশিয়ার ক্যাথলিক খৃস্টানদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছিল। ইউরোপীয় সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব রক্ষার দরুন এদের যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অন্যথায় আর্থোডক্স খৃস্টানেরা নিজেদেরকে সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করত।

প্রশ্ন ঃ মুসলিম উম্মাহ বসনিয়ার জেহাদে কি দায়িত্ব পালন করেছে?

উত্তর ঃ মুসলিম বিশ্বের যেখানেই আমি গিয়েছি, প্রত্যেকেই নিজেদের সাধ্যানুযায়ী মজলুম বনসীয়দের জন্য সাহায্যের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, বসনিয়ার জিহাদ প্রচলিত কোন যুদ্ধ নয়। এ হলো ইসলাম ও কুফরের জিহাদ। বসনিয়া পূর্ব ইউরোপে ইসলামের দূর্গ। যদি এটা শেষ হয়ে যায়, তবে ইউরোপ থকে স্পেনের মত ইসলাম চিরতরে মিটে যাবে। সাবেক যুগোশ্লাভিয়া ইউপোপের বুকে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীদের মানবতাবোধ ও তাহজিব তমদ্দুনের প্রচুর খ্যাতি ছিল। কিন্তু আজ এদের দ্বারা মানবতা পদদলিত হচ্ছে। বিশ্ব ইতিহাসে এমন হিংস্রতা ও বর্বরতার কোন নজির নেই। তারপরও আল্লাহর রহমতে আমরা আফগানিস্তানের মত এখানেও বিজয়ী হব।

প্রশ্ন ঃ আফগানিস্তানের মুজাহিদ দলগুলো থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যায় কি?

উত্তর ঃ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে নেতাদের সাথে সাক্ষাত হয়েছে, কোন রাস্তা খুলে গেলে সাহায্য আসবে। তাঁরা সাহায্য দিতে খুবই আগ্রহী।

প্রশ্ন ঃ এ মুহূর্তে কিভাবে আপনারা অস্ত্র সংগ্রহ করছেন?

উত্তর ঃ শুরুতে আমাদের হাতে হাতিয়ার ছিল না। জিহাদ আরম্ভ হওয়ার পর বিভিন্ন মাধ্যমে অস্ত্র পেয়েছি। পরাজিত সার্ব সৈন্য এবং চোরাচালানীদের নিকট থেকেও অস্ত্র পেয়েছি। মোটকথা টাকা থাকলে অস্ত্র সংগ্রহ করা কোন কঠিন কাজ নয়।

প্রশ্ন ঃ জিহাদ চলাকালীন সময় পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র যেমন– আলবেনীয়া, রোমানীয়া ও হাঙ্গেরীর মুসলমানরা কি বসনিয়াকে সাহায্য করেছে?

উত্তর ঃ এসব রাষ্ট্রের মুসলমানগণ ৭০ বছরের কম্যুনিস্ট শাসনে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল। এখন সেখানেও স্বাধীনতার সুফল আসতে শুরু করেছে। তাই ক্রমান্বয়ে

সেখান থেকেও সাহায্য আসবে। তারপর এ ভূখণ্ডের মুসলমান নানা সমস্যায় জর্জরিত। যেমন, আলবেনীয়ার উপর আশপাশের খৃষ্টান রাষ্ট্রগুলোর শ্যেন দৃষ্টি। বিশেষ করে রোমানীয়া, মাকদোনীয়া, ইউনান ও অন্যান্য বলকানী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেও মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলোর অবস্থা আশংকাজনক। কাজেই পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য মুসলিম দেশগুলোর এখন থেকেই তৈরি হওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্ন ঃ অতীতের মত এ যুদ্ধ বিস্তৃত হয়ে বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। এমন সম্ভাবনা যথেষ্ট। এ অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ না করলে বসনিয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ হতে পারে। বিশ্বের খৃষ্টান ও মুসলমান সকলেরই দৃষ্টি এখন বসনিয়ার প্রতি। গভীরভাবে বিশ্ব আজ একে পর্যবেক্ষণ করছে।

প্রশ্ন ঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে পূর্ব ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্র পরিবর্তনের সম্ভানাও কি নেই?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। সম্ভাবনা রয়েছে। ফিলিস্তিনের যে অবস্থা হয়েছিল, বসনিয়ারও তেমনি অবস্থা হতে পারে। যেমন- প্রথমে ফিলিস্তিনকে ভাগ করা হয়েছিল, তারপর গোটা ফিলিস্তিনই ইসরাইল দখল করে চলেছে। বসনিয়াতেও এমন আশংকা রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ বসনীয় মুসলমানদের জন্য পাকিস্তানীদের ভূমিকা কি?

উত্তর ঃ পাকিস্তানী দাতা সংস্থা ও জনসাধারণের পক্ষ থেকে প্রচুর সাহায্য আসছে। সাধ্যানুযায়ী সবাই সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছে। অনুদানের পাশাপাশি তাদের দোয়াও আমাদের জন্য একটা বিরাট সম্বল।

প্রশ্ন ঃ বসনিয়া মুজাহিদদের জন্য কোন ধরনের হাতিয়ার বেশী দরকার?

উত্তর ঃ গোলা-বারুদের প্রয়োজনটাই আমাদের এখন সবচেয়ে বেশী। কেননা, হাতিয়ার আমাদের হাতে থাকলেও গোলা-বারুদের খুব অভাব। এছাড়া ট্যাংক ও বিমান বিধ্বংসী মিসাইলেরও দরকার।

প্রশ্ন ঃ জাতিসংঘের প্রেরিত শান্তি বাহিনীর কি ভূমিকা?

উত্তর ঃ শুধু অবজারভেশন বা পর্যবেক্ষণ। এছাড়া অন্যকিছু নয়। এরা শুধু যুদ্ধ দেখে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ শান্তি বাহিনীর মধ্যে মুসলমান সৈন্য কত জন?

উত্তর ঃ সঠিক মুসলমান সৈন্যসংখ্যা আমার জানা নেই। বিশ্বের সব দেশেরই সৈন্য আছে।

প্রশ্ন ঃ সাবেক যুগোশ্লাভিয়া ভেঙ্গে যাওয়ার পর ছয় বা সাতটি রাষ্ট্রের মধ্যে ক্রোশিয়া, সার্বিয়া ও বসনিয়ার অবস্থা তো দেখাই যাচ্ছে, তবে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর আচরণ ও গতিবিধি কি রকম?

উত্তর ঃ অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে মকদোনীয়া ও কসোভো বসনিয়া থেকে দূরে এবং এদের শক্তি কম। ক্রোশিয়ার অধীনে কিছু সৈন্য আছে মাত্র। সার্বিয়ার সৈন্য শক্তিই সবচেয়ে বেশি এবং যুগোশ্লাভিয়ার প্রাণকেন্দ্র বেলগ্রেডও সার্বিয়াদের অধীনে।

প্রশ্ন ঃ বসনিয়া কি তাদের সৈন্য যোগান অব্যাহত রাখতে পারবে? আর ব্যবস্থাপনাই বা কিভাবে সম্ভবপর হবে? কারণ বসনিয়ার হাতে কোন সমুদ্র বন্দর নেই।

উত্তর ঃ বসনিয়া তাদের সৈন্য যোগান অব্যাহত রাখতে সক্ষম। বন্দরের জন্য দশ-বারো কিলোমিটার সমুদ্র উপকূল আছে, যাতে সহজেই বন্দর প্রতিষ্ঠা করা যায়। তবে এটা ক্রোশিয়ার অধীনে। এছাড়া সমুদ্র বন্দর ছাড়া স্থলপথেও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনীতিকে মজবুত করা যায়। বিশ্বের বহু দেশ এমনকি ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্রের অধীনেও কোন সমুদ্র বন্দর নেই।

প্রশ্ন ঃ বসনিয়ায় শিল্পের অবস্থা কেমন?

উত্তর ঃ সাবেক যুগোশ্লাভিয়ায় বসনিয়া স্টীল ইন্ডাষ্ট্রীর জন্য বিখ্যাত ছিল। সারা দেশের স্টীল চাহিদা এখান থেকেই পুরণ হত। তবে যুদ্ধের পরিণতিতে সার্ববাহিনীর বোমা হামলায় অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে যায় এবং কিছু সার্ববাহিনীর নিয়ন্ত্রণেও রয়েছে। এগুলো কাজে লাগাতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মুজাহিদ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) জীবন ও কর্ম

রাসূল (সাঃ)-এর সকল সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তি রয়েছেন যার মর্যাদা সীমাহীন, যার সম্পর্কে স্বয়ং রাসূল (সাঃ)-কেও সপ্তাকাশের উপর থেকে সতর্ক করা হয়েছে। তিনি হলেন সেই মহান সৌভাগ্যের অধিকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ), যার শানে হযরত জিব্রাইল (আঃ) ওহী নিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়েছিলেন। উপরন্তু তিনি রাসূল (সাঃ)-এর মোয়াজ্জিন হওয়ারও পরম সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) মক্কার অধিবাসী এবং কোরাইশ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সম্পর্কে রাসূল (সাঃ)-এর অত্যন্ত নিকটাত্মীয়ও। তিনি উম্মুল মোমেনীন হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর মামাতো ভাই। তাঁর পিতার নাম কাসেম ইবনে যায়েদ এবং মাতার নাম আতেকা বিনতে আবদুল্লাহ। আতেকাকে উম্মে মাকতুম বলার কারণ তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ 'মাকতুম' অর্থাৎ অন্ধ ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বাহ্যিকভাবে দৃষ্টিহীন থাকলেও তাঁর হৃদয়ের চক্ষুটি ছিল উন্মুক্ত। তিনি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা মক্কার মরুতে উদ্ভাসিত ইসলামের আলোকরশ্মিগুলো অবলোকন করতে সমর্থ হয়েছিলেন অত্যন্ত সুন্দরভাবেই। পরম মহিমাময়ের বিশেষ করুণায় তাঁর হৃদয়ে ইসলামের জন্য জাগরণ সৃষ্টি হয়ে গেল। তিনি অগ্রে দৌড়ালেন ইসলামের দিকে। আর অন্তর্ভূক্ত হলেন তাঁদের দলে, যাঁরা সত্য গ্রহণে অগ্রগামী।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবায়ে কেরাম যে সকল নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) সেগুলো চোখ বুঁজে বরদাশত করেছেন অন্যান্যের ন্যায়। ঈমানের পরীক্ষার কঠিন মুহূর্তে তিনি একবিন্দুও ফসকে যাননি, বরং তা দ্বিগুণ শক্তিতে বলীয়ান হয়েছিল। আল্লাহর কালাম, দ্বীন ইসলাম এবং রাসূল (সাঃ)-এর দরবার থেকে জ্ঞান, প্রজ্ঞার অমূল্য মণিমুক্তা যত পারলেন কুড়িয়ে নিলেন।

একদিনকার ঘটনা। মক্কার নেতাদের মধ্যে উতবা ইবনে রাবিআ, শাইবা ইবনে রাবিয়া, আমর ইবনে হিশাম, উমাইয়া ইবনে ফালক এবং ওলিদ ইবনে

মুগীরা প্রমুখ রাসূল (সাঃ)-এর কাছে বসা ছিলেন। রাসূল (সাঃ) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেলেন। তাঁর হৃদয়ের কামনা ছিল এ লোকগুলো ইসলাম গ্রহণ করে নিক, যাতে আমার সাহাবারা এদের নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেয়ে যায়।

জলসা জমজমাট ছিল। সকলেই চুপচাপ শুনতেছিলেন ইসলামের অমিয়বাণী। এ মুহূর্তে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হাজির হয়েই কোরআনের একটি আয়াতের মর্ম জানতে চাইলেন রাসূল (সাঃ)-এর নিকট। তিনি অসময়ে এ প্রশ্ন উত্থাপন করাতে কিছুটা মনক্ষুণ্ণ হলেন। হালকা বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল তাঁর ভ্রুযুগলে। তিনি তাঁর প্রতি মনোযোগ না দিয়ে কোরাইশ নেতাদের প্রতিই লিপ্ত রইলেন। একটিই তাঁর ধ্যান ছিল, এরা ইসলাম গ্রহণ করে নিক, ইসলামের বিজয় হোক এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক ইসলাম।

মজলিস ভঙ্গ হল। রাসূল (সাঃ) ঘরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন এমন সময় ওহহি নাযিল হল, "তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল। আপনি কি জানেন, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত অথবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশে তার উপকার হত। পরন্তু সে বেপরোয়া। আপনি তার চিন্তায় মশগুল। সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোন দোষ নেই। যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো এমতাবস্থায় যে সে ভয় করে। আপনি অবজ্ঞা করলেন। কখনও এরূপ করবেন না এটা উপদেশবাণী। অতএব, যে ইচ্ছা করবে সে একে গ্রহণ করবে। এটা লিখিত আছে সম্মানিত, উচ্চ পবিত্র পত্রসমূহে। লিপিকারের হস্তে, যারা মহৎ পূত চরিত্র।"

এ ষোলটি আয়াত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)-এর শানে নাযিল হল যা আজ পর্যন্ত পাঠ করা হয়। এবং কিয়ামত পর্যন্ত পাঠ করা হবে। এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে হযরত আবদুল্লাহ-এর প্রতি রাসূল (সাঃ)-এর ভালবাসা বেড়ে গেল। এবার প্রতিটি মজলিসে রাসূল (সাঃ) তাঁর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। যখনই তিনি সাক্ষাৎ করতে আসতেন রাসূল (সাঃ) তাঁকে সীমাহীন সম্মান করতেন। প্রীতভাবে কাছে বসাতেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভালমন্দ জিজ্ঞাসা করতেন। তাঁর কোন প্রয়োজন দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ সেটির সমাধান করতেন।

কোরাইশরা যখন মুসলমানদের উপর নিপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে দিল তখন রাসূল (সাঃ) তাদেরকে হিজরত করার অনুমতি দিয়ে দিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে যারা হিজরত করেন তাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)ও ছিলেন। হযরত মুসআব ইবনে উমাইর ও হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) মদীনা পৌঁছে লোকদেরকে

কোরআন শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। পাশাপাশি দাওয়াতী কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখলেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে। তাদের দাওয়াতে মদীনার অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করলেন। কিছুদিন পর স্বয়ং রাসূল (সাঃ) মদীনা হিজরত করলেন। তিনি এসেই হযরত আবদুল্লাহ ও হযরত বেলাল (রাঃ)কে মদীনার মোয়াজ্জিন নির্বাচিত করলেন।

এরা দু'জন প্রতিদিন পাঁচবার মদীনাবাসীকে তাওহীদের এ সুমধুর ধ্বনি শুনাতেন। তাদেরকে আহ্বান করতেন সত্য ও কল্যাণের দিকে দৌড়ে আসার। দু'জনের মধ্যে সাধারণত হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দিতেন এবং আবদুল্লাহ (রাঃ) ইকামত দিতেন। কখনও এর বিপরীতও হতো। রযমান মাসে এ দু'জনের শান হত আরও ভিন্ন আঙ্গিকের। মদীনাবাসীরা একজনের আযান শুনে সেহরী আরম্ভ করতেন। আর অপরজনের আযান শুনে বন্ধ করতেন।

হযরত বেলাল (রাঃ) মদীনাবাসীকে জাগ্রত করার জন্যে আযান দিতেন আর আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দিতেন ফজরের নামাযের জন্য। কারণ তিনি ফজরের সময়টার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুম (রাঃ) কতটুকু মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তা এখান থেকেই বুঝা যায়। রাসূল (সাঃ) তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে অন্তত দশবার মদীনার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। বিশেষ করে তিনি যখন মক্কা বিজয়ের জন্যে মদীনা ছেড়ে যান তখনও তাঁকেই মদীনায় হুজুর (সাঃ) স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যান।

বদরের যুদ্ধের পর আল্লাহ তাআলা বদরে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদের প্রশংসায় কতগুলো আয়াত নাযিল করেন। আয়াতে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। এটা এজন্যে করা হয়েছে, যাতে সকলেই যুদ্ধ অংশগ্রহণে উৎসাহ পায় এবং ঘরে বসে থাকাকে অপছন্দ করে।

আয়াতে বর্ণিত মর্যাদার কথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ তিনি অন্ধ হওয়ার ফলে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নাই। তিনি ভারাক্রান্ত মনে রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হলেন। আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি অন্ধ না হলে নিশ্চয়ই জেহাদে অংশগ্রহণ করতাম। কিন্তু এখনতো আমি জেহাদের ফযিলত থেকে মাহরুম হয়ে পড়লাম। অতঃপর তিনি আক্ষেপের স্বরে বললেন, প্রভু আমার! তুমি আমার ওপর লক্ষ্য রেখে তোমার হুকুম অবতীর্ণ কর। তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন। বৃথা গেল না তাঁর কামনা। আল্লাহ তাআলা তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন।

কাতেবে ওহী হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন, একদিন আমি রাসূল (সাঃ)-এর মোবারক দরবারে বসা ছিলাম, এমন সময় রাসূল (সাঃ)-এর উপর ওহী নাযিল হওয়ার অবস্থা বিরাজ করল। বিশেষ অবস্থাটি কেটে গেলে তিনি আমাকে বললেন ঃ যায়েদ! লিখ। আমি বললাম, কি লিখব? তিনি বললেন, এই আয়াত লিখ– "মোমেনদের মাঝে যারা বসে থাকে আর যারা জেহাদ করে তারা কখনও সমান নয়।" এই আয়াত শুনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম আরয করলেন, "হে রাসূল! যারা মাযুর তাদের সম্পর্কে হুকুম কি?" হযরত যায়েদ বললেন, আলোচনা চলতেছিল এমন সময় রাসূল (সাঃ)-এর উপর আবার ওহী নাযিলের অবস্থা বিরাজ করছে। কিছুক্ষণ পর অবস্থা কেটে গেলে তিনি আমাকে আবার বললেন, যায়েদ! লিখ। আমি বললাম কি লিখব? রাসূল (সাঃ) বললেন, পূর্বের আয়াতটি পুনরায় পাঠ কর, আমি পাঠ করলাম। রাসূল (সাঃ) বললেন শেষে এ অংশটুকু জুড়ে দাও "তাদের ব্যতীত যাদের কোন ওযর রয়েছে।" এই আয়াতের কথা শুনে হযরত আবদুল্লাহর চেহারা আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠল। অবতীর্ণ হলো সেই হুকুম যা তিনি মনে প্রাণে কামনা করতেন।

আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদের প্রশংসায় বর্ণিত আয়াতে মাযুর লোকদেরকে নির্দোষ রেখেছেন এবং তাদেরকে জেহাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। তদুপরি হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর মন মানতেছিল না। বার বার তাঁর মনে একই আগ্রহ উপচে উঠছিল যে, হই না আমি অন্ধ অপরাগ, তাতে কি হয়েছে? জেহাদে অংশগ্রহণ করে কেনই বা আমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করব না?

এটা চির বাস্তব যে, সর্বদা বড় ব্যক্তিরা বড় কাজই করে থাকেন। হযরত আবদুল্লাহর বেলায়ও তাই হল। যেদিন থেকে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হল সেদিন থেকেই তিনি এ চেষ্টাটি আরম্ভ করে দিলেন যে, এখন থেকে কোন জেহাদই যেন আমার হাত ছাড়া না হয়। তিনি নিজেই সুবিধা অনুযায়ী জেহাদের ময়দানে একটি কাজ নির্বাচন করে নিলেন। সেটি হল, তিনি রণাঙ্গনে যেয়ে বলতেন, আমাকে জেহাদের পতাকাটি ধরিয়ে দাও। যেহেতু আমি চোখে দেখি না তাই এটি নিয়ে এক জায়গায় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকবো। আর আমার যত শক্তি আছে তা দিয়ে সেটিকে উঁচু করে ধরে রাখব।

হিজরী ১৪ সনে হযরত ওমর (রাঃ) ইসলামের দুশমনদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে উৎখাত করার জন্য একটি ব্যাপক অভিযানের প্রস্তুতি নিলেন। তিনি রাজ্যের সকল গভর্নরদের কাছে এ মর্মে নির্দেশ পাঠালেন যে, তোমাদের এলাকায় যার কাছে যে অস্ত্র আছে তা একত্রে করে সত্বর আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। হযরত

ওমরের (রাঃ) নির্দেশ মোতাবেক সকল মোজাহিদ মদীনায় এসে জমায়েত হল। এদের মাঝে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)ও ছিলেন। প্রয়োজন অনুযায়ী সৈন্য সংগ্রহ হওয়ার পর ওমর (রাঃ) হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)-কে এ বিশাল বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। অতঃপর সময় বিষয়ক কিছু নির্দেশনা দিয়ে তাদেরকে কাদেসিয়া পাঠিয়ে দিলেন। বাহিনী কাদেসিয়া পৌঁছলে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) লৌহবর্ম পরিধান করে রণাঙ্গনে এলেন এবং সমর ঝাণ্ডা ধরে রাখার জন্য নিজকে পেশ করলেন। তিনি সেনাপতিকে আহ্বান করে বললেন, যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকবে ততক্ষণ আমি এটি শক্তির সাথে ধরে রাখব।

লড়াই শুরু হল। লাগাতার তিনদিন পর্যন্ত চলল উভয়পক্ষের মাঝে মরণাক্রমণ। উভয়পক্ষের সৈন্যই এমন বীরত্ব দেখাল যে, ইতিহাসে এর নজির পাওয়া মুশকিল।

তৃতীয় দিনে একটি চূড়ান্ত আক্রমণের পর যুদ্ধের রূপ পাল্টে গেল। বিজয় পদচুম্বন করল মুসলমানদের। খোদাদ্রোহীদের ভূমিতে এবার পত পত করে উড়তে লাগল তাওহীদের পতাকা। কিন্তু এ পতাকা উড়াতে বিজয় ছিনিয়ে আনতে মূল্য দিতে হয়েছিল হাজার হাজার শহীদদের রক্তের মাধ্যমে। এর মাঝে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)-এর ত্যাগ ছিল। তিনি শহীদ হয়ে রণাঙ্গনে এমন অবস্থায় পড়েছিলেন যে ঝাণ্ডাটি ধরা ছিল তার হাতের মুঠোয়।– দুটি লেখা মুফতি মাওলানা ইলিয়াস আমীনীর সৌজন্যে প্রাপ্ত

মদীনা রাষ্ট্রের উপর সম্মিলিত কাফের শক্তির ঐক্যবদ্ধ চূড়ান্ত আক্রমণ ঃ আহযাবের যুদ্ধ

মহানবীর (সাঃ) জীবদ্দশায় ইসলামের যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে পরিখার যুদ্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময়। পরিখার যুদ্ধ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ যুদ্ধ চতুর্থ হিজরী মতান্তরে পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসেই সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধকে আহযাবের যুদ্ধও বলা হয়।

ওহুদের ময়দান থেকে ফেরার পথে আবু সুফিয়ান আস্ফালন করে যে বাক্য উচ্চারণ করেছিল, তাতে মনে হচ্ছিল উদীয়মান মুসলিম শক্তিকে সমূলে বিনষ্ট করার জন্যে পৌত্তলিক কোরেশগণ আরেকবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। কোশেরদের জানা ছিল না যে মুসলমানদের পরাভূত করা তত সহজ নয়। সুতরাং সারাদেশ ঘুরে আবু সুফিয়ান মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ সৃষ্টির কৌশল আবিষ্কার করে। নঈম নামক একজন নিরপেক্ষ লোককে হাত করে আবু সুফিয়ান তাকে এ সংবাদ পৌঁছাবার জন্যে পাঠালো যে, এবার আবু সুফিয়ান বিপুল সুসজ্জিত সৈন্য ও রণসজ্জা নিয়ে বদরপ্রান্তরে আসছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবু আবু সুফিয়ানের এ সংবাদকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন এবং ১৫০০ বীর মুসলিম যোদ্ধা নিয়ে তিনি অবিলম্বে বদরপ্রান্তরে উপস্থিত হন। নবীজী সেখানে আটদিন অপেক্ষা করার পরও শত্রুবাহিনীর কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। বনু নাযির গোত্র বেশিরভাগই আস্তানা গড়েছিল খায়বারে। হাই ইবনে আখতাব মক্কায় গিয়ে কোরায়েশদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে উস্কানি দেয় এবং কেসনা বিন রবী বনী গৎফানের নিকট গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে সংগঠিত করে। ফলে আবু সুফিয়ানের বিশাল একটি সৈন্যবাহিনী সংগৃহীত হয়ে যায়। এভাবে আবু সুফিয়ান প্রায় দশ হাজার সৈন্যবাহিনী নিয়ে মুসলমানদেরকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে মদীনার পথে রওয়ানা দেন।

কোরেশদের বিপুল সমরায়োজন এবং আসন্ন অভিযানের সংবাদ পেয়ে মুসলমানরাও বসেছিলেন না। সমগ্র মদীনায় যুদ্ধ যুদ্ধ রব পড়ে যায়। মুসলমানরা একটুও ভীত হলেন না। নবীজী (সাঃ) সাহাবাদের নিয়ে পরামর্শসভা করলেন। সিদ্ধান্ত হলো এবার কিছুতেই নগরের বাইরে যাওয়া হবে না, কারণ ইহুদী এবং নাসারাদের হাতে মদীনানগরী ছেড়ে দিয়ে বাইরে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না।

অভিজ্ঞ সাহাবী হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) প্রস্তাব দিলেন, "আমাদের দেশে এ রকম বহিঃশত্রুদের আক্রমণ দেখা দিলে শহরের চারদিকে খন্দক (পরিখা) খনন

করে শহরের অভ্যন্তর থেকে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করা হতো। বর্তমান পরিস্থিতেতে এ পন্থা অবলম্বন করলে উত্তম হবে মনে হয়।" এ নতুন পরিকল্পনাটি নবীজীর খুব মনঃপূত হলো এবং মদীনার যেদিক থেকে পাহাড় প্রাচীরবিহীন খোলা ছিল, নবীজী সেদিক থেকে পরিখা খননের নির্দেশ দিলেন। কাজের শৃংখলার জন্যে মহানবী (সাঃ) মুসলমানদেরকে দশ-দশজনের এক একটি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে দেন। প্রত্যেক দল দশ গজ পরিমিত গড়ে খনন করে দেবেন এবং পরিখার গভীরতা হবে পাঁচ গজ। একমাত্র মুনাফিকের দল ব্যতীত সকল মুসলমান কালবিলম্ব না করে ক্ষুধা-তৃষ্ণা তুচ্ছ করে পরিখা খননের কাজে লেগে গেলেন। সাহাবাদের কঠোর পরিশ্রমে প্রায় ২৫০০ গজ দৈর্ঘের পরিখাটি মাত্র ২০ দিনে খননের কাজ সমাপ্ত করেন।

মুসলমানগণ মৃত্তিকা খননের কাজ করে যাচ্ছেন। এ সময় এক অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা হয়। তাঁরা কাঁধে মাটির ঝুড়ি বহণ করছেন আর পরমানন্দে সববেত কণ্ঠে ঝংকার দিয়ে গেয়ে যাচ্ছেন ঃ

"আমরা তারাই, যারা শপথ নিয়েছি মুহাম্মদের হাতে; জীবনের যদ্দিন আছে, আমরা অটুট রবো, আল-জিহাদের পথে।" সাহাবাগণের এ আনন্দগীতির উত্তরে নবীজী এরশাদ ফরমান, হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই সত্যিকারের জীবন তো পরকালীন জীবন। সুতরাং আনসার এবং মুহাজিরগণকে মার্জনা করে দিন। তিনি আরো ফরমান, হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আখিরাতের কল্যাণই সত্যিকারের কল্যাণ। সুতরাং আনসার ও মুহাজিরগণকে আখিরাতের কল্যাণ দান করুন। স্বয়ং নবীজী পরীক্ষা খননের কাজে অংশগ্রহণ করেন। হযরত বরা'আ বিন আজের (রাঃ) বলেন, নবীজী মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে উঠাচ্ছেন এমন কি তাঁর লাল পোশাকের বুকের উপর ধুলা মেখে, তাঁর কাঁধ পর্যন্ত কালো চুল ধূসরিত হয়ে তাঁকে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছিল।

পরিখা খননকারী সাহাবাগণ সকলেই ছিলেন অভাবী। ক্ষুধার অবসন্নতা রোধ কল্পে তাঁরা পেটে পাথর বেঁধে নিতেন। কেউ একজন নবীজীকে এ কথা জানালে তিনি জামা উঠিয়ে তাঁর পেটে দ্বিগুণ পাথর বাঁধা দেখালেন।

নবীজীর ক্ষুধার যন্ত্রণা দেখে হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ তাঁর স্ত্রীকে বলে নবীজীর জন্য কিছু যবের আটার রুটি তৈরি করলেন। ছোট একটি বকরীর বাচ্চাও যবেহ করলেন। তিনি নবীজীর নিকট গিয়ে কানে কানে বললেন, "আপনার জন্য সামান্য আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি তশরিফ নেন তবে কৃতার্থ হবো।"

হযরত যাবেরের এ কথা শুনে নবীজী সরবে বললেন, "হে আহ্‌লে খন্দক! জাবির তোমাদেরকে দাওয়াত করেছে।" হযরত জাবীর একথা শুনে স্ত্রীকে গিয়ে বিচলিত হয়ে বললেন। স্ত্রী বললেন, "আপনি চিন্তিত হবেন না, নবীজীকে একা দাওয়াত করার পরও তিন কেন যে এমন করলেন তা তিনিই জানেন।"

মহানবী (সাঃ) প্রায় এক হাজার সাহাবা নিয়ে জাবিরের বাড়ীতে গেলে। আটা এবং মাংস তাঁর পবিত্র হাতে স্পর্শ করে বললেন, "মাংসের পাত্র কেউ উন্মুক্ত করবে না।" এতে দেখা গেল এক হাজার সাহাবা সন্তুষ্ট হয়ে আহার করলেন কিন্তু মাংস আর রুটি দুটোর পাতিল পূর্ণাবস্থায় রয়েছে, ছোবাহানাল্লাহ।

পরিখা খননের সময় প্রকাণ্ড এক পাথর পড়ল। সকলে মিলে পাথর সরানোর জন্যে সাধ্যাতীত চেষ্টা চালালেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। তখন হযরত সালমান এসে পাথরের কথা নবীজীকে শুধালেন, তিনি (সাঃ) বিসমিল্লাহ বলে কোদাল নিয়ে সজোরে কোপ মারলেন। প্রথম কোপেই পাথরের এক তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে যায় এবং আলোর এক ঝলকে সুদূর শাম দেশের দালানকোঠা তাঁর নজরে ভেসে উঠে। দ্বিতীয় কোপে অপর তৃতীয়াংশ এবং তৃতীয় কোপে পাথরটি একবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়ে। শেষের দুই কোপের আলোর ঝলকে ইয়ামেন আর পারস্য দেশের রাজপ্রাসাদ তিনি দেখতে পান। তখন তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে বললেন, এই সমস্ত দেশ মুসলমানদের করতলগত হবে ইনশাআল্লাহ। এ দেশের লোকেরা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেবে একদিন।

প্রকাণ্ড পরিখা খননের কাজ সমাপ্ত। পরিখাটি এতবড় খনন করা হলো যে, যে কোন অশ্বারোহী লম্ফ দিয়ে যেন অপর পারে পৌছাতে না পারে। খাদের মাটি দিয়ে উঁচু ভেড়িবাঁধ দেয়া হল। শত্রুদের আক্রমণের জন্যে বড় বড় প্রস্তর রাখা হল। কিন্তু বনী কুরায়জার চুক্তি ভঙ্গের কথায় নবীজী অতিশয় চিন্তিত হলেন। সাদ বিন উবাদাহ্‌সহ দু'জন সাহাবাকে পাঠিয়ে তাদের অবস্থা এবং পরিস্থিতি জেনে নিলেন।

৬২৭ খৃষ্টাব্দে ২৪ মার্চ হিজরী ৫ম সনের ২৯ শে শাওয়াল আবু সুফিয়ান ১০ হাজারেরও অধিক সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হন। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার। শত্রুবাহিনী মদীনায় পৌঁছে ঘেরা দিয়ে রইল। উভয়পক্ষের ব্যবধান শুধু পরিখাটিই। কাফেরগণ বারবার চেষ্টা করেও পরিখা পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে পারল না। প্রত্যেকবারেই মুসলিম সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়ে শত্রুগণ পিছু হটতে বাধ্য হয়। মদীনার ইহুদীগণ চুক্তি ভঙ্গ করে শত্রুবাহিনীর সাথে এই সিদ্ধান্তে স্থির হল যে, মুসলমানরা যখন যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে তখন ইহুদীরা তাদের মহল্লা থেকে বের হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাবে। মহানবী (সাঃ) ইহুদীগণের বিশ্বাসঘাতকতা আঁচ করতে পেরে ৩০০০ সৈন্যবাহিনী থেকে ৫০০ জনকে আলাদা করে দু'জন সুদক্ষ সেনাপতির তত্ত্বাবধানে ইহুদী বস্তির চারদিকে পাহারা দেবার নির্দেশ দিলেন।

শত্রুবাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে পৌছার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর পরিবারের লোকজনকে বিভিন্ন দুর্গে প্রেরণ করেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) গেলেন বনু হারিসের দুর্গে। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) ফুপু হযরত সাফিয়া (রাঃ) পৌছলেন

হাসসান বিন সাবিতের ফারি নামক দুর্গে। এখানে তিনি এক দুঃসাহসিক কীর্তির পরিচয় দেন। মুসলিম বাহিনী যখন জীবন-মরণ লড়াইয়ে লিপ্ত এ সময় একদল ইহুদী মুসলমানদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন ও নারী এবং শিশুদের নির্যাতনের অপচেষ্টার উদ্যোগ নেয়। হযরত সাফিনা তাদের এ ঘৃণ্য অবস্থা অবলোকন করে তাদের একজন দুর্গের দেয়ালে আরোহণ করতে দেখে তিনি কারো সাহায্য ব্যতিরেকেই তাঁবুর খুঁটি দিয়ে লোকটির মাথায় আঘাত করে মৃত্যুর যমঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

আবু সুফিয়ান বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছে পরিখা দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। ইতিপূর্বে যুদ্ধের এমন কৌশল আর কখনো দেখেনি। আবু জেহেল পুত্র ইকরামা পরিখার একটি অগভীর স্থান পেয়ে অনেক চেষ্টার পর পরিখার প্রাচীর ভেঙ্গে পথ তৈরী করে নেয়। শত্রুবাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীর আমর বিন আবদেওয়াদে সে পথে অবতরণ করে মুসলমানদেরকে দ্বৈতযুদ্ধে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। শেরে খোদা হযরত আলী এগিয়ে এসে আমরকে ইসলামের দাওয়াত জানান। কিন্তু আমর সে দাওয়াত প্রত্যাখান করে। অতঃপর হযরত আলী আমরকে যুদ্ধের মোকাবিলা করার প্রস্তাব দেন। আমর বলল, আলী! তুমি এখনও কম বয়সের লোক, তোমার সাথে লড়াই করতে আমি পছন্দ করি না। তোমার চেয়ে বড় বীর কেউ যদি থাকে তাকে আসতে বল। হযরত আলী বলেন, আমি কিন্তু তোমার সাথে যুদ্ধ করতে উৎসুক। একথা শুনে আমর রাগান্বিত হয়ে ঘোড়া থেকে অবতরণ করে হযরত আলীকে আঘাত করল, এতে তিনি সামান্য আহত হলেন। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) পুনঃআক্রমণ করে আমরের জীবনলীলা সাঙ্গ করে দিলেন। হযরত আলী 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে তাকবীর দিয়ে আকাশ মুখরিত করে তোলেন।

নওফল বিন আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহকে হত্যা করার উদ্দেশে অগ্রসর হল। ঘোড়ায় আরোহণ করে লম্ফ দিয়ে পরিখা অতিক্রম করার চেষ্টা করল, কিন্তু সেও খন্দকে পড়ে গর্দান ভেঙ্গে মৃত্যুবরণ করল। তার মৃত লাশ নিয়ে যাবার জন্যে রাসূলুল্লাহর খেদমতে ১০ (দশ) হাজার দিরহাম পেশ করলেন। কিন্তু নবীজী অবজ্ঞার সুরে দশ হাজার দিরহাম প্রত্যাখ্যান করেন এবং কোন বিনিময় ছাড়াই তার লাশ ফেরত দেন।

হযরত সাদ বিন মোআজ-এর গর্দানে একটি তীর বিদ্ধ হল। এ সময় তিনি আল্লাহর নিকট এ পার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! কোরেশদের সাথে যুদ্ধ এখনও যদি বাকী থাকে তবে এ জন্যই আমাকে জীবত রাখুন, কারণ তাদের সাথে জিহাদ করার চাইতে আর কোন বস্তু আমার কাছে বেশি প্রিয় নয়। কারণ তারা আমার প্রিয় নবীজীকে কষ্ট দিয়েছে, তাঁকে তাঁর জন্মভূমি মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছ। হে আল্লাহ! যুদ্ধ যদি এখানেই সমাপ্ত হয় তবে এ আঘাত আমার শাহাদতের উসিলা করে দাও। আর ততক্ষণ আমার মৃত্যু অবধারিত করবেন না, যতক্ষণ না বনি

কুরাইজার অপদস্থ এবং পরাজয় আমার চোখে দেখতে পাই। সেদিনের হামলা এতই ভয়াবহ ছিল যে, উভয়পক্ষের তীর ও প্রস্তরবর্ষণে আকাশ ভারী হয়ে ওঠে। এতে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) চার ওয়াক্ত নামাজ ক্বাজা হয়ে যায়। শত্রু বাহিনীর বেষ্টনীর মধ্যে বনি গৎফানের সর্দার নাঈম বিন মাসউদ আসযায়ী রাসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে হাজির হয়ে মহান ইসলামে দিক্ষিত হলেন এবং তিনি আরো আরজ করলেন যে তাঁর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ তাঁর গোত্রের লোকেরা জানে না, সুতরাং ইচ্ছা করলে তিনি যে কোন কূটকৌশলে শত্রুদের এ অবরোধ খতম করে দিতে পারেন– এই মর্মে তিনি কৌশল অবলম্বনের জন্যে রাসূলুল্লাহর নিকট অনুমতি চাইলেন; নবীজী তখন তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি তাঁর গোত্রের লোকদেরকে কোরেশদের সহযোগিতা করা থেকে বিরত রাখলেন, ফলে শত্রুবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়লো।

হযরত আবু ছাইদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, অবরুদ্ধ মুসলমানদের অবস্থা সংকটময় দেখে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রার্থনা করার অনুরোধ জানালেন। নবীজী আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানালেন। ফলে সেই রাতে একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় উঠে, কোরেশদের তাঁবুগুলো মাটি চাপা পড়ে যায়। একটানা তিনদিন তিনরাতের বৃষ্টিতে শত্রুবাহিনীর তাঁবু এবং রসদপত্র তছনছ হয়ে যায়। অতি বৃষ্টির কারণে শিবিরের আগুন বুজে গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আবু সুফিয়ান স্থির করল মক্কায় ফিরে যাওয়ার। এদিকে নবীজী হুজায়ফাকে গোপনে শত্রুদের শিবিরে প্রেরণ করে তাদের করুণ অবস্থার কথা জেনে নিলেন। পবিত্র কোরআনে পাকে আল্লাহ্ পাক ঘটনাটি এভাবে চিত্রিত করেছেন। এরশাদ হচ্ছে ঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ পাকের সেই অনুগ্রহকে স্মরণ করো, যখন শত্রু বাহিনী একেবারে তোমার নিকটবর্তী হয়েছিল। এ সময় তোমাদের শত্রুদের উপর প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় প্রেরণ করেছি এবং আসমান থেকে অদৃশ্য এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছি। আর তোমরা যা কর তা তিনি দেখেন।" আযহাব ঃ ৯

পরদিন মুসলমানগণ দেখে বিস্মিত হন যে, হযরত হুযায়ফা সংগোপনে যা শুনেছিলেন এবং দেখেছিলেন তা সঠিক প্রমাণিত হয়। শত্রু বাহিনী দশ হাজার সশস্ত্র সৈন্য বাহিনী নিয়ে মক্কায় ফিরে যায়, যুদ্ধক্ষেত্রে ছিন্ন তাঁবু এবং ভগ্ন আসবাব, নির্বাপিত ভস্মস্তূপ আর অবরোধের মর্মান্তিক স্মৃতি পড়ে রইল। শত্রু সৈন্যদের প্রস্তানের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং বললেন ঃ এখন থেকে আমরা তাদের উপর চড়াও হবো। এরপর তারা আর আমাদের উপর চড়াও হতে পারবে না।

মূলতঃ পরিখার যুদ্ধ ছিল ইসলামের একটি চূড়ান্ত এবং অবিস্মরণীয় বিজয়। মহানবীর প্রিয় সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) পরিখা খননের এই পরিকল্পনার পরামর্শ দিয়ে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন ইসলামের ইতিহাসে।

উপমহাদেশের চরম সংকটকালীন চিন্তানায়ক
শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবীর বিপ্লবী চিন্তাধারা

মোঘল সাম্রাজ্যের পতনকালে যখন চারদিকে বিদ্রোহ চলছিল, রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাঙ্গনের সর্বত্রই এক নৈরাজ্যকর অবস্থা চলছিল, চারদিকে জুলুম, শোষণ ও অস্থিরতা বিরাজ করছিল ঠিক এমনি এক মুহূর্তে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (রহঃ) এক প্রভাতী সূর্যের-ন্যায় আবির্ভূত হলেন। তিনি ইসলামকে বিকৃতির হাত থেকে মুক্ত করলেন। রাজনীতিকে ইসলামের সেবক ও ইসলামপন্থীদের শৌর্যের প্রতীকরূপে প্রতীয়মান করলেন।

তাঁর আসল নাম আহমদ, উপাধি কুতুবুদ্দিন ও হুজ্জাতুল ইসলাম। তাঁর ডাক নাম শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী, এ নামেই বিশ্বে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর পিতার নাম শায়খ আবদুর রহিম। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মোতাবেক ১১৬৪ হিজরীর ১৪ শাওয়াল রোজ বুধবার দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বছর বয়সেই কুরআন শিক্ষার জন্য তাঁকে মকতবে ভর্তি করা হয়। সাত বছর বয়সে তিনি কুরআনের হাফেজ হন। সে বছরই তাঁর পিতা তাঁকে রোযা রাখার নির্দেশ দেন এবং অন্যান্য ইসলামের বিধি-বিধানও যথাযথভাবে আমল করার জন্য উপদেশ দেন। সাত বছর বয়স থেকে তিনি ফার্সী অনায়াসে পড়ার যোগ্যতা হাসিল করেন। এক বছরে ফার্সী শেষ করে নাহু, সরফ সম্পর্কিত গ্রন্থাদি পড়া শুরু করেন। দশ বছর বয়সে তিনি শরহে মোল্লা জামী আয়ত্ত করেন।

মোট কথা, মাত্র তিন বছরে তিনি নাহু সরফে এরূপ পারদর্শী হলেন যে, উক্ত বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ পর্যন্ত তাঁর সামনে এসে মাথা নত করতে বাধ্য হতেন। তিনি লোগাত, তফসির, হাদীস ফিকাহ্, তাসাওফ, আকায়েদ, মানতেক, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক কিতাব ও গ্রন্থাদি তাঁর আব্বার কাছে শিখেন। মাত্র পনের বছর বয়সে তিনি এসব গ্রন্থ অধ্যয়ন শেষ করেন। পুঁথিগত ও জ্ঞানগত সকল বিদ্যা সমাপ্ত করে তিনি তাঁর আব্বার হাতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের জন্যে বাইয়াত নেন। অতঃপর তিনি নকশ্‌বন্দিয়া তরীকার সূফীদের বিভিন্ন স্তর আয়ত্ব করেন। তিনি আধ্যাত্মচর্চার ক্ষেত্রে এরূপ দক্ষতা অর্জন করেন যে, অল্প সময়ের ভিতরে তিনি সেই জগতেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করলেন। সূলুক সম্পর্কিত তালীম শেষ হলে তাঁর আব্বা তাঁর মাথায় মর্যাদার পাগড়ী বেঁধে দেন এবং তাঁকে শিক্ষাদান করার অনুমতি প্রদান করেন।

শাহ্ সাহেব (রহঃ) যখন চৌদ্দ বছরে উপনীত হন তাঁর পিতা তাঁকে বিবাহ করানোর সিদ্ধান্ত নেন ও বিবাহ করান। বিয়ের কিছুদিন পর তাঁর মাতা ইন্তেকাল

করেন, এর কিছুদিন পর তাঁর পিতার ইন্তেকাল হয়। তিনি তাঁর জাহেরী ও বাতেনী ইলমের জোরে এসব বিপদাপদ সহজেই কাটিয়ে ওঠেন।

তাঁর আব্বার ইন্তেকালের পর ১১৩১ হিজরীতে তিনি রহিমিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। তারপর এক যুগ শিক্ষকতার মাধ্যমে আরব আজমের সর্বত্র স্বীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার বিরাট খ্যাতি অর্জন করেন। চারদিক থেকে ছাত্ররা ছুটে আসছিল তাঁর কাছে জ্ঞানার্জনের জন্য। তাঁরা জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন। বার বছর শিক্ষকতা করার পর তিনি হজ্জের নিয়তে মক্কা যাবার উদ্যোগ নেন এবং ১১৪৩ হিজরীতে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রায় দু'বছর তিনি মক্কা ও মদীনায় কাটান। সেখানকার ওলামায়ে কেরামের সাথে মিলিত হন। সেখানকার হাদীসবেত্তাদের থেকে তিনি হাদীসের সনদ নেন। বিশেষতঃ শায়েখ ওবায়দুল্লাহ ইবনে সুলায়মান আল-মাগরেবীর কাছে থেকে তিনি বিশেষভাবে হাদীসের সনদ গ্রহণ করেন। তাছাড়া সেকালের হারামাইনের সেরা আলেম ফকীহ ও মুহাদ্দিস শায়েখ আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম আল-মাদানী থেকেও তিনি হাদীসের সনদ নেন।

হারামাইন শরীফাইনের বুযুর্গ ও ওলামায়ে কেরামের কাছ থেকে জাহেরী ও বাতেনী ইলমে ভরপুর হয়ে শাহ্সাহেব উপমহাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১১৪৫ হিজরীর ১৪ রজব তিনি দিল্লী পৌঁছেন এবং নিজ পিতৃকালয়ে অবস্থান করেন। কিছুদিন তিনি বিশ্রাম নেন। এ ফাঁকে দিল্লীর ওলামা মাশায়েখদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেন। তারপর রহীমিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষাদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শত শত হাদীস শিক্ষার্থী সেখানে ছুটে এসে তাঁর কাছ থেকে হাদীসের সনদ হাসিল করে চলেন। আশেপাশের রাজ্যগুলোয়ও অনতিকালের ভেতর হাদীস চর্চায় ছড়িয়ে পড়েন। তিনি অসংখ্য ইলমে জাহেরির ও বাতেনীর ছাত্র রেখে ও ভক্তবৃন্দ রেখে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মুহাদ্দেসীনের কবরস্থানে তথা পুরাতন দিল্লীর শাহজাহানাবাদের দক্ষিণভাগে তাঁকে দাফন করা হয়।

সুতরাং তাঁর জীবনকাল উপমহাদেশের মুসলমানদের এক চরম সংকটময় সন্ধিক্ষণের সাথে ঐতিহাসিক সূত্রে প্রথিত। তাঁর যুগোপযোগী বিপ্লবী চিন্তাধারার জন্যে উপমহাদেশের একজন খ্যাতনামা আধুনিক পণ্ডিত তাঁকে Thinker of Crisis রূপে আখ্যায়িত করেছেন। আধুনিক সমাজবাদের জনক কার্ল মার্কস কর্তৃক সাম্যবাদী অর্থনৈতিক কর্মসূচী পেশ করার দীর্ঘ এক শতাব্দীরও অধিকাল পূর্বে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রহঃ) সমাজ জীবনের অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিধান-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। অতএব, এই দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলেও হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রহঃ)-এর চিন্তাধারা

অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। তবে তাঁর উপমহাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত প্রয়েজন মনে করি।

সামাজিক অবস্থা ঃ ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শুরু হয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের পতনের যুগ। সম্রাটের অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের হাতে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় পারস্য থেকে নাদির শাহের আক্রমণে (১৭৩৯ খৃঃ), মুগঘলদের শেষ শক্তিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। দক্ষিণের মারাঠা শক্তি দিল্লীতে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। মুঘল বাদশাহরা ছিলেন তাদের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। দিল্লীতে শাহী দরবারের আমীর উমরাহগণ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আত্মকলহ, ষড়যন্ত্র এবং একে অপরকে কিভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন সেই প্রচেষ্টায় সদা তৎপর। আলেমগণ ইজতেহাদের মাধ্যমে যুগ সমস্যার চ্যালেঞ্জের মোকাবেলার বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে তুমুল বিতণ্ডায় মশগুল।

ভণ্ড পীরদের একটি বিরাট অংশ মুসলিম জনগণকে ইসলাম অনুমোদিত নয় এমন পথের দিকে পরিচালিত করছিল। ঠিক এই সময় অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যায়ে বাংলাদেশে চলছিল চরম রাজনৈতিক গোলযোগ। নবাব আলীবর্দী খাঁ একদিকে মারাঠা বর্গীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন আবার অন্যদিকে রোহিলাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। এভাবে মারাঠা এবং রোহিলাদের দমন করতেই তাঁর প্রাণান্ত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা বেশিদিন বাংলার মসনদে টিকে থাকতে পারলেন না। বাণিজ্য বেশে দেশে আগত ইউরোপের কতিপয় খৃস্টান জাতি বহুদিন থেকে ভারতের সিংহাসনের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। সম্রাট আকবরের সময়ে তারা দিল্লীর দরবারে প্রবেশ করে। অতঃপর বাদশাহের নিকট থেকে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূল এবং সেখান থেকে বাংলার উপকূলে প্রবেশ করে মাত্র একশো বছরের মধ্যে নিজেদের শক্তিশালী করে গড়ে তোলে। ইউরোপ থেকে আগত পর্তুগীজ ফরাসি ও ইংরেজ তিনটি খৃস্টান জাতির মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত ইংরেজরাই নিজেদেরকে শক্তিশালী প্রমাণ করে। ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও তারা এদেশে ব্যাপকভাবে খৃস্টান মিশনারী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলো। তারা বাংলাদেশে পদার্পণ করেই হিন্দুদের মুসলিমবিদ্বেষী মনোভাব আঁচ করতে পারে। তাই হিন্দুদেরকে তারা নিজেদের সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করে। অন্যদিকে মুসলিম সমাজের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মুসলিম শিবির দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। মীর জাফর আলী খাঁর নেতৃত্বে নবাব পরিবারের একটি গ্রুপ ক্ষমতার লোভে হিন্দু ও ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। ক্ষমতার মধ্যমণি ইংরেজরা এ সুযোগ হাতছাড়া করল না। পলাশীর যুদ্ধের এক প্রসহনমূলক নাটকীয় ঘটনার মাধ্যমে

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা নিহত হন এবং ইংরেজদের হাতের পুতুল হিসেবে মীর জাফর আলী খাঁ ক্ষমতার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন।

হিন্দুদের সাংস্কৃতিক প্রাধান্য ও ইংরেজদের রাজনৈতিক গোলামীর অন্তহীন সমুদ্রে ডুবে যায় বাংলার মুসলিম সমাজ।

এভাবে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মাত্র অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই বাংলাদেশসহ সমগ্র উপমহাদেশে ইসলাম ও মুসলিম সমাজের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘোর অমানিশা নেমে আসে। ঠিক তেমনি এক সংকটময় সন্ধিক্ষণে দুর্যোগের ঘোর অমানিশা ভেদ করে একটি আশার আলোকবর্তিকা হিসেবে আবির্ভূত হন শতাব্দীর মুক্তিদূত হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রহঃ)।

ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী। উপমহাদেশের মুসলিম শাসনের ঐ পতন যুগে তাঁর ন্যায় সুসংহত বিপুল ইসলামী জ্ঞানসম্পন্ন নেতৃত্বেরই প্রয়োজন ছিল। সেই অন্ধকার যুগে শিক্ষা লাভ করে তিনি এমন একজন মুক্ত বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তানায়ক ও ভাষ্যকার হিসেবে জনসমক্ষে আবির্ভূত হন যিনি শতাব্দীর জমাটবাঁধা বিদ্বেষের বন্ধন ছিন্ন করে প্রতিটি জীবন সমস্যার উপর গভীর অনুসন্ধানকারী ও মুজতাদিদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তিনি মতবাদের বিভ্রান্তি মুক্ত করে চিন্তা ও গবেষণার একটি পরিচ্ছন্ন ও সরল রাজপথ তৈরি করেন এবং মানসজগতের সমকালীন পরিস্থিতির বিরুদ্ধে অস্থিরতা সৃষ্টি করে নব সৃষ্টির এমন এক চিত্তাকর্ষক নকশা তৈরি করেন যার ফলে অনিবার্যরূপে অন্যায় ও অসুন্দরের ধ্বংস সাধন এবং ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে একটি আন্দোলন জন্ম লাভ করে। তিনি সংশোধনের ছুরি চালিয়ে শতাব্দীর জমাটবাঁধা বিভ্রান্তির জাল ছিন্নভিন্ন করেন, বুদ্ধি ও চিন্তার জগতে নতুন আলোক শিখার উন্মেষ ঘটান।

বিপ্লবের সুচনা ঃ তিনি ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে মক্কা থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে তাঁর বৈপ্লবিক কর্ম তালিকা অনুসারে সর্বপ্রথম যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল ইসলামী জীবন বিধানের মূল উৎস পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষাকে ভারতীয় উপমহাদেশের অনারব অধিবাসীদের নিকট সঠিকভাবে উপস্থাপন তথা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের নিমিত্ত ফারসী ভাষায় কোরআন শরীফের পূর্ণাঙ্গ তরজমা প্রনয়ণ করা। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শাহ ওয়ালী উল্লাহই সর্বপ্রথম পবিত্র কোরআনে আরবী ভাষা হতে অন্য ভাষায় অনুবাদ করেন। অর্থাৎ ইতোপূর্বে অন্য কোন ভাষায় কোরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং তা ছিল শাহ ওয়ালী উল্লাহর এক বিপ্লবী পদক্ষেপ, যার ফলে অনারব মুসলিমগণ ইসলামের মর্মবাণী পবিত্র কোরআনকে সঠিকভাবে হৃদয়াঙ্গম করার সুযোগ পান। তাঁর এই পদক্ষেপ আধুনিককালে সমাদৃত হলেও সমকালীন অজ্ঞ ও ধর্মান্ধ জ্ঞানীরা এ জন্য তাঁকে

হত্যা করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) কর্তৃক দীর্ঘ ১১ বছরব্যাপী সাধনার ফলশ্রুতি পবিত্র কোরআনের এই ফার্সী অনুবাদের নাম 'ফতহুর রহমান'।

তাঁর নিজস্ব ভাষ্য অনুযায়ী ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সমাজ তখন মেরুমজ্জার এমন এক ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছিল যা তাদের সমাজ দেহকে ক্রমশঃ কুরে কুরে খাচ্ছিল। ঐ প্রেক্ষিতে একজন বিজ্ঞ মুজতাহিদ হিসেবে তিনি মুসলিম সমাজ দেহে বিদ্যমান ঐ মেরুমজ্জার ক্ষয়রোগের উৎস নির্ণয়ে সচেষ্ট হন।

মুসলিম সমাজ দেহ থেকে এই জটিল রোগের প্রতিবিধানকল্পে একদিকে তিনি শিরক, বিদআত ও জাহেলিয়াতের পঙ্কে নিমজ্জিত মুসলিমগণকে কোরআনের ও সুন্নাহর মূলনীতি তথা নির্ভেজাল ইসলামের দিকে ফিরে যেতে বলেন এবং অপরদিকে তিনি মুসলিম শাসকগণকে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কার সাধনের আহ্বান জানান যাতে করে রাজনৈতিক অধঃপতন রোধ করা যায়।

উপমহাদেশের ইতিহাসে সম্ভবতঃ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহই প্রথম বিভিন্ন পেশাজীবী মুসলিমগণকে তাদের আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, শিক্ষা, চরিত্র, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রে মিশ্রিত সকল প্রকার জাহেলিয়াতের প্রতি আঙ্গুলি নির্দেশ করে ইসলামের মূলগ্রন্থ এবং নির্ভুল জ্ঞানের একমাত্র উৎস কোরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে নিজেদের চিন্তা ও কর্মের পরিশুদ্ধির জন্যে আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি ইসলামী জ্ঞান চিন্তার পুনর্গঠন কাজের ব্যাপারে তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলে এই যে, তিনি ফিকাহ শাস্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যম পন্থা পেশ করেন। এতে কোন বিশেষ মাযহাবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব যেমন হয়নি তেমনি কোন বিশেষ মাযহাবের সমালোচনাও করা হয়নি। একজন গভীর অনুসন্ধানকারীর ন্যায় তিনি সকল ফিকাহভিত্তিক মহযাবের নীতি পদ্ধতি অধ্যয়ন করেন এবং স্বাধীনভাবে রায় প্রদান করেন। কোন মযহাবের কোন বিষয়ের স্বপক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ লাভ করার কারণেই তিনি তার প্রতি সমর্থন জানান সেই মযহাবের সাফাই বলার জন্যে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে তিনি তার প্রতি সমর্থন জানাননি। আবার কোন মযহাবের কোন কোন বিষয়ের বিরোধিতা এজন্যে করেছেন যে, যুক্তি ও প্রমাণ তার বিরুদ্ধে পেয়েছেন এ জন্যে নয় যে, ঐ মযহাবের বিরদ্ধে তাঁর মনে কোন প্রকার বিদ্বেষ ছিল। এ কারণেই কোথাও তাকে হানাফী, কোথাও শাফেয়ী, কোথাও মালেকী আবার কোথাও হাম্বলীরূপে দেখা যায়। তিনি তাদের বিরোধিতা করেন যারা বিভিন্ন মযহাবের উমামগণের মধ্যে কোন বিশেষ একজনের বিরোধিতা করার জন্যে কসম খেয়ে বসেছে।

এভাবে তিনি মুসলমানদের মধ্যে মযহাবী বিরোধ মিটাবার পন্থা নির্দেশ করেন এবং সাথে সাথে ইজতেহাদের উপর জোর দেন। তিনি ইসলামের সমগ্র ভাবাদর্শ,

নৈতিক, তমদ্দুনিক ও শরীয়ত ব্যবস্থাকে লিপিবদ্ধ আকারে পেশ করার চেষ্টা করেন। ইসলাম ও জাহিলিয়াতের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি তা সম্পূর্ণরূপে জনসমক্ষে পেশ করেন এবং কেবল ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেই ক্ষান্ত হননি, বরং বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন যার ফলে ঈমানদারদের পক্ষে জাহেলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে প্রচেষ্টা না চালিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ বিষয়টি তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা এবং ইজালাতুল খিফা নামক গ্রন্থে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে।

বিশেষ করে 'ইজালাতুল খিফা' গ্রন্থে তিনি হাদীসের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, ইসলামী খিলাফত ও রাজতন্ত্র দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। অতঃপর একদিকে রাজতন্ত্র এবং সেই সব বিপর্যয়কে স্থাপন করেন যেগুলি ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে রাজতন্ত্রের পথে মুসলমানদের সামষ্টিক জীবনে অনুপ্রবেশ করে এবং অন্যদিকে ইসলামী খিলাফতের বৈশিষ্ট্য ও কল্যাণকর দিকগুলো তুলে ধরেন।

চার ঃ সংস্কার প্রচেষ্টা হযতর শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ)-এর চেয়ে উন্নত সংস্কারমূলক কার্যাবলীকে আমরা প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত করতে পারি। যথা- ১. পর্যালোচনা ও সংশোধন এবং ২. চিন্তার পুনর্গঠন। প্রথমতঃ হযরত শাহসাহেব একজন বিজ্ঞ পর্যালোচকের দৃষ্টি নিয়ে মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাস, শিক্ষা, চরিত্র, তমদ্দুন ও রাজনীতিতে সংমিশ্রিত সকল প্রকার জাহেলিয়াতের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করেন। অতঃপর গলদ বা ভুলের স্তূপের মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে তিনি এ কথা জানার চেষ্টা করেন যে, এর মধ্যে মৌলিক ভুল কোনগুলো যেখান থেকে সকল ভুলের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। অবশেষে তিনি দু'টি বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। একটি হলো- খিলাফত থেকে রাজতন্ত্রের দিকে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের গতি পরিবর্তন এবং অন্যটি হলো- ইজতিহাদের প্রাণশক্তির মৃত্যু ও মন-মস্তিষ্কের উপর অন্ধ অনুসারীর বিপুল আধিপত্য।

প্রথম ভুলটি সম্পর্কে তিনি তাঁর ইযালাতুল খিফা নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেন। খিলাফত ও রাজতন্ত্রের নীতিগত ও পারিভাষিক পার্থক্যকে তিনি যেমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং হাদীসের সাহায্যে যেভাবে তার ব্যাখ্যা করেন তাঁর পূর্বেকার লেখকদের রচনায় এর দৃষ্টান্ত বিরল। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) ইজতেহাদের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি গ্রন্থেই বিভিন্নভাবে গবেষণা অনুসন্ধান করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন ঃ ইজতিহাদ প্রতি যুগে ফরজে কেফায়া। এখানে ইজতিহাদ অর্থ হলো শরীয়তের বিধানাবলী সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান অর্জন এবং তাদের বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিষয়ের ব্যাখ্যা অনুধাবন করে শরীয়তের

আইন-কানুনকে যথাযথভাবে সংযোজন ও সংগঠন করা তা কোন বিশেষ মযহাব প্রণেতার অনুসারীও হতে পারে। আর ইজতিহাদ প্রতি যুগে ফরজে কেফায়া হবার যে কথা বলেছি তা এজন্যে যে, প্রতি যুগে অসংখ্য স্বতন্ত্র সমস্যার সৃষ্টি হয়। সেগুলো সম্পর্কে খোদার নির্দেশ জানা ওয়ায়েজ হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে ইজতিহাদ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) শুধু ইজতিহাদের ওপর জোর দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং তিনি বিস্তারিতভাবে ইজতিহাদের নিয়মনীতি, সংবিধান ও শর্তাবলী বর্ণনা করেছেন। ইজালাতুল খিফা, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, আকদুল জীদ, ইনসাফ, বদূরে বাজিগাহ, মুসাফ্ফা প্রভৃতি গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

সুতরাং তাঁর রচিত এই গ্রন্থগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে ইজতিহাদ বা গবেষণার নিয়ম-নীতি সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান লাভ করা যায়।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) সংশোধনের দৃষ্টি নিয়ে ইসলামী সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন। তিনি ইসলামের মুসলিম মানদণ্ডে ইতিহাসকে বিচার-বিশ্লেষণ করে মুসলমানদের দোষ-ক্রটিগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। ১২৮৬ হিজরীতে বেরেলী হতে প্রকাশিত তাঁর ইজালাতুল খাফা গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১২২ পৃষ্ঠা থেকে ১৫৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তিনি ধারাবাহিকভাবে মুসলিম ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ঐতিহাসিক পর্যালোচনার পর হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) সমকালীন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন এবং নাম উল্লেখ করে প্রত্যেক শ্রেণীর লোকদের দোষ-ক্রটি বিবৃত করেন। তিনি তাঁর তাফহীমাত গ্রন্থে একস্থানে লিখেন ঃ কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছাড়াই যেসব পীরজাদা বাপ-দাদার গদীনশীল হয়েছে, তাদের আমি বলি ঃ তোমরা কেন এইসব পৃথক পৃথক দল গঠন করে রেখেছো? তোমাদের প্রত্যেকেই নিজের পথে চলছো কেন? আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওপর যে পথটি অবতীর্ণ করেছিলেন সেটি পরিত্যাগ করছো কেন? তোমরা প্রত্যেকে এক একজন ইমামে পরিণত হয়েছো। মানুষকে নিজেদের দিকে আহ্বান জানাচ্ছো। নিজেদেরকে হেদায়েতকারী ও হেদায়েতদানকারী মনে করছো। অথচ তুমি নিজে পথভ্রষ্ট এবং মানুষকেও পথভ্রষ্ট করছো। পার্থিব স্বার্থের খাতিরে জ্ঞান অর্জন করে অথবা মানুষকে নিজেদের দিকে আহ্বান করে তাদের দ্বারা নিজেদের পার্থিব কামনা চরিতার্থ করে, তাদের প্রতিও আল্লাহ সন্তুষ্ট নন। তারা সবাই দস্যু, দাজ্জাল, মিথ্যুক প্রবঞ্চক ও প্রবঞ্চিত।'

নিজেদেরকে উলামা আখ্যাদানকারী স্বঘোষিত ও তথাকথিত হযরতুল আল্লামা এবং ভণ্ড ও নির্বোধ মওলবীদের সম্পর্কে শাহসাহেব (রহঃ) বলেন ঃ নির্বোধের দল! তোমরা গ্রীকদের বিদ্যা ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রের গোলক ধাঁধায় আটকে

পড়েছো আর মনে করছো যে, বিদ্যাবুদ্ধি এগুলোর নাম। অথচ বিদ্যা আল্লাহর কিতাবের সুস্পষ্ট আয়াতে অথবা তাঁর রসূলের মাধ্যমে প্রমাণিত সুন্নতের মধ্যে নিহিত।"

ওয়াজ নছিহতকারী আবেদ ও খানকাহবাসীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন ঃ 'হে তাকওয়া ও পরহেজগারীর দাবীদারগণ, তোমরা যত্রতত্র ছুটে বেড়াচ্ছো এবং ভালো-মন্দ সবকিছু হস্তগত করছো। তোমরা মানুষকে মিথ্যা ও মনগড়া বিষয়ের দিকে আহ্বান করেছো। তোমরা আল্লাহর বান্দাদের জীবনের পরিধি সংকীর্ণ করে দিয়েছো। অথচ তোমরা সংকীর্ণতা নয় ব্যাপকতার জন্য আদিষ্ট ছিলে।

মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক তথা আমীর ওমরাহগণকে উদ্দেশ্য করে তাঁর তাফহিমায়ে ইলাহিয়া গ্রন্থে বলেন ঃ তোমাদের কি আল্লাহর ভয় নাই? তোমরা ধ্বংসশীল আরাম আয়েশের সন্ধানে লিপ্ত হয়ে সাধারণ মানুষকে পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত হবার জন্যে ব্যাপক সুযোগ দান করছো। প্রকাশ্যে শরাব পান করা হচ্ছে অথচ তোমরা বাধা দিচ্ছো না। প্রকাশ্যে ব্যভিচার শরাব পান ও জুয়া খেলার অড্ডা চালু আছে অথচ তোমরা এইগুলি বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা করছ না। এ বিরাট দেশে সুদীর্ঘকাল থেকে শরীয়তের আইন অনুযায়ী কাউকে শাস্তি দেয়া হয়নি।

তোমরা যাকে দুর্বল মনে কর, তাকে খেয়ে ফেলো আর যাকে শক্তিশালী মনে কর তাকে ছেড়ে দাও। নানা রকম খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ, স্ত্রীদের মান-অভিমান এবং গৃহ ও বস্ত্রের বিলাসিতার মধ্যেই তোমরা ডুবে গিয়েছো। একবারও আল্লাহর কথা স্মরণ করো না।

সেনাবাহিনীর লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে জিহাদ করার জন্যে হকের কালেমা বুলন্দ করার জন্য এবং শির্ক ও মুশরিকদের শক্তি নাশ করার জন্যে সৈন্যে পরিণত করেছিলেন। এ কর্তব্য উপেক্ষা করে তোমরা অস্ত্রসজ্জা করাকেই নিজেদের পেশায় পরিণত করেছো। বর্তমানে জিহাদের নিয়ত ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই। অর্থ উপার্জন করার জন্যে তোমরা ভাং ও শরাব পান করো, মানুষের উপর জুলুম-নির্যাতন চালাও। তোমাদের মধ্যে হালাল-হারাম রুজির পার্থক্য ঘুচে গেছে। আল্লাহর কসম, একদিন তোমাদেরকে এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে, তারপর তোমরা কি কাজ করে এসেছো, সে সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদেরকে অবগত করবেন।'

শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন ঃ বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী তোমাদের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। নিজের প্রতিপালকের বন্দেগী থেকে তোমরা গাফেল হয়ে গিয়েছো এবং আল্লাহর সাথে শির্কে লিপ্ত হয়েছো। তোমরা গায়রুল্লাহর জন্যে কুরবানী করো এবং মাদার সাহেব ও সালার সাহেবের কবরে গিয়ে হজ্জ সম্পাদন করো। এগুলি তোমাদের নিকৃষ্টতম কাজ।

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির অবস্থা কিছুটা সচ্ছল হয়, সে নিজের খানাপিনা ও পোশাক-পরিচ্ছদের উপর এতবেশি খরচ করে যে তার আয় তার জন্যে যথেষ্ট হয় না। তখন পরিবার-পরিজনের অধিকার গ্রাস করে অথবা শরাব পান ও বারবণিতার মধ্যে নিজের ইহকাল ও পরকাল উভয়টাই নষ্ট করে।

মুসলমানদের দল উপদলকে সমষ্টিগতভাবে সম্বোধন করে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) বলেন ঃ হে বনি আদম! তোমরা নিজেদের চরিত্র ধ্বংস করে দিয়েছো। তোমরা সংকীর্ণমনতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছো। শয়তান তোমাদের সংরক্ষকে পরিণত হয়েছে। তোমাদের পুরুষরা নারীদেরকে লাঞ্ছিত ও পদদলিত করে রেখেছে। হালাল তোমাদের মুখে বিস্বাদ ঠেকছে। তোমরা এমন সর্বনিকৃষ্ট রসম-রেওয়াজের অনুসারী হয়েছো, যার ফলে দীন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যেমন আশুরার দিন তোমরা একত্রিত হয়ে কুকর্মে লিপ্ত হও। একটি দল ঐদিনটিতে মাতমের দিনে পরিণত করেছে। তোমরা কি জান না যে, সকল দিনের মালিক আল্লাহ এবং সকল দুর্ঘটনা তাঁরই ইচ্ছায় সংঘটিত হয়? হযরত হোসাইন (রাঃ) কে যদি ঐদিন শহীদ করা হয়ে থাকে তাহলে এমন কোনদিন আছে যেদিন আল্লাহর কোন প্রিয়তম বান্দার মৃত্যু সংঘটিত হয়নি? কিছুলোক ঐদিনটিকে খেলার দিনে পরিণত করেছে। এইভাবে তোমরা মৃত্যু ও দুঃখকে ঈদে পরিণত করেছো। অতঃপর শবে বরাতের দিন তোমরা মূর্খ জাতিদের ন্যায় খেলাধুলায় মত্ত হও। তোমাদের একটি দল মনে করে যে, এদিন মুর্দাদের নিকট বেশি করে খাদ্য পাঠানো উচিত— যদি তোমাদের এ ধারণা ও কার্যের সমর্থনে কোন দলিল পেশ কর।

আবার তোমরা এমন সব রসমও বানিয়ে রেখেছো যার ফলে তোমাদের জীবনধারা সংকীর্ণতর হয়ে আসছে। যেমন- বিবাহে অমিতব্যয়িতা, বিধবা মেয়েদেরকে অবিবাহিত বসিয়ে রাখা। এই ধরনের রসম-রেওয়াজের পেছনে তোমরা নিজেদের জীবন ও সম্পদ নষ্ট করেছো। তোমরা সত্য ও সুন্দর হেদায়েতকে পরিত্যাগ করেছো। অথচ এই রসম-রেওয়াজসমূহ বর্জন করে তোমাদেরকে এমন পথে চলা উচিত ছিল, যে পথ কঠিন নয় বরং সহজ। তোমরা নামাজ পড়ার সময় পাও না। অনেকে বিলাসিতা ও খোশগল্পের মধ্যে এতবেশি মশগুল থাকে যে, নামাজের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়। তোমরা যাকাত থেকে গাফেল হয়ে গেছো।

সংস্কারের উদ্দেশে হযরত শাহসাহেব তাঁর তাফহীমাতে ইলাহিয়া গ্রন্থের এক স্থানে বলেন ঃ যারা মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্যে আজমীর অথবা সালারে মাসউদের কবরে বা এই ধরনের অন্যান্য স্থানে যায় তারা এতবড় গোনাহ করে যে, হত্যা ও জিনাহর গোনাহ তার তুলনায় কিছুই নয়। এর মধ্যে আর নিজের মনগড়া মাবুদের

মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? যারা 'লাত' ও 'উজ্জার' নিকট প্রার্থনা করতো, তাদের কাজ এদের কাজ থেকে কোনদিক দিয়ে পৃথক? হ্যাঁ, অবশ্য এতটুকুন পার্থক্য আছে যে, তাদের তুলনায় এদেরকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কাফের বলতে দ্বিধা করি। কেননা, এদের এই বিশেষ ব্যাপারে নবী করীমের সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন মৃত্যুকে জীবিত গণ্য করে তার নিকট মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্যে প্রার্থনা করে নীতিগতভাবে তার দিল গোনাহে লিপ্ত হয়।'

শাহসাহেব (রহঃ) তাঁর তাফহীমাতে ইলাহিয়ার দ্বিতীয় খণ্ডের ১৩৪-৩৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ 'হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ নবী করীম (সাঃ) বলেন যে, তোমরাও অবশেষে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের (ইহুদী-খৃষ্টান) পদ্ধতি অবলম্বন করবে। তারা যেখানে যেখানে পা রেখেছিল তোমরাও ঠিক সেখানে পা রাখবে। এমনকি তারা যদি কোনো গো-সাপের গর্তে হাত ঢুকিয়ে থাকে তাহলে তোমরাও সেখানে হাত ঢুকাবে।'

আল্লাহর রসূল (সাঃ) ঠিকই বলেছেন, আমরা এই চর্মচক্ষে সেসব দুর্বল ঈমানের অধিকারী মুসলমানদেরকে প্রত্যক্ষ করেছি যারা সৎ লোকদেরকে খোদার পরিবর্তে মাবুদে পরিণত করেছে এবং ইহুদী ও ঈসায়ীদের ন্যায় নিজেদের অলি-আউলিয়ার কবরসমূহকে সিজদা করছে। আমরা এমন লোকও দেখেছি যারা নবী (সাঃ) মুখনিঃসৃত বলে দাবী করেন যে, নেক লোকেরা আমার জন্যে।' এটি ঠিক ইহুদীদের– 'আমাদের কখনও দোযখে প্রবেশ করানো হবে না, আর হলেও মাত্র কয়েক দিনের জন্যে' এ কথাটির মতো। সত্য বলতে কি আজকাল প্রত্যেকটি দলের মধ্যে দীনকে বিকৃত করার প্রবণতা বিস্তার লাভ করা হয়েছে। একশ্রেণীর সুফী বা ভণ্ডদের অবস্থা দেখো তাদের মধ্যে এমন সব কথার অবাধ প্রচলন দেখা যাচ্ছে যা কোরআন ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়, বিশেষ করে তৌহিদের প্রশ্নে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তারা শরীয়তের কোন পরোয়া করেন না।

বস্তুতঃ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) কত গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে মুসলমানদের অতীত ও বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করেছিলেন এবং সংশোধনের চাবুক মেরে মেরে অধঃপতিত মুসলমানদের ঘুমন্ত বিবেককে জাগ্রত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) কর্তৃক এই ধরনের সমালোচনার ফলে সমাজের বিবেকবান লোকদের মাঝে এক বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতির অবনতির অনুভূতি তাদের চিত্তকে অস্থির করে তোলে। তাদের ইসলামী অনুভূতি তীব্রতর হয় এবং নিজেদের চতুষ্পার্শ্বের জীবনধারায় জাহেলিয়াতে প্রত্যেকটি চিহ্ন তাদের চোখে কাঁটার মতো বিঁধে। জীবনের প্রত্যেক অংশে তারা ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মিশ্রণ বিশ্লেষণ করতে তৎপর হয়। তাদের ঈমানী শক্তি এমনভাবে জেগে ওঠে যে, জাহেলিয়াতের

কাঁটাবনের প্রত্যেকটি কাঁটা তাদেরকে সংস্কার ও সংশোধনের জন্যে অস্থির করে তোলে। এই প্রেক্ষিতে পুরাতন ঘুণেধরা জীর্ণ সমাজ ব্যবস্থাকে আধুনিক ছাঁচে পুনর্গঠনের জন্যে হযরত শাহ্সাহেব দেহলবী (রহঃ) একজন মুজাদ্দিদ হিসেবে তাঁর গঠনমূলক কর্মসূচী পেশ করেন। তিনি তাঁর সংস্কার ও গঠনমূলক কর্মসূচী আরম্ভ করেছিলেন মহানবী (সাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত ইসলামী আন্দোলনের আদর্শকে সামনে রেখেই। তিনি তাসাউফের বায়াতকে তাঁর সংস্কার আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অন্যকথায় তাসাউফের বায়াত গ্রহণের অর্থ ছিল তাঁর নিকট সংস্কার মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ। এ কারণেই রাজনীতিতে ও তাসাউফ দর্শনকে তিনি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কথা হলো এই যে, প্রকৃত যোগ্যতার অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত শুধুমাত্র অস্ত্রের সাহায্যে কেউ হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। অস্ত্রবলে হয়তো হুকুমত উচ্ছেদ করা যেতে পারে কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষিত লোকের সংস্থান না হওয়া পর্যন্ত নতুন সরকার টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না এবং কোন আদর্শিক কর্মসূচীও বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় না।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) এটা উপলব্ধি করেন যে, চিন্তার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আদর্শিক বিপ্লবকে সফল করে তোলার জন্যে যে সুনিশ্চিত জনশক্তির প্রয়োজন কেবলমাত্র শান্তি ও নিরুপদ্রবতার মধ্যেই তা গঠন করা সহজ হতে পারে। আন্দোলনের কর্মসূচী পেশ করে তা লোককে বুঝানো এবং তাদের মত গঠন করার জন্যে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীর আশ্রয় নেয়া প্রয়োজন হয়। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) তাঁর রচিত তাফহীমাতে ইলাহিয়া গ্রন্থের একস্থানে এ সম্পর্কে কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, স্থান কালের উপযোগী হলে তিনি যুদ্ধ করেও কার্যতঃ সংশোধন করার যোগ্যতা রাখতেন। তিনি বলেন ঃ যদি এ যুগে যুদ্ধ করে মানুষের সংশোধন সম্ভব হতো এবং এ জন্যে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণও লাভ করা যেতো, তাহলে এ ব্যক্তি দস্তুরমত যুদ্ধ করতো। তবে জাহেলিয়াতের মোকাবেলায় সশস্ত্র যুদ্ধ করে ইসলামী ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রাখার জন্যে তিনি মুসলিম রাজশক্তির সহযোগিতা গ্রহণে কুণ্ঠিত হননি। এ উদ্দেশ্যেই মৃত্যুর মাত্র দু'বছর আগে তিনি আহমদ শাহ আবদালীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শক্তিকে পর্যুদস্ত করেছিলেন।

১৭৪৩ খৃষ্টাব্দ থেকে 'ফতহুর রহমান' যে তরজমা তিনি পাঠ্য তালিকাভুক্ত করেছিলেন, তার টীকায় তিনি তাঁর সংস্কার আন্দোলনের মূলনীতিগুলো আলোচনা করেছেন। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) ছিলেন একজন আলিফ সুফী। তিনি সামাজিক অবক্ষয়রোধের জন্যে যে পন্থা নির্দেশ করেন তৎকালীন অবস্থায় তাকে

নির্দ্বিধায় এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ বলা যায়। কোরআনের ব্যবহারিক মূল্য প্রদর্শন এবং অর্থনৈতিক সমতাবিধান এ দুটিই ছিল তাঁর প্রস্তাবিত সংস্কারমূলক কর্মসূচীর মূল বুনিয়াদ। তিনি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্যের অভাবকে সমাজে, রাষ্ট্রে এবং জাতীয় জীবনে নৈতিক ও ব্যবহারিক বিকৃতি বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার কারণ হিসেবে নির্দেশ করেছিলেন। তিনি তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় উল্লেখ করেন যে, কোন শাসকগোষ্ঠী যদি ভোগ-বিলাস আরাম-আয়েশ এবং ঐশ্বর্যের মোহে আচ্ছন্ন জীবনকেই বেছে নেয়, তাহলে সেই আয়েশী জীবনের বোঝা মজদুর-শ্রমিক শ্রেণীর উপরেই চাপায়, ফলে সমাজের অধিকাংশই মানবেতর পশুর জীবন-যাপনে বাধ্য হয়।

গোটা সমাজ জীবনের নৈতিক কাঠামো তখনই বিপর্যস্ত হয়- যখন তাকে অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে জীবন যাপনে বাধ্য করা হয়। তখন লোককে রুটি-রুজির জন্যে ঠিক পশুর মতই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। মানবতার এ চরম নির্যাতন এবং অর্থনৈতিক দুর্যোগের মুহূর্তে এ অভিশাপ থেকে মুক্তি দেবার জন্যে আল্লাহ কর্তৃক নিশ্চয়ই কোন পথের নির্দেশ এসে থাকে। অর্থাৎ স্রষ্টা নিজেই বিপ্লবের আয়োজন করেন। জনগণের বুকের উপর থেকে বেআইনী শাসকচক্রের জগদ্দল পাথর অপসারিত করার ব্যবস্থা তিনি করেন।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিধান একান্ত জরুরী। প্রত্যেকটি মানবগোষ্ঠীর জন্যে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজন মিটে যায়। জীবিকা সংস্থানের দুশ্চিন্তা থেকে অবকাশ লাভের পরেই কেবল মানুষ নীতি আদর্শ প্রভৃতি জীবনের অন্যান্য দিকের উন্নতির প্রতি মনযোগ দিতে পারে। আসলে প্রকৃতপক্ষে এসবই হচ্ছে মানবতার মূল সম্পদ। কিন্তু মানুষ যদি বেঁচে থাকার জন্যে ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থাই করতে না পারে, মানুষের জীবন যাত্রার সামনে যদি পশুর জীবন স্তব্ধ হয়ে যায় তাহলে মানব জীবনের মহত্ত্বর লক্ষ্যের কথা ভাবার মতো জ্ঞান কেমন করে এবং কখন আসবে? কাজেই মানব সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল ও সুষম হলেই শুধু নৈতিক জীবনকে সুস্থ ও পূর্ণ করতে পারলে পারলৌকিক জীবনেও কবর এবং হাশরের সংকট সমস্যাগুলি সহজ হয়ে যায়। চরিত্রের এ পূর্ণতাই তাকে বেহেশতেরও অধিকারী করে।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) চারটি মৌলিক শিক্ষাকে ইহলৌকিক পারলৌকিক জীবনের মুক্তির অবলম্বন বলে সাব্যস্ত করেছেন। যথা ঃ (ক) পবিত্রতা (খ) আল্লাহর সমীপে বিষয় ও ভীতির, (গ) সংযম ও (ঘ) ন্যায়নিষ্ঠা। উপরোক্ত চারটি বিষয়ের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠাই হচ্ছে কেন্দ্রীয় বিন্দু। তিনি বলেন- 'শ্রমজীবীদের

উপর থেকে অত্যধিক চাপ রহিত করার যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন ব্যতীত সমাজের বুকে ন্যায় ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রোম এবং পারস্য সাম্রাজ্যের শোষণ ব্যবস্থা সভ্য দুনিয়ার এই বৃহৎ অংশকে অর্থনৈতিক শোষণ দ্বারা জর্জরিত করে তুলেছিল। ফলে সর্বত্র নৈতিক অধঃপতন নেমে এসেছিল। ইসলামের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল রোম এবং পারস্য সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে নিপীড়িত জগৎকে মুক্তি দেয়া।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহর (রহঃ) এর এই উক্তির এক শতাব্দীরও অধিককাল পরে ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক কুম্যুনিস্ট সম্মেলনে কার্ল মার্কস তাঁর অর্থনৈতিক কর্মসূচী পেশ করেন। অতএব, কার্ল মার্কস-এর বহু পূর্বেই হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ)-এর বিপ্লবী চিন্তাধারা ও কর্মসূচী উপস্থাপিত হয়েছে।

বাদশাহ হারুন রশীদের চেষ্টায় ইউনানী ফালসাফা আরবীতে অনুবাদ করা হয়। তারপর আরবী থেকে ফারসী ভাষায়। শাহসাহেব অনুভব করলেন যে, ফালসাফা ও ইলুমে আক্বলীয়ার (যুক্তিশাস্ত্র) দিকে মুসলমানগণ ধাবিত হয়ে গেছে এবং ঐসব অর্থহীন ফালসাফা ও মান্তিক শাস্ত্রে সময়ের অপচয় করছে। যা মুসলমানদের কর্মজীবনে কোন প্রকার সহায়ক হয় না, অথচ একে ইসলামী তত্ত্বদর্শন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাই বিতর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করার নিমিত্তে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় সামাজিক এবং ধর্মীয় বিষয়াদির এমন বিজ্ঞানসম্মত সূক্ষ্মবিশ্লেষণ দেন এবং এমন তত্ত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেন, যা তাদের জন্য কল্যাণকর ও মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। তাঁর লিখিত গ্রন্থাদির সংখ্যা ৫০ এর অধিক। সে সব গ্রন্থে তাঁর ইসলামী ধর্মতত্ত্বে যেমন গভীর জ্ঞানের পরিচয় মিলে, তেমনি তাঁর মৌলিক চিন্তাশক্তি পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও অকাট্য যুক্তি সকলকে মুগ্ধ করে। তাঁর রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতিতে অগাধ পাণ্ডিত্য ও অসামান্য বাস্তব জ্ঞান সকলকে মুখরিত করে। তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। এই গ্রন্থই শাহসাহেবকে মেকিয়াভেলী, ভিকো প্রমুখ প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য রাষ্ট্র ও সমাজ বিজ্ঞানীদের বহু উর্ধ্বে জ্ঞান করে। তাঁকে অমর ঐতিহাসিকরা সমাজ বিজ্ঞানী ইবনে খালদুনের উত্তরাধিকারী, ইমাম ইবনে রুশদ, হাফেজ ইবনে তাইতিমা এবং দার্শনিক গাজ্জালীর প্রকৃত স্থলাভিষিক্ত বলা যায়। তাঁকে যদি ধর্ম-তাত্ত্বিক দার্শনিকদের শেষ প্রতিনিধি বলা হয়, তবে অত্যুক্তি হবে না।

শাহসাহেবের আমলে শিয়াদের প্রাধান্য ছিল। তারা শাহী দরবারসমূহে বিচরণ করত। যার কারণে তারা যেমন শিয়া মাহযাব প্রচারের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল

তেমনি সুন্নীদের হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পেত। নানাভাবে তারা সুন্নী উলামাগণকে আঘাত করত। সুযোগ-সুবিধামত অস্ত্রাঘাত করতেও দ্বিধাবোধ করত না। শাহসাহেব শিয়া-সুন্নী ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ এড়ানোর জন্যে যথাযথ পন্থা অবলম্বন করেন। তাকবীর ও তাহরীরে তথা বক্তৃতা ও লিখনী দ্বারা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের পক্ষে প্রমাণাদি পেশ করতে থাকেন। যুক্তিসঙ্গতভাবে শিয়াদের জবাব দিতে থাকেন। ইযালাতুল খেফা নামক গ্রন্থ এর চমৎকার নিদর্শন।

স্বপ্ন ও মারাঠা দমন ঃ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রহঃ) মক্কা-মদীনায় অবস্থানকালে ইজতিহাদের উপযোগী পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। দীর্ঘকাল অধ্যয়ন গবেষণা এবং বিশেষ করে মক্কা-মদীনা সফরের ফলে লব্ধ প্রেরণাই তাঁকে ইনকিলাবী আন্দোলন শুরু করার জন্যে সজাগ করেছিল। এ বিষয়ে তিনি স্বপ্নযোগেও বহু কিছু জ্ঞাত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। ১৯৩১ খৃস্টাব্দে এক জুম্‌আর রাতে তিনি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্ন দেখেন। তিনি বলেন- ১১৪৪ হিজরীর ২১ শে যিলকদ জুমার রাতে মক্কায় আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, এ যুগে প্রতিষ্ঠিত একটি উপলক্ষরূপে আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে নির্দিষ্ট করেছেন। দেখতে পেলাম, কাফের সর্দারদের দ্বারা মুসলিম নগরীগুলো বিজিত হয়েছে। আজমীরের ন্যায় শহরে কুফরী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি আমার প্রতি ক্রোধের রূপ পরিগ্রহ করলো। ক্রোধ যেন সংগ্রামের রূপ নিয়ে আমার চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করলো- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে এখন কি করা যেতে পারে? আমি উত্তর দিলাম- সব অবাঞ্ছিত সরকার ভেঙ্গে দাও। এরপরে সমবেত লোকদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। আমার পশ্চাতে পশ্চাতে অসংখ্য লোক শহরগুলোকে একটার পর একটা ধ্বংস করতে করতে আজমীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। দেখলাম তারা যেন কাফের সর্দারকে হত্যা করে ফেলেছে এবং তার কণ্ঠ শিরা দিয়ে প্রবল বেগে রক্ত বেরুচ্ছে। (ফয়জুল হারামাইন)

এ স্বপ্নের তাৎপর্য সম্বন্ধে চিন্তা করলে এই মনে হয় যে, ক্রমবর্ধমান মারাঠা শক্তি দমন করার দিকেই এর নির্দেশ রয়েছে এবং শাহ্ ওয়ালী উল্লাহই হবেন তার মাধ্যম। শাহ ওয়ালী উল্লাহ কর্তৃক ঐ স্বপ্ন দেখার মাত্র দু'বছর পরেই বাজীরাও উত্তর ভারত আক্রমণ করেন (১৭৩৩ খৃঃ)। অপরদিকে ১৭৩৯ খৃস্টাব্দে নাদির শাহের অভিযানের ফলে দিল্লীতে হাজার হাজার লোক নিহত হয় এবং মুঘল শাসন ব্যবস্থা দুর্বলতর হয়ে পড়ে। রাজধানী দিল্লীতে মারাঠাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায়, মারাঠা শক্তির হাত থেকে মুসলিম রাজশক্তিকে রক্ষার

জন্যে শাহ্ আবদালীকে আমন্ত্রণ জানান। (শাহ ওয়ালী উল্লাহ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী)

আহমদ শাহ আবদালী ১৭৬১ খৃস্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। আহমদ শাহ্ আবদালীর এই বিজয় দিল্লীর রাজনৈতিক আকাশকে ক্রমবর্ধমান মারাঠা আগ্রাসনের হাত থেকে মুক্ত করেছিল। এভাবে দিল্লীর মসনদকে নিষ্কণ্টক করে শাহ সাহেব ৩০ বছর পূর্বে মক্কায় অবস্থানকালে দেখা তাঁর ঐ স্বপ্নটিকে সফলরূপ দিয়ে তাঁর পরিকল্পনার এক অংশ বাস্তবায়িত করেছ্হিলেন। এই ঘটনার ঠিক দু'বছর পর ১৭৬৩ খৃস্টাব্দে শাহ ওয়ালী উল্লাহ ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের ৩০ বছর আগে তিনি মক্কা-মদীনা থেকে সংস্কার বিপ্লব শুরু করার দৃঢ় ধারণা নিয়েই দেশে ফিরেছিলেন।

বলাবাহুল্য যে, হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রহঃ)-এর যে আমন্ত্রণ পত্রটি পেয়ে আহমদ শাহ আবদালী ১৭৬১ খৃস্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শক্তিকে পর্যুদস্ত করে মুসলিম রাজশক্তিকে আরও কিছুকালের জন্যে টিকিয়ে রেখেছিলেন, সে সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থেই আলোকপাত করা হয়েছে। এভাবে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রহঃ) তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তেও উপমহাদেশের মুসলিম শাসনের পতন রোধ করার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। উপরন্তু, একটি ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার মহান উদ্দেশ্যে মৃত্যুর পূর্বে তিনি এমন এক জিহাদী আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন এই উপমহাদেশের ইসলামের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ।

পরিশিষ্ট ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতবর্ষে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ গঠনের জন্যে তিনি মুসলমানদেরকে জিহাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেন। ১৭৬৩ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র শাহ আব্দুল আজীজ (রহঃ) উক্ত জিহাদী আন্দোলনের Pragmltic structure প্রদান করেন যার বাস্তব রূপ আমরা দেখতে পাই শাহ আব্দুল আজীজের উত্তরসূরি রায় বেরেলীর সৈয়দ আহমদ শহীদের (রহঃ) নেতৃত্বে পরিচালিত তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের মধ্যে। এই আন্দোলনের চত্বরে পশ্চিমবঙ্গে তিতুমীরের নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন, পাটনার মাওলানা এনায়েত আলীর নেতৃত্বে আহলে হাদীস আন্দোলন, পূর্ববঙ্গে হাজী শরীয়তুল্লাহর নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন, মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর নেতৃত্বে আন্দোলন, শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান কর্তৃক রেশমী রুমাল আন্দোলন প্রভৃতি আরও যে সব ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের সূচনা হয় তার সবকটি আন্দোলনই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রহঃ)

এর চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত। এমন কি রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে হিন্দুধর্মের সংস্কার আন্দোলনটিও হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রহঃ)-এর বিপ্লবী চিন্তাধারার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। অনুরূপভাবে বলা যায় শাহ সাহেবের চিন্তাধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত বালাকোটের যুদ্ধ, বাঁশের কেল্লা যুদ্ধ, শামিলী যুদ্ধে বিপর্যয়ের মাঝ দিয়ে সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে ঐ আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি। শাহাদতের পুণ্যরক্তে তা আরো সজীব হয়ে ওঠে।

মাওলানা ইসমাইল শহীদ (রহঃ), সাইয়্যিদ আহমদ বেরেলবী (রহঃ), মাওলানা কাসিম নানুতুবী, মাওলানা আব্দুল হাই লৌখনভী, শাহ আব্দুল গনি মুজাদ্দিদী, মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী, শায়খুলহিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী, হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ), শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানী (রহঃ) প্রমুখের দ্বারা উপমহাদেশীয় মুসলিম সমাজ থেকে বেদআত ও রসুমাত দূরীভূত করার যে সুদূরপ্রসারী কাজ চলে এবং আগামীতে চলবে, মূলতঃ তা শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ)-এর বপনকৃত বীজের সুজলা শস্য-শ্যামলা সোনালী ক্ষেত। আমাদের বর্তমান ধর্মবিশ্বাস, রীতিনীতি, সংস্কার প্রচেষ্টা ও শিক্ষার আদর্শ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এসবের মূলে রয়েছে শাহ ওয়ালী উল্লাহর বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রভাব ও অনুপ্রেরণা।

বর্তমান সমাজে যদি আমরা শাহ ওয়ালী উল্লাহর চিন্তাধারাকে বাস্তবে বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ সর্বপ্রকার কুসংস্কার দূর হয়ে যাবে, আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে, শান্তির ধারা প্রবাহিত হবে।

আসুন পাঠক মণ্ডলী! আমরা শাহ ওয়ালী উল্লাহর চিন্তাধারাকে বাস্তবে বাস্তবায়ন করি। রাসূলের আদর্শ বাস্তবায়ন করি ও রাসূলের আদর্শে আদর্শবান হয়ে যাই।

উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক রক্তাক্ত অধ্যায় ঃ মালাবারের মোপালা বিদ্রোহ

মানব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য একটি অধ্যায় হচ্ছে কয়েকটি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক এশিয়া ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম এবং প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী দানবীয় শোষণ ও নির্যাতন। বাহ্যতঃ মানবাকৃতি বিশিষ্ট হলেও পাশ্চাত্যের শ্বেতাঙ্গ খৃস্টান এবং ওদের লেজধরা ইহুদী কুসীদজীবীরা যে কত বড় জালেম চরিত্রের অসুর হতে পারে, ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট অঞ্চলগুলোতে ওদের নির্যাতনের ইতিহাস একটু পর্যালোচনা করলেই তা স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে যে, প্রাচ্যে উপনিবেশ স্থাপনের অভিযান ছিল মূলতঃ পাশ্চাত্যের শ্বেতাঙ্গ খৃস্টানদের এক ধরনের ধর্মীয় উন্মাদনা (ক্রুসেড) এবং লুণ্ঠন মনস্কতারই নগ্ন বহিঃপ্রকাশ।

এশিয়া এবং আফ্রিকার যে অঞ্চলগুলোতে পাশ্চাত্যের নব উত্থিত শক্তিগুলো একের পর এক ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করেছিল, সে অঞ্চলগুলো ছিল প্রধানতঃ মুসলিম শাসনাধীন। এসব এলাকার কোথাও এরা বণিকের বেশে, কোথাও শিক্ষা-সংস্কৃতি বা প্রযুক্তিগত বিদ্যাদানের ছদ্মাবরণে এসে আস্তানা স্থাপন করতে শুরু করেছিল। প্রথমে এরা বিভিন্ন অমুসলিম জনগোষ্ঠীকে শাসক মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করতে থাকে। মুসলমানদের মধ্যেও নানা ফেরকার পৃষ্ঠপোষকতা করে মুসলিম উম্মাহর মূল প্রাণশক্তি বিনষ্ট করে দেয়। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অনুকূলে আসার পর মোক্ষম আঘাতটি করে মুসলমানদের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়।

মুসলিম উম্মাহর উপর পাশ্চাত্যের ইহুদী-খৃস্টান শক্তির সর্বাপেক্ষা মারাত্মক আঘাতটি ছিল সুকৌশলে তুরস্কের সুলতানকে প্রথম মহাযুদ্ধে জড়িয়ে ফেলা এবং যুদ্ধ শেষে মুসলিম উম্মাহর মূল শক্তিকেন্দ্র খেলাফত উৎখাত করে ইহুদী-খৃস্টান জগতের দীর্ঘকালের লালিত আকাঙ্ক্ষা ও অব্যাহত ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করা।

উপনিবেশিক শক্তিগুলোর মূল লক্ষ্যই ছিল যেহেতু মুসলিম জনগণকে দ্বীন-ঈমান থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে দেয়া, তাই এদের সবকয়টি আঘাত প্রতিহত করার সংগ্রামে ওলামা-মাশায়েখ এবং দ্বীনদার মুসলমানদেরকেই এগিয়ে আসতে হয়। আর অত্যাচার নির্যাতন ও দীর্ঘমেয়াদী শোষণ-ত্রাসনের শিকার মূলতঃ

এদেরকেই হতে হয়। উপনিবেশিক শাসনের অবসান হওয়ার পরও সেই বঞ্চনা ও উপেক্ষার জের এখনও মুসলিম শাসিত দেশগুলোতে সমানেই চলছে। কিন্তু বিরামহীন অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করার পরও হকপন্থী ওলামা-মাশায়েখগণের ঈমানী চেতনা ও সংকল্পের দৃঢ়তা বিনষ্ট করা সম্ভব হয়নি।

সমাজের মূল চালিকা শক্তি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইসলামী অনুশাসনের প্রতি অনীহ এমন কি ইহুদী-খৃষ্টানদের মতই কোরআন সুন্নাহর বিপরীত বলয়ে অবস্থান গ্রহণের পশ্চাৎভূমি পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে, শত্রুশক্তির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণই এ বিরূপ মানসিকতা সৃষ্টি করেছে। আমাদের এ উপমহাদেশে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয়েছে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওদের খবরদারির অবসান হয়নি। এখনও ওদের রেখে যাওয়া শিক্ষা-সংস্কৃতি মোহজাল ছিন্ন করে আমরা মানবিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারিনি। এখনও পর্যন্ত আমাদের বিদ্যালয়গুলোর পঠন সামগ্রীতে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ পরিপূর্ণরূপে অনুপস্থিত। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে আমাদের রাষ্ট্রকাঠামোর রূপটি কেমন ছিল, কেমন ছিল আমাদের জীবন-জীবিকা ও সামাজিকতা, ইংরেজের দু'শ বছরের শাসন আমাদের জীবন-জীবিকা বা সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে কোন উন্নতি সাধন করেছে, না যা কিছু ছিল তা একেবারে তছনছ করে চিরকালের জন্য পশ্চাদপদতার গহ্বরে ফেলে গেছে, এ সম্পর্কিত পঠন-পাঠন আমাদের উচ্চতর ইতিহাস চর্চা থেকেও সযত্নে সরিয়ে রাখা হয়েছে। তেমনি সতর্কতার সাথে ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে ঔপনিবেশিক আমলে এদেশে সংগঠিত প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস এবং সেসব আন্দোলন দমন করার লক্ষ্যে ইংরেজ শয়তানদের পৈশাচিক অত্যাচার-নির্যাতনের লোমহর্ষক কাহিনীগুলোও। ফলে এই প্রজন্মের অনেকেই জানে না, আমাদের পরাধীনতার এবং এর প্রকৃত স্বরূপটা কেমন ছিল। আমাদের এ অঞ্চলের মুসলিম জনগণ জানে না, আমাদের শ্রদ্ধেয় পূর্ব-পুরুষগণ কত অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেও ঈমান এবং স্বতন্ত্র জাতিত্ববোধের অনুভূতিটুকু হৃদয়-কন্দরে জাগিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দিল্লীর বিপ্লবী মাওলানা শাহ আবদুল আজীজ কর্তৃক ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ফতওয়া প্রদানের মাধ্যমেই আজাদীর সশস্ত্র লড়াইয়ের সূত্রপাত ঘটে। সে আগুনঝরা ফতওয়ার ভিত্তিতেই সৈয়দ আহমদ শহীদ সশস্ত্র জেহাদ আন্দোলন সংগঠন করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বালাকোটের ময়দানে শোচনীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়ার পরও এ আন্দোলনের ধারাবাহিকতাই মাত্র পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের মাথায় সিপাহী বিপ্লবের রূপধারণ করে। শায়খুল-হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসানের রেশমী

রুমাল আন্দোলন তথা আফগানিস্তান ও মধ্যএশিয়ার মুসলমানদের সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করে ঔপনিবেশিক শাসন উৎখাতের দুঃসাহসিক প্রয়াস চলে। বাংলার জমিনে মীর নেসারউদ্দীন তীতুমীরের বাঁশের কেল্লার যুদ্ধ। হাজী শরীয়তুল্লাহর কৃষক বিদ্রোহও একই আন্দোলনের ধারাবকাহিকতার সাথে একই সূত্রে গ্রথিত ছিল।

এসব আন্দোলনে এদেশের কত সোনার ছেলে সম্মুখ সমরে শহীদ হয়েছে, কত বীর মোজাহিদকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে, কত বীর মহান সংগ্রামীকে কালাপানি নামক মরণ দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়েছে, সেসব বিবরণ ইংরেজদের শাসন-নির্যাতনের কবল থেকে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত তথাকথিত ইতিহাসের পণ্ডিতেরা লিপিবদ্ধ করার গরজ অনুভব করেনি। পাশ্চাত্যের পিশাচশক্তির অশীরীরী অপছায়া এখনো এদের মন-মানসিকতা আচ্ছন্ন করে রাখার কারণেই সম্ভবতঃ ওরা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সেই বিভীষিকাময় অধ্যায়টির পাতা উল্টাতে ভয় পায়। তবে আশা করতে দোষ কি যে, একদিন এ দেশের মায়েরা স্বাধীন মনমস্তিস্ক ও মোহমুক্ত অনুভূতিসম্পন্ন সন্তান জন্ম দেবেন এবং জাতীয় মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যবোধে উদ্বুদ্ধ সেই সব স্বাধীন মানুষ পূর্ব-পুরুষদের সেই সব গৌরবের ইতিহাস উদ্ধার করতে সমর্থ হবেন।

ক্রুসেড যুদ্ধের প্রেরণায় উদ্বেলিত পাশ্চাত্যের ইহুদী-খৃষ্টানদের দীর্ঘকালীন স্বপ্ন ছিল মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির প্রতীক খেলাফতের উৎখাত সাধন। উল্লেখ্য যে, খেলাফত ছিল হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গৌরবময় রাজনৈতিক উত্তরাধিকার। দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্র-ধর্মীয় এবং জাতিগত সমস্যাদির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় খেলাফতের প্রতি অনুগত থাকতো। খলীফা ছিলেন মক্কা-মদীনা তথা হারামাইন শরীফাইনের তত্ত্বাবধায়ক বা খাদেম। মুসলিম বিশ্বের সবগুলো মসজিদে খলীফা তথা খাদেমুল-হারামাইন শরীফাইন-এর জন্য বিশেষ দোয়াসম্বলিত খুত্‌বা পাঠ করা হতো। মুসলমানদের আন্তর্জাতিক যে কোন সমস্যার ক্ষেত্রেই “দরবারে খেলাফতের” সিদ্ধান্ত সকলেই শিরোধার্য করে নিতেন। হযরত নবী করীমের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) খলিফা নিযুক্ত হন (৬৩৩ খৃঃ), এরপর থেকে তুর্কী সুলতান আবদুল হামিদ (রহঃ) পর্যন্ত (১৯২৪ খৃঃ)। এই খেলাফতের ধারাবাহিকতা শত ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও অব্যাহত ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্কের শোচনীয় পরাজয়ের পর ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী কামাল আতাতুর্কের হাতে তুরস্কের রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দেয়ার লক্ষ্যে বৃটিশের নেতৃত্বাধীন বিজয়ী জোট ঐকমত্যে উপনীত হয়। শর্ত দেয়া হয় যে, কামার আতাতুর্ক চিরদিনের জন্য খেলাফতের অবসান ঘোষণা করবেন। উল্লেখ্য নিষ্প্রয়োজন যে, এক ইহুদী মায়ের সন্তান

কামাল পাশা ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের শ্লোগান দিয়ে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধতে সমর্থ হয়েছিলেন।

স্বজাতীর গাদ্দার এবং ইহুদী-নাসারা শক্তির গোপন আঁতাতের দ্বারা খেলাফত উৎখাতের ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত হওয়ার খবর প্রচারিত হওয়ার পর মুসলিম বিশ্বের সর্বস্তরের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সর্বাপেক্ষা সুসংগঠিত প্রতিবাদ সংঘটিত হয়েছিল আমাদের এই উপমহাদেশে। এই প্রতিবাদী আন্দোলনের তীব্রতা সর্বাপেক্ষা বেশী অনুভূত হয়েছিল তদানিন্তন বাংলা-বিহারের মুসলিম জনগণের মধ্যে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, অবিভক্ত ভারতের এ দু'টি প্রদেশের অন্যূন পঞ্চাশ হাজার আলেম ও বুদ্ধিজীবী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। রাজপথে আন্দোলন ও বিক্ষোভ সমাবেশে পুলিশ ও গোরা সৈন্যদের গুলীতে নিহতের সংখ্যা তিন সহস্রাধিক ছিল বলে অনুমান করা হয়।

১৯১৯ সনে দিল্লীতে সর্বভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক বিশেষ অধিবেশনে লিখিল ভারত খেলাফত কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনে আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পিত বিজয় উৎসবের সকল আনুষ্ঠানাদি বর্জন এবং প্রতিহত করা হবে। তাছাড়া খেলাফত উৎখাতের ষড়যন্ত্র থেকে বিরত না হলে ভারতীয় মুসলমানগণ শাসক ইংরেজদের সাথে সববিষয়ে অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তুলবে। আলী ভ্রাতৃদ্বয় নামে পরিচিত মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী নিজেদেরকে খেলাফতের জন্য উৎসর্গ করার শপথ ঘোষণা করলেন। এই মহান ভ্রাতৃদ্বয়ের বীরমাতা কলিকাতার এক প্রকাশ্য জনসভায় শপথ বাণী উচ্চারণ করালেন। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পশ্চিমে খাইবার গিরিপথ থেকে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী চট্টলা পর্যন্ত উত্তাল হয়ে উঠলো। অগণিত সংগ্রামী বীর মা বি আম্মা বেগমের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ হাতে স্ব-স্ব সন্তানের বুকে চাঁদ-তারা অঙ্কিত খেলাফতের ব্যাজ পরিয়ে রাস্তায় নামিয়ে দিলেন।

আন্দোলনের উত্তালরূপ প্রত্যক্ষ করে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী সক্রিয়ভাবে খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করলেন। আমেরিকান লেখক স্টিফেন ফ্রেডারিকের ভাষায়, "আলী ভ্রাতৃদ্বয় সূচিত খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সাথে মহাত্মা গান্ধীর আনুষ্ঠানিক যোগদান করার ফলে সর্বভারতীয় পর্যায়ে যে গণঐক্য গড়ে উঠেছিল, তা অব্যাহত রাখা সম্ভব হলে যেমন তুর্কী খেলাফত উৎখাত করা সম্ভব হতো না, তেমনি ইংরেজদের পক্ষেও তাৎক্ষণিকভাবে ভারত ছেড়ে আসা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু এটাই ইতিহাসের বাস্তবতা যে, বৃটিশ কূটনীতি এবং হিন্দু চরমপন্থী শ্রেণীটির অন্ধ মুসলিম বিদ্বেষের কবলে পড়ে এ ভয়াবহ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায়। আর তখন থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম জনগণের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য চিন্তা ও পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দানা বাঁধতে শুরু করে।"

১৯২০ খৃস্টাব্দে ১৯শে মার্চ বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় খেলাফত কমিটির সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধী সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে খেলাফত প্রশ্নে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই আন্দোলনের ফলে এই উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিম তথা সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে গণঐক্যের যে ভিত রচিত হয়েছে, বিগত কয়েকশ' বছরের মধ্যে এমন সুবর্ণ সুযোগ কখনও আসেনি। আগামী শত শত বছরেও এমনটা আশা করা যায় না। [দি মোপালা অফ মালাবার ঃ অক্সফোর্ড]

খেলাফত এবং অসহযোগের ডাকে দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে যে আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে উপমহাদেশীয় মুসলিম ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শায়খ আলী মিস্‌য়ার নামক একজন বিশিষ্ট আলেম। তিনি ছিলেন এক ঐতিহ্যবান আলেম পরিবারের সন্তান। এই পরিবারেরই মখদুম আমীন উদ্দীন নামক এক বুযুর্গ পর্তুগীজ হানাদারদের বিরুদ্ধে জেহাদ সংগঠন করে ওদের উপর্যুপরি হামলা থেকে সমগ্র মালাবার অঞ্চলকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'তোহফাতুল মুজাহেদীন' নামক একটি বিরাট গ্রন্থ উপমহাদেশীয় মুসলমানদের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য একটি দলীলরূপে বিবেচিত হয়।

মালাবারের স্থানীয় ভাষায় মুসলমানদের অভিহিত করা হতো 'মোপালা' নামে। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের ডাকে 'মোপালা'দের অবিসংবাদিত নেতা আলী মিস্‌য়ার খেলাফত আন্দোলনে যোদগান করেন। অল্প কিছুকালের মধ্যেই শায়খ আলীর নেতৃত্বে মোপালী মুসলমানদের আন্দোলন ব্যাপকভিত্তিক জিহাদীরূপ ধারণ করে। স্টিফেন মুসলিম নেতা আলী মিসয়ারের নেতৃত্বাধীন আন্দোলনটি সাময়িক বিদ্রোহ ছিল না, এটি ছিল সৈয়দ আহমদ শহীদের জেহাদ আন্দোলনের অনুরূপ ব্যাপকভিত্তিক সংস্কার আন্দোলন, যা ১৮২০ খৃস্টাব্দে পশ্চিম পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শুরু করা হয়েছিল। আলী মিস্‌য়ারেরও লক্ষ্য ছিল মালাবার অঞ্চলে একটি পরিপূর্ণ ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা।" (প্রাগুক্ত)

১৯২০ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে আলী ভ্রাতৃদ্বয় এবং মহাত্মা গান্ধী মালাবার অঞ্চল সফর করেন। কালীকটে আয়োজিত এক বিশাল জনসমাবেশে তিন নেতা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জনতাকে খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করার আহ্বান জানান। ফলে ১৯২১ খৃস্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত সমগ্র মালাবার অঞ্চলে খেলাফত কমিটির অন্যূন দুইশত শাখা গঠিত হয়ে যায়।

আলী মিস্‌য়ার পুনানীতে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণ করতঃ উচ্চতর জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে মক্কায় চলে যান এবং দীর্ঘ সাত বছর পর দেশে ফিরে অসংখ্য

ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করতে থাকেন। এভাবেই মোপালা আন্দোলনের সূচনা হয়। (প্রাগুক্ত)

জেহাদী অনুপ্রেরণায় উদ্দীপিত আলী মিস্‌য়ারের কর্মতৎপরতা প্রথম থেকেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছিল। একরাতে একদল সশস্ত্র পুলিশসহ জনৈক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট আলী মিসয়ারের বাসভবন ঘেরাও করে। শায়খ আলী বিষয়টি আঁচ করতে পেরে পূর্বাহ্নেই আত্মগোপন করেছিলেন। পুলিশ তাঁকে না পেয়ে বাড়ীতে অবস্থানরত কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, ইংরেজের পুলিশবাহিনী শায়খ আলী মিস্‌য়াকে হত্যা করেছে এবং তাঁর বাসস্থান সংলগ্ন মসজিদ ধসিয়ে দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ ছুটে আসেন। এই ক্ষুব্ধ জনতার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন আব্দুল কাদের নামক একজন খেলাফত কর্মী। জনতার সাথে ইংরেজদের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সম্মুখ লড়াই শুরু হয়ে যায়।

ইংরেজ পক্ষের বন্দুকের গুলীতে সাতজন মুসলমান শহীদ হন। জনতা পুলিশের হাত থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে। এই পাল্টা আক্রমণে বাহিনীর দুই ব্যক্তি নিহত হয়। ঘটনাক্রমে নিহত দুই পুলিশ কর্মকর্তাই ছিল ইংরেজ। প্রতিবাদকারী জনতার প্রচণ্ড চাপের মুখে টিকতে না পেরে হতাহতদের সাথে নিয়ে রাতের অন্ধকারে কালীকটের দিকে সরে যায়। ফলে বেশ কিছুদিন এই এলাকাটি মুক্ত থাকে। সাধারণ মানুষের এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, ইংরেজরা পরাজয় স্বীকার করেই যেহেতু এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, সুতরাং পুণরায় আর ওরা এদিকে ফিরে আসতে সাহসী হবে না।

এলাকা মুক্ত হওয়ার পর আলী মিস্‌য়ার আত্মপ্রকাশ করেন। কিছুদিন পর জনৈক উর্ধতন ইংরেজ কর্মকর্তা মুসলমানদের ক্ষোভ প্রশমন এবং গ্রেফতারকৃত খেলাফত কর্মীদের মুক্তিদানের বিষয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে একটি বৈঠকে বসার প্রস্তাব পাঠায়। শায়খ আলী সরল বিশ্বাসেই ইংরেজ কর্মকর্তাকে সদলবলে শায়খ আলীর বাসস্থান সংলগ্ন মজিদ প্রাঙ্গণে আসার সাথে সাথেই সমবেত জনতার উপর নির্বিচারে গুলীবর্ষণ শুরু করে। নিরস্ত্র শান্তিপ্রিয় জনগণ এরূপ একটা প্রতারণাপূর্ণ হামলার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে ঘটনাস্থলেই সতেরো জন মুসলমান শহীদ হন। আক্রান্ত জনতা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং ইংরেজ পক্ষেরও বেশ কিছু লোক হতাহত হয়। এভাবেই আজাদীর একটি অগ্নিশিখা দাবানলের সৃষ্টি করে দেয়। এই হামলার সময়ই আন্দোলনের মূল উদগাতা আলী মিস্‌য়ার গ্রেফতার হন। তবে শায়খ আলীর অনুসারীগণ আন্দোলন সুসংহত করেন।

মালাবারের সমস্ত অঞ্চল থেকে ইংজেরা বিতাড়িত হয়। শত্রুমুক্ত এলাকায় পরিপূর্ণ শরীয়তী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এলাকার প্রতিটি মসজিদকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক ভিত্তি এবং শক্তিশালী গণফৌজ গড়ে ওঠে।

বিতাড়িত ইংরেজ শক্তি মাদ্রাজে বসে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। এরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, শক্তি প্রয়োগ করে এই গণবিপ্লব ব্যর্থ করা সম্ভব নয়। তাই ষড়যন্ত্রের পথ অবলম্বন করা হয়। এরা হিন্দুদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, মোপালাদের প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাষ্ট্র যদি টিকে যায় তবে মালাবার অঞ্চলে হিন্দুদের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। ইংরেজদের এই প্ররোচণাতেই শুরু হয় হিন্দু-মুসলিম বিভেদের প্রক্রিয়া। জনৈক হিন্দুদেশীয় হিন্দু রাজা ইংরেজদের প্রভুদের সাথে আঁতাত করেই তার প্রভাবাধীন অঞ্চলটির স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই নতুন রাজার প্ররোচণাতেই মোপালা অঞ্চলের হিন্দুরা গায়ে পড়ে মুসলমানদের সাথে দাঙ্গা বাধাতে শুরু করে। ষড়যন্ত্র যখন চারদিকে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয়, তখনই মাদ্রাজ থেকে ইংরেজদের এক বিরাট বাহিনী মোপালাদের নবপ্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাষ্ট্রটি আক্রমণ করে বসে। বহিরাক্রমণের পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরেও শুরু হয় হিন্দু সন্ত্রাসবাদী এবং ওদের সহযোগী মুসলিম নামধারী এক শ্রেণীর নরাধমের অন্তর্ঘাতমূলক ক্রিয়াকর্ম। ফলে দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহের যুদ্ধে ইসলামী হুকুমতটির পতন ঘটে। ইংরেজ এবং ওদের এদেশীয় দোসররা এই অঞ্চল থেকে চিরদিনের জন্য মুসলমানদের নির্মূল করে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে। যারা আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন তাঁদের সকলকে ফাঁসি দেয়া হয়। মার্কিন ইতিহাসবিদ স্টিফেন ফ্রেডারিক ডেলীর গ্রন্থ “দি মোপালা বা মালাবার”–এ পরিবেশিত তথ্য ঃ গণহত্যা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যূন দশ হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়। যদিও ইংরেজ সরকারের পরিসংখ্যানবিদদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে নিহতের সংখ্যা ২২৬৬ জন। পরে বিচার প্রহসনের মাধ্যমে ২৫২ জনকে এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল ৫০২ জনকে। এছাড়া, নগদ অর্থ জরিমানা আদায় করা হয়েছিল ১,২৫,০০০ টাকা। জেলে পাঠানো হয় হাজার হাজার লোককে। মালাবার অঞ্চলের জেলখানাগুলোতে এত বিপুল সংখ্যক লোকের স্থান সংকুলান সম্ভব না হওয়ায় স্থানে স্থানে তাঁবু খাটিয়ে অস্থায়ী জেলখানা নির্মাণ করতে হয়। মোপালাদের কথিত এই বিদ্রোহ দমন করার লক্ষ্যে বৃটিশ শাসকদের যে বর্বরোচিত কর্মটি ইতিহাসের পাতায় চিরকাল একটা কলঙ্কের কালিমারূপে স্মরণীয় হয়ে থাকবে তা হচ্ছে, শত শত বন্দীকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বদ্ধ মালগাড়ীর বগিতে বোঝাই করে বিচার অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কুয়েম্বাটোরে প্রেরণ করা হয় ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১৯ নবেম্বর। গন্তব্যস্থলে পৌছার পর দেখা যায় যে, বন্দীদের সবারই ইতোমধ্যে মৃত্যু হয়েছে। এমনকি কোন কোন মৃতদেহ পচন ধরে গেছে।

বৃটিশ শাসকরা এই শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণকারী মুসলমানের সংখ্যা ৬৭ জন বলে উল্লেখ করলেও, প্রকৃতপক্ষে এই সংখ্যা প্রায় তিন সহস্র ছিল বলে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সূত্র থেকে দাবী করা হয়। [দি মোপালা অব মালাবার, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।]

বৃটিশ শাসকদের সূত্রগুলোতে "মোপালা বিদ্রোহ" মোট হাজারখানেক লোক নিহত হওয়ার কথা স্বীকার করা হয় এবং দাবী করা হয় যে, এদের সবাই প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

বৃটিশদের চক্রান্ত এবং প্রত্যক্ষ মদদে সৃষ্ট যুদ্ধোত্তর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় কি পরিমাণ মুসলমান নিহত এবং বাড়ীঘর ও সহায়-সম্পদ থেকে চিরতরে উচ্ছেদ হয়েছিল সে পরিসংখ্যান শেষ পর্যন্ত অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। বৃটিশ এবং হিন্দু আঁতাতের লক্ষ্য ছিল মালাবার থেকে মুসলমানদের পরিপূর্ণ উচ্ছেদ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মূল্যায়ন হচ্ছে, "এই গণজেহাদের মাধ্যমে মালাবারের মুলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা তীক্ষ্ণতর হয়েছে। তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে। যার ফলে এত বড় একটা ধ্বংসযজ্ঞের ধকল কাটিয়ে উঠে মালাবারে এখনও মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রাধান্য বজায় রয়েছে।" (খুতবাতে আজাদ)

মাওলানা আজাদ অন্য এক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন-

"খেলাফত আন্দোলন ছিল আলেমে ইসলামকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের অক্টোপাশ থেকে উপমহাদেশীয় মুসলিম জনগণের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের একটি ঈমানদীপ্ত বলিষ্ঠ অঙ্গীকার। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই মুসলিম জনগণের মধ্যে বৃহত্তর উম্মাহর অনুভূতি বিকশিত হয়। জালেম সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মোকাবেলায় বড় ধরনের গণআন্দোলন গড়ে তোলা ও তা পরিচালনা করার বাস্তব অনুশীলন ও ভারতীয় মুসলমানগণ খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমেই লাভ করে। এই আন্দোলনেরই সর্বাপেক্ষা বড় ধরনের রক্তঝরা অধ্যায় থেকেই মুসলমানগণের রাজনৈতিক ভাষায় বলিষ্ঠতা সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে শুরু করেন যে, উপমহাদেশে তাদের অস্তিত্ব সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের আনুকূল্য কিংবা প্রতিবেশী সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের অনুগ্রহ দৃষ্টির মাধ্যমে রক্ষা করার আশা নিছক একটা দুরাশা বৈ কিছু নয়। এই বাস্তব অনুভূতিই বঞ্চিত মুসলিম জনগণকে একটা তৃতীয় শক্তিরূপে মাথা তুলে দাঁড়াবার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। -(খুতবাতে আজাদ)

মহানবীর (সাঃ) ফুফু দুঃসাহসী মুজাহিদ সাহাবীয়া হযরত সফিয়াহ (রাঃ) বিনতে আব্দুল মুত্তালিব

খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল পঞ্চম হিজরীতে। এ সময় সমগ্র আরবের মুশরিক এবং ইহুদীরা ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামের কেন্দ্রের ওপর হামলা করে বসেছিল। বিশেষভাবে মদীনার অভ্যন্তরে বনু কোরায়জার ইহুদীরা বিশ্বাসঘাতকতা করে হকপন্থীদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছিল। মুসলমানদের জন্য এটা ছিল মারাত্মক পরীক্ষা। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, আল্লাহর পবিত্র বান্দারা এ কঠিন সময়েও মুহূর্তের জন্যও পদস্খলিত হননি। তাঁরা তো নিজের জানমাল হক পথে বিক্রি করে দিয়েছিলেনই এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কুফর ও শিরকের বিরুদ্ধে মুকাবিলার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে রেখেছিলেন। এ সত্ত্বেও মহিলা ও শিশুদেরকে ঘরের দুশমন বনু কোরায়জার হাত থেকে রক্ষা করা অপরিহার্য ছিল। বস্তুত রহমতে আলম (সাঃ) সকল মুসলমান মহিলা এবং "শিশুদেরকে সতর্কতামূলকভাবে 'ফারে' অথবা 'আতাম' নামক একটি দুর্গে স্থানান্তর করলেন এবং হযরত হাসসান (রাঃ) বিন ছাবিতকে (রাসূলের কবি) এই দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োগ করলেন। দুর্গটি যদিও খুব মজবুত ছিল, তবুও ভীতির ঊর্ধ্বে ছিল না। প্রিয়নবী (সাঃ) সকল বাহাদুর সঙ্গীসহ জিহাদে ব্যাপৃত ছিলেন এবং বনু কোরায়জার মহল্লা ও এই দুর্গের মধ্যে কোন সেনাবাহিনী ছিল না। এই ভয়ংকর সময়ে একদিন এক ইহুদী সেদিকে এলো এবং দুর্গে অবস্থানরত লোকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলো। ঘটনাক্রমে একজন শক্ত-সামর্থ বৃদ্ধ মহিলা এই ইহুদীকে দেখে ফেললেন। তিনি খোদাপ্রদত্ত বিচক্ষণতার সাহায্যে বুঝতে সক্ষম হলেন যে, লোকটি গুপ্তচর। সে ফিরে গিয়ে যদি বনু কোরায়জার দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের বলে দেয় যে, দুর্গে শুধুমাত্র মহিলা ও শিশু রয়েছে তাহলে তারা ময়দান খালি দেখে দুর্গের ওপর হামলা করে বসতে পারে। সুতরাং তিনি দুর্গের রক্ষক হযরত হাসসানকে (রাঃ) বাইরে বেরিয়ে ইহুদীকে হত্যা করার কথা বললেন।

হযরত হাসসান (রাঃ) ওজর পেশ করলেন। চরিতকাররা এই ওজরের কারণ হিসেবে তাঁর শারীরিক অথবা অন্তরের দুর্বলতার কথা বলেছেন। কোন অসুখে ভোগার ফলে তাঁর এই রোগ হয়েছিল। অন্য কতিপয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এই সময় এই জবাব দিয়েছিলেন– 'আমি যদি এই ইহুদীর সঙ্গে লড়াই করার যোগ্যই হতাম তাহলে এ সময় আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) সঙ্গে থাকতাম না?'

হযরত হাসসানের (রাঃ) এই জবাব শুনে মহিলাটি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং দুর্গের একটি খুঁটি উঠিয়ে দুর্গের বাইরে এলেন এবং সেই ইহুদীর মাথার ওপর এমন জোরে মারলেন যে সে সেখানেই লাশ হয়ে পড়ে গেল। হাফিজ ইবনে হাজার (রহঃ) 'ইসাবাহ' গ্রন্থে লিখেছেন, ইহুদীকে হত্যা করার পর তিনি হযরত হাসসানকে (রাঃ) বললেন, গিয়ে তার মাথা কেটে আনো। তিনি তাতেও ওজর পেশ করলেন। বাহাদুর মহিলাটি স্বয়ং তার মাথা কেটে দুর্গের নিচে নিক্ষেপ করলেন। বনু কোরায়জার ইহুদীরা কর্তিত মস্তক দেখে স্থির বিশ্বাস করলো যে, দুর্গের অভ্যন্তরেও মুসলমানদের সৈন্য আছে। বস্তুত তাদের আর দুর্গের ওপর হামলার সাহস হলো না।

আল্লামা ইবনে আছির (রহঃ) জাফরী বর্ণনা করেছেন, এরপর মহিলাটি হযরত হাসসানকে (রাঃ) বললেন, 'এখন গিয়ে নিহত ইহুদীর সামান খুলে নিয়ে এসো।' তিনি বললেন, 'আমার সে ইচ্ছা নেই।' ইবনে আছির (রহঃ) বলেন, একজন মুসলমান মহিলার পক্ষ থেকে এই প্রথম বাহাদুরী প্রকাশ পেয়েছিল। সুতরাং সারওয়ারে আকরাম (সাঃ) তাঁকে গনিমতের মালের অংশ দিয়েছিলেন।

এই শেরদিল মহিলার বাহাদুরী এবং ভীতিহীনতা এক বড় আশংকা নির্মূল করে দিয়েছিল এবং সকল মুসলমান মহিলা ও শিশুকে ইহুদীর নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। এই মহিলা ছিলেন বনু হাশিমের নয়নমণি রাসুলে করিমের (সাঃ) ফুফু হযরত সফিয়াহ (রাঃ) বিনতে আব্দুল মুত্তালিব।

হযরত সফিয়াহ (রাঃ) বিনতে আবদুল মুত্তালিব অন্যতম জালিলুল কদর মহিলা সাহাবী ছিলেন। তিনি হালাহ বিনতে ওয়াহিব (অথবা আহিব) বিন আবদি মান্নাফ বিন যাহরাহ বিন কিলাব বিন মাররাহর সন্তান ছিলেন। তিনি প্রিয়নবীর (সাঃ) মা আমিনা বিনতে ওয়াহাব বিন আবদি মান্নাফের চাচাতো বোন ছিলেন। এই সূত্রে তিনি হুজুরের (সাঃ) খালাতো বোনও হতেন। শেরে খোদা এবং শহীদে ওহোদ হযরত হামযা (রাঃ) তাঁর সহোদর ছিলেন। সারওয়ারে আলমের (সাঃ) পিতা আবদুল্লাহ-আবদুল মুত্তালিবের দ্বিতীয় স্ত্রী ফাতিমা বিনতে আমরের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই সূত্রে হযরত সফিয়াহ (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) ফুফু ছিলেন। এ জন্য তাঁকে আম্মাতুন্নাবী বলা হয়। প্রিয়নবীর (সাঃ) অন্যান্য ফুফু উম্মে হাকিম বাজইয়া, উমাইয়াহ, আতিকাহ, বাররাহ এবং আরদার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু হযরত সফিয়াহর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে সকলেই একমত পোষণ করেন। ইবনে আছির (রহঃ) 'উসুদুল গাব্বাহ' গ্রন্থে লিখেছেন, সহিহ বা সঠিক কথা হলো তিনি ব্যতীত রাসূলের (সাঃ) কোন ফুফুই ইসলাম কবুল করেননি।

যদিও ইবনে সায়াদ (রঃ) এবং হাফিজ ইবনে কাইয়েম (রঃ) আতিকাহ এবং আরদাকেও ইসলাম গ্রহণকারী মহিলাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তবুও হযরত সফিয়াহই (রাঃ) এই মর্যাদায় অভিষিক্ত বা তিনিই হকের দাওয়াতের শুরুতে ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং সাবিকুনাল আউয়ালুনের সেই পবিত্র দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদেরকে আল্লাহ পাক স্পষ্ট ভাষায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। প্রিয়নবী (সাঃ) এবং তিনি প্রায় একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এজন্য তিনি রাসূলের (সাঃ) প্রায় সমবয়সী ছিলেন।

হযরত সফিয়াহর (রাঃ) প্রথম বিয়ে হয়েছিল হারিছ বিন হারার উমুব্বীর সঙ্গে। তাঁর ঔরসে একটি পুত্র সন্তান জন্মেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর আওয়াম বিন খুয়ায়েলদ কারাশীল আসাদীর সঙ্গে হযরত সফিয়াহর (রাঃ) আবার বিয়ে হয়। আওয়াম বিন খুয়ায়েলদ উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজাতুল কুবরার (রাঃ) ভাই ছিলেন। হাওয়ারীয়ে রাসূল (সাঃ) হযরত যোবায়ের (রাঃ) এই আওয়ামের ওরষেই জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালেই হযরত যোবায়ের (রাঃ) পিতার স্নেহচ্ছায়া থেকে মাহরুম হন। সে সময় হযরত সফিয়াহ (রাঃ) সম্পূর্ণ যুবতী ছিলেন। কিন্তু এরপর তিনি সমগ্র জীবন বিধবা অবস্থায় কাটান। রহমতে আলম (সাঃ) নবুয়ত পেলেন এবং লোকদেরকে হকের দিকে আহ্বান জানানো শুরু করলেন। এ সময় কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই হযরত সফিয়াহ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর ১৬ বছর বয়স্ক পুত্র হযরত যোবায়েরও (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত সফিয়াহ (রাঃ) অত্যন্ত সুন্দরভাবে হযরত যোবায়েরকে (রাঃ) প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তাঁর আকাংক্ষা ছিল যে, তাঁর পুত্র বড় হয়ে একজন ভয়হীন এবং বাহাদুর সিপাহী হবে। বস্তুত তিনি হযরত যোবায়েরকে (রাঃ) দিয়ে অত্যন্ত কঠিন মেহনতের কাজ করিয়ে নিতেন এবং সময়ে সময়ে খুব করে ডাটতেনও। যোবায়েরের (রাঃ) চাচা নওফিল বিন খুয়ায়েলদ একদিন মায়ের হাতে ভাতিজার মার দেখে অস্থির হয়ে পড়লো এবং হযরত সফিয়াহকে (রাঃ) খুব করে গালি দিয়ে বলল, এভাবেই তো তুমি ছেলেকে মেরেই ফেলবে। নওফিল বনু হাশিম এবং নিজের গোত্রের কতিপয় লোককেও সফিয়াকে (রাঃ) পুত্রের ওপর কঠোরতা অবলম্বন করা থেকে বিরত রাখার জন্য বললো। যখন তাঁর কঠোরতার কথা সাধারণ্যে প্রকাশ হয়ে পড়লো তখন তিনি বললেন– 'যে ব্যক্তি বলে যে, আমি তার (যোবায়েরের) সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করি, সে মিথ্যা বলে। সে যাতে আকলমন্দ হয় এ জন্য আমি তাকে মারি এবং সৈন্যকে পরাজিত করে এবং গণিমতের মাল লাভ করে।'

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) আসকালানী "ইসবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, শৈশবকালে একজন শক্তিশালী লোকের সঙ্গে হযরত যোবায়েরের (রাঃ) শক্তি

পরীক্ষা হয়ে গেল। তিনি এমন এক আঘাত লাগালেন যে, তার হাত ভেঙ্গে গেল। লোকজন হযরত সফিয়াহর (রাঃ) নিকট অভিযোগ করলে তিনি ক্ষমা চাওয়ার পরিবর্তে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা যোবায়েরকে কেমন পেয়েছ? সে বাহাদুরনাবুযদিল?"

মোট কথা, মা'র প্রশিক্ষণের প্রভাবে হযরত যোবায়ের (রাঃ) বড় হয়ে ব্যূহ ভেদকারী এক দুর্জয় শক্তির বাহাদুর হন। এমনিতেই প্রকৃতি হযরত যোবায়েরকে (রাঃ) সৌভাগ্য প্রদান করেছিলো। উপরন্ত মায়ের প্রশিক্ষণে তাঁর গুণাবলী আরও প্রোজ্জ্বল হয় এবং তাঁর অন্তরে ইসলাম এবং ইসলামের দায়ী বা আহবানকারীর প্রতি ভালোবাসা পূর্ণমাত্রায়ই ছিলো। রহমতে আলমের (সাঃ) সঙ্গে হযরত যোবায়েরের (রাঃ) এক আশ্চর্য ধরনের সম্পর্ক ছিল। নবুয়তের প্রথম যুগে একদিন গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে রাসুলকে (সাঃ) মুশরিক শত্রুরা গ্রেফতার অথবা শহীদ করে ফেলেছে। এ কথা শুনতেই হযরত যোবায়ের (রাঃ) উদ্বিগ্ন অবস্থায় কোনদিকে না তাকিয়ে তলোয়ারসহ বিদ্যুৎ বেগে নবীর (সাঃ) আবাসস্থলে এলেন। সেখানে নবীকে (সাঃ) সুস্থ অবস্থায় পেয়ে প্রকৃতিস্থ হলেন এবং চেহারা খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠলো। হুজুর (সাঃ) তাঁর নাঙ্গা তরবারীর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেনঃ "যোবায়ের এটা কি?"

যোবায়ের (রাঃ) আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমি শুনেছি যে, শত্রুরা হয় আপনাকে গ্রেফতার করেছে অথবা সম্ভবত আপনাকে শহীদ করে ফেলেছেন।"

হুজুর (সাঃ) মুচকি হেসে বললেনঃ "বাস্তবিকই যদি এ রকম হয়ে যেত তাহলে তুমি কি করতে?"

হযরত যোবায়ের (রাঃ) নির্দ্বিধায় বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসুল! খোদার কসম আমি মক্কাবাসীদের সঙ্গে লড়াই করে মরতাম।"

নবুয়তের পঞ্চম বছরে হযরত সফিয়াহকে (রাঃ) নিজের কলিজার টুকরার সঙ্গে অস্থায়ী বিচ্ছেদের দুঃখ সইতে হয়। ইসলাম গ্রহণের পর অন্যান্য মুসলমানের মত যোবায়েরও (রাঃ) কাফিরদের জুলুম-নির্যাতনের নিশানা বনে গিয়েছিলেন। বিশেষ করে চাচা নওফিল বিন খুয়ায়েলদ তাঁর ওপর চরম নির্যাতন চালাতো। সুতরাং রাসূলের (সাঃ) ইঙ্গিতে ইসলাম গ্রহণকারীদের একটি কাফেলা নবুয়তের পঞ্চম বছরের রজব মাসে হাবশার দিকে হিজরত করেন। এই কাফেলায় হযরত যোবায়ের (রাঃ) অন্তভূক্ত ছিলেন। তাঁর বিচ্ছিন্নতা মায়ের ওপর এক কঠিন বোঝা স্বরূপ ছিল। কিন্তু হুজুরের (সাঃ) ইঙ্গিত এবং পুত্রের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসিকতার সংগে প্রিয় পুত্রকে হাবশা রওয়না করে দিলেন। হকপন্থী এই মুহাজিরদের হাবশায় কেবলমাত্র তিনমাস অবস্থান হয়েছিল এমন সময়

তাঁরা এক আনন্দের সংবাদ পেলেন। সংবাদটি হলো, মক্কার মুশরিকরা ইসলাম গ্রহণ করেছে অথবা (অন্য রাওয়ায়েত অনুযায়ী) রাসূলে আকরাম (সাঃ) ও কাফিরদের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেছে। অতএব নবুয়তের পঞ্চম বছরের শওয়াল মাসে সকল (অথবা তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ) মুহাজিরই মক্কা ফিরে এলেন। তাঁদের মধ্যে যোবায়েরও (রাঃ) ছিলেন। যখন তাঁরা মক্কার নিকটকে পৌছলেন তখন জানতে পেলেন যে, খবরটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। সুতরাং প্রত্যাবর্তনকারী সকলেই কোরেশের কোন না কোন সরদারের আশ্রয় নিয়ে মক্কা প্রবেশ করলেন। আল্লামা বালাজুরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত যোবায়ের (রাঃ) বিনুল আওয়াম যামায়াহ বিনুন আসওয়াদের আশ্রয় নিলেন। হযরত সফিয়াহ (রাঃ) নিজের কলিজার টুকরার সঙ্গে মিলিত হয়ে খুব খুশী হলেন এবং এভাবে সুস্থ ও নিরাপদে তাঁর ফিরে আসায় আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া সিজদা আদায় করলেন। কিছুদিন মক্কায় অবস্থানের পর হযরত যোবায়ের (রাঃ) পেশা হিসেবে ব্যবসাকে বেছে নিলেন এবং বাণিজ্যিক কাফেলার সংগে সিরিয়া যাতায়াত করতে লাগলেন। সেই সময় হযরত সফিয়াহ (রাঃ) হযরত যোবায়েরের বিয়ে হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) সঙ্গে দিয়ে দিলেন। আর এমনিভাবে তিনি হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) জামাই হয়ে গেলেন।

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, হযরত সফিয়াহ (রাঃ) পুত্র হযরত যোবায়েরসহ (রাঃ) মদীনা মুনাওয়ারা হিজরত করেন। বিভিন্ন রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, প্রিয় নবী (সাঃ) যে সময় মক্কাকে বিদায় জানিয়ে মদীনা রওয়ানা হলেন তখন হযরত যোবায়ের (রাঃ) বাণিজ্য ব্যাপদেশে সিরিয়া গমন করেছিলেন। যখন তিনি সিরিয়া থেকে মক্কা ফিরে আসছিলেন তখন পথিমধ্যে সারওয়ারে আলম (সাঃ) এবং হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নিচ্ছিলেন। হযরত যোবায়ের (রাঃ) হজুর (সাঃ) এবং হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) (নিজের শ্বশুর) খিদমতে তোহফা হিসেবে কয়েকখানা সাদা কাপড় পেশ করেন এবং তাঁরা এই সাদা কাপড় পরিধান করেই মদীনা প্রবেশ করেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত উরওয়াহ বিন যোবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যোবায়ের (রাঃ) সঙ্গে মিলিত হলেন। যোবায়ের (রাঃ) ছিলেন ব্যবসায়ী। তিনি মুসলমানদের এক কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া থেকে ফিরছিলেন। যোবায়ের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং আবুবকরকে (রাঃ) সাদা কাপড় পরিয়েছিলেন।" (বুখারী কিতাবুল মানাকিব, বাবে হিজরাতুন্নবী (সাঃ)।)

মক্কা প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পরই হযরত যোবায়ের (রাঃ) মা হযরত সফিয়াহ (রাঃ) এবং স্ত্রী হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে আবুবকর সিদ্দিকসহ (রাঃ) মদীনার

দিকে হিজরত করেন এবং কিছুদিন কুবাতে অবস্থান করেন। সেখানেই প্রথম হিজরীতে (অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী দ্বিতীয় হিজরীতে) হযরত আসমার (রাঃ) গর্ভে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। হযরত সফিয়াহর (রাঃ) এই নাতির জন্ম ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বের দাবীদ র। কেননা তাঁর জন্মের পূবে কয়েক মাস যাবত মুহাজিরদের কোন সন্তান জন্মগ্রঃ ণ করেনি। এদিকে মদীনার ইহুদীরা রটিয়ে দিয়েছিল যে, তারা মুসলমানদের ওপর জাদু করেছে। ফলে তাঁদের বংশধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হযরত আব্দুল্লাহর (রাঃ) জন্মে মুসলমানরা যারপরনাই খুশী হয়েছিলেন এবং তাঁরা আবেগে উদ্বেলিত হয়ে এত জোরে নারায়ে তাকবীর উচ্চারণ করেছিলেন যে, পাহাড় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। মদীনায় হযরত সফিয়াহ (রাঃ) হযরত যোবায়েরের সঙ্গেই থাকতেন এবং তিনি তাঁকে অন্তর দিয়ে খিদমত করতেন।

ওহোদের প্রান্তরে (তৃতীয় হিজরী) একটি ভুলের কারণে যখন যুদ্ধের ফলাফল পাল্টে গেল এবং মুলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিল তখন হযরত সফিয়াহ (রাঃ) বর্শা হাতে মদীনা থেকে বের হলেন। যাঁরা যুদ্ধের ময়দান থেকে মুখ ফিরিয়ে মদীনার দিকে আসছিলেন তিনি তাঁদেরকে লজ্জা দিয়ে অত্যন্ত ক্রোধের সঙ্গে বলেছিলেন, "রাসূলকে (সাঃ) ফেলে রেখে চলে এসেছ?"

রহমতের আলম (সাঃ) সফিয়াহকে (রাঃ) যুদ্ধের ময়দানের দিকে আসতে দেখে তাঁর অটল পুত্র হযরত যোবায়েরকে (রাঃ) কাছে ডেকে নিয়ে বললেনঃ "সফিয়াহ (রাঃ) যেন নিজের ভাই হামযার (রাঃ) লাশ দেখতে না পায়।"

হযরত হামযা (রাঃ) বীরত্বপূর্ণ লড়াই করে যোবায়ের বিন মাতায়ামের গোলাম ওয়াহশি বিন হারবের বর্শার আঘাতে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। হিন্দ বিনতে উতবাহ নিজের পিতা উতবাহ'র (বদরের যুদ্ধে নিহত) প্রতিশোধের আবেগে তাঁর লাশ বিকৃত করে ফেলেছিল। অর্থাৎ নাক এবং কান কেটে ফেলেছিল। বরং তার থেকেও অগ্রসর হয়ে সাইয়েদুশ শুহাদার (রাঃ) পেট চিরে কলিজা বের করে চিবিয়ে ফেলেছিল। রাসূল আকরাম (সাঃ) চাননি যে, সফিয়াহ (রাঃ) প্রিয় ও বাহাদুর ভাইয়ের লাশ এ অবস্থায় দেখুন। হযরত যোবায়ের (রাঃ)– মাকে হুজুরের (সাঃ) ইরশাদ সম্পর্কে অবহিত অবহিত করলে তিনি তার কারণ বুঝে গেলেন এবং বললেন, "আমি জেনেছি, আমার ভাইয়ের লাশ বিকৃত করা হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি এটা পছন্দ করি না। কিন্তু ধৈর্য ধারণ করবো এবং ইনশাআল্লাহ ধৈর্যের সঙ্গেই কাজ করবো।"

হুজুর (সাঃ) হযরত সফিয়াহর (রাঃ) জবাব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তাঁকে হযরত হামযা'র (রাঃ) লাশ দেখার অনুমতি দিলেন। তিনি শোকাভিভুত অবস্থায় লাশের নিকট এলেন এবং প্রিয় ভাইয়ের শরীর ছিন্নভিন্ন অবস্থায় দেখে আহ শব্দ

উচ্চারণ করলেন এবং ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়ে চুপ হয়ে গেলেন। অতঃপর তাঁর জন্য মাগফিরাত কামনা করলেন এবং তাঁর দাফনের জন্য হুজুরের (সাঃ) খিদমতে দু'টি চাদর পেশ করে মদীনায় ফিরে গেলেন।

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) "ইছাবাহতে" লিখেছেন, হযরত সফিয়াহ (রাঃ) হযরত হামযার (রাঃ) শাহাদাতে একটি দরদপূর্ণ মরসিয়া বর্ণনা করেছিলেন।

এক রাওয়ায়েতে আছে যে, হযরত সফিয়াহ (রাঃ) প্রিয় ভাইয়ের জন্য মাগফিরাত কামনার পর অশ্রু সম্বরণ করতে না পেরে কেঁদে উঠলেন। তাঁকে কাঁদতে দেখে প্রিয় নবীর (সাঃ) চক্ষু দিয়েও পানি গড়িয়ে পড়লো। অতঃপর তিনি হযরত সফিয়াহকে (রাঃ) সবরের পরামর্শ দিয়ে বললেন ঃ

"আমাকে জিবরীল আমিন (আঃ) খবর দিয়েছেন যে, আরশে মুয়াল্লার ওপর হামযার (রাঃ) বিন আব্দুল মুত্তালিবকে আসাদুল্লাহ এবং আসাদুর রাসূল (আল্লাহর বাঘ এবং রাসূলের বাঘ) লিখা হয়েছে।"

খন্দকের যুদ্ধে (পঞ্চম হিজরী) হযরত সফিয়াহ (রাঃ) নজিরবিহীন বাহাদুরী এবং ভীতিহীনতার কথা ওপরে আলোচনা হয়েছে। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৫৮ বছর।

নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা লিখেছেন, হযরত সফিয়াহ (রাঃ) তীক্ষ্ণধী সম্পন্ন দূরদর্শী, বাহাদুর এবং ধৈর্য্যশীল মহিলা ছিলেন এবং সমগ্র আরবে নিজের বংশ, কথা ও কাজের দিক থেকে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে কবিত্বের গুণও প্রদান করেছিলেন। কতিপয় চরিত গ্রন্থে তাঁর রচিত কিছু মরসিয়া পাওয়া যায়। পিতা আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুতে তিনি একটি সুন্দর মরসিয়া বর্ণনা করেছিলেন।

রহমতের আলম (সাঃ) হযরত সফিয়াহ'র (রাঃ) ভ্রাতুষ্পুত্র, খালাতো ভাই এবং স্বামীর ভগ্নিপতি ছিলেন। শৈশবকালে তিনি হুজুরের (সাঃ) সঙ্গে একই সাথে একই গৃহে লালিত পালিত হয়েছিলেন। এজন্য হুজুরের (সাঃ) প্রতি তাঁর অসাধারণ ভালোবাসা ছিল। প্রিয় নবীও (সাঃ) তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং তিনি তাঁর সন্তান হযরত যোবায়েরকে (রাঃ) বেশীর ভাগ সময় "ইবনে সফিয়াহ" বলে ডাকতেন। ১১ হিজরীতে হুজুরের (সাঃ) ওফাত হলে হযরত সফিয়াহ (রাঃ) ওপর শোকের পাহাড় ঢলে পড়ে। এ সময় তিনি এক দরদভরা মরিসিয়া বলছিলেন।

হযরত সফিয়াহর (রাঃ) ওমর ফারুকের (রাঃ) খিলাফতকালে ইন্তেকাল করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৭৩ বছর। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতি এক কাশ্মীরী নির্যাতিতা মহিলা

বর্তমান বিশ্বের কাছে কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর নির্যাতন আর কোন গোপন বিষয় নয়। কিন্তু তারপরও ওরা থেমে নেই। বিশ্ব বিবেকের নিন্দা আর ধিক্কারের তোয়াক্কা না করে প্রতিদিন কেড়ে নিচ্ছে ভারতীয় বাহিনী কোন কোন মুসলিম জনপদের শত শত প্রাণ। জ্বলছে রাজনৈতিক জিঘাংসার আগুন। ছাড়খার হচ্ছে ভূস্বর্গ কাশ্মীর–সমগ্র ভারত। একজন নির্যাতিতা কাশ্মীরী বোনের চিঠি পড়েই দেখুন এদের নৃশংসতার নির্মম চিত্র ঃ

"আমিও হাওয়া (আঃ)-এর কন্যা। ভূস্বর্গ কাশ্মীর উপত্যকার রাজধানী শ্রীনগর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে ছিল আমার বাড়ি। আমি ছাড়া আমার স্বামী আব্দুর রশীদ ও একটি ছোট ছেলে–খালেদুর রশীদ। এ তিনজন নিয়েই ছিল আমাদের ছোট সাজানো-গোছানো সংসার। আমাদের বাড়ির চতুর্দিকে ছিলো কাশ্মীরী আঙুর ও আপেলের বাগানে ঘেরা। সবুজ নয়নাভিরাম নৈসর্গিক সুন্দরের প্রাচুর্য ছিল সারাটা এলাকা জুড়ে, যার জন্য কাশ্মীরকে বলা হতো পৃথিবীর ভূস্বর্গ।

হে মুসলিম ভাতৃবৃন্দ! আমার মত হাজারো নির্যাতিতা বোন আমাদের দিকে চেয়ে আছে; আমাদের সহযোগিতার আশা করছে। আল্লাহ না করুন, এমন অবস্থা যদি আপনাদের হাজারো বোনের এমন অবস্থা যদি আপনাদের হাজারো বোনের হয়ে যায়, তাহলে ঠিকই আপনাদের ঘুম ভাঙ্গবে, চেতনাও জাগবে।

আল্লাহর কসম! নিজেদের শত মতবিরোধ পেছনে ঐক্যবদ্ধ হোন। জেগে উঠুক। সিংহ শাবকদের ভীরু শৃগালের মত কাপুরুষোচিত জীবন শোভা পায় না। জালেম ব্রাহ্মণ্যবাদের ভণ্ডামির আড্ডায় 'মুহম্মদ বিন কাসিম'–এর মত হানুন কুঠারাঘাত। এখানো সময় আছে, আপনার মুসলিম বোনদের ইজ্জত রক্ষা করুন। এ দুর্যোগেও যদি আপনার ঘুম না ভাঙ্গে, আপনার পৌরুষত্বের ধমনীতে আগুন না লাগে, ব্যাঘ্র হুংকার দিয়ে বেরিয়ে না আসতে পারেন তাহলে আপনার এ অচেতনতা মনের দিবানিদ্রা কোনদিন ভাঙ্গবে না, বোধোদয় হবে না কোনদিন। হে মুসলিম বিশ্বের শেরদিল ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনার এক নির্যাতিতা ভাগ্যাহত বোনের নির্মম কাহিনী আপনাদের কাছে বিধৃত করছি ঃ

১৯৯৩-এর ১৫ জুলাই। আমি খালেদকে কোলে নিয়ে উঠানে বসে ছিলাম। আমার স্বামী আব্দুর রশীদ বৈঠকখানায় তার এক বন্ধুর সাথে আলাপ করছিল। গোলাম মুহিউদ্দীন নামের উক্ত মেহমান আমার স্বামীর বাল্য বন্ধু। সে যে এখন

একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডো তা আমার জানা ছিল না। পুরো এক বছর সে গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়ে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসে আমার স্বামী আব্দুর রশীদকে জিহাদী প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা শুনাচ্ছিল। এমন সময় বাইরে থেকে কে যেন দরজার কড়া নাড়লো। আব্দুর রশীদ দরজা খুলে দিয়ে আমার ছোট ভাই ঘরে প্রবেশ করে কুশল বিনিময়ের পর খালেদকে কোলে নিয়ে সোহাগ করতে লাগলো। খালেদ ওর মামার কোলে খেলতে লাগলো।

মাগরিবের নামাযান্তে আমার স্বামী আব্দুর হামিদ এবং গোলাম মুহিউদ্দীন বৈঠকখানার ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত আলাপ করে এশার নামায পড়ে সেখানেই খাবার খেয়েছিলেন। অধিক রাতে শুইলেও সবাই আযানের অনেক আগেই উঠে ফজরের নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমিও অযু করে মাত্র আল্লাহর দরবারে সেজদা দিচ্ছি। এমন সময় পাশের বাড়ি থেকে ভেসে এল মেয়েদের কান্নার রোল। ভারতীয় ফৌজপুরে গ্রাম অবরোধ করে লুট, ধর্ষণ, হত্যা আর অগ্নিসংযোগে অল্পক্ষণের মধ্যে সারা গ্রামে একটি নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি করলো। কয়েক শত বাড়িতে আগুন ধরিয়ে প্রায় বিশজন মেয়ের শ্রীলতাহানি করে ৩০ জন মানুষকে হত্যা করার পর যখন আমাদের ঘরে প্রবেশ করলো তখন প্রথম তাদের উন্মত্ততায় বাধা পড়র। আমার দিকে হাত বাড়াতেই দেখতে দেখতে চারজন ভারতীয় সৈন্য মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। এটা ছিল গোলাম মুহিউদ্দীনের ক্লাশিন কভের প্রথম টার্গেট। এখনো পুরো ঘটনা শুরু হয়নি। আমার স্বামীর হাতে ছিল পিস্তল। আর ভাই আব্দুর হামিদ ক্লাশন ম্যাগজিন ভরে দিচ্ছিল। গোলাম মুহিউদ্দীনের প্রতি গুলিতে একাধিক ভারতীয় শৃগালের শেষ লীলা সাঙ্গা হচ্ছিল। আমি তখন খালেদকে বুকে জড়িয়ে ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ একটা গুলি আমার ভাই আব্দুল হামিদের মাথায় বিদ্ধ হলে সে পড়ে গেল আর সাথে সাথে তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। এ সময় ভারতীয় জানোয়ারগুলো শুরু করলো এলোপাতাড়ি গোলাগুলি। কিছুক্ষণ পর স্বামী আব্দুর রশীদের পিস্তল স্তব্ধ হয়ে গেল। চিরদিনের মত সে ছেড়ে গেল আমাদেরকে। গোলাম মুহিউদ্দীন খালেদকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে আমাদের পালিয়ে যেতে বললো, কিন্তু আমার পা এক ইঞ্চিও নড়াতে পারলাম না। দশ-বারোটা হায়েনা একসাথে ঘরে ঢুকে গোলাম মুহিউদ্দীনের বুকে কয়েকশত বুলেটের আঘাত করলো। আমার চোখের সামনে বিদায় হয়ে গেল সবাই। আমার কোল থেকে খালেদকে ছিনিয়ে নিয়ে বুটের আঘাতে পিষে ফেললো, আর ঘরের সমস্ত মাল সম্পদ লুটে নিল। নেমে এলো আমার চোখে তখন অন্ধকার। ইজ্জত রক্ষার্থে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করলাম। কিন্তু

চারটি হিংস্র জানোয়ার একসাথে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রাণপ্রিয় মুসলিম ভায়েরা! এরপর যা হবার তাই হলো .....।

তা শুনলে আপনাদের চেতনায় অবশ্যই আঘাত লাগবে। ভিজে যাবে চোখের পাতা।

বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ!!

কাশ্মীরের হাজারো বিপন্ন অসহায় বোন আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। যদি আপনাদের সাহস না থাকে, যদি আপনাদের মধ্যে সালাউদ্দীন আইয়ুবীর অভাব হয়, মুহাম্মদ বিন কাসিমের দীপ্ত তেজ জমে গিয়ে থাকে, ভীরুতায় যদি আপনারা বুযদিল হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের হাতে ট্যাংক-অস্ত্র দিন যেন আমরা নিজেরাই আমাদের ইজ্জত রক্ষা করতে পারি।"

এতো মাত্র একটি মজলুম বোনের আর্তনাদ। এমন হাজারো কাশ্মীরী বোন আজ লাঞ্ছিতা, নির্যাতিতা। ভারতীয় বাহিনীর ধর্ষণ, হত্যা-নির্যাতনে কাশ্মীরী সন্তানহারা মা, স্বামী হারা বিধবা বোন, আর নিপীড়িতা অসহায় রমণীর ফরিয়াদে কাশ্মীরের বাতাস ভারী হয়ে গেছে। ওরা আজ খাদ্য চায় না, বস্ত্র চায় না, চায় অস্ত্র। নিজেদের ইজ্জত বাঁচিয়ে রাখার জন্য ওদের সাহায্য দরকার। এ আর্তনাদ আমাদের মনে কোন প্রভাব ফেলবে কি?

কাশ্মীরের অপরাজিতা

মেয়েটির নাম ফাতিমা। বাবা স্কুলশিক্ষক। তিন ভাইয়ের একমাত্র বোন। তাও সবার ছোট। বাবা, মা আর ভাইদের অপার ভালবাসার মধ্যে কেটেছে, শৈশব-কৈশোর। ভালবাসা ও দুষ্টুমিতে ভরা থাকত সারাটা মন। এত ডানপিটে ছিল যে, গাছে ওঠা লাফালাফি, ছোটাছুটি, সারাদিন ফাঁক পেলেই এই সব করত। পড়ালেখায় ছিল বরাবরই ভাল।

এত সুন্দর ওদের চারপাশ, এত সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ, ওর মনে হতো পৃথিবীর সবটাই বুঝি এমনই। ছোট মনে অনন্ত প্রশ্ন থাকলেও ওর দৃষ্টি ছিল সীমাবদ্ধ। কাশ্মীরের ছোট একটা শহরে তারা থাকে, ওর পৃথিবী এটাই। কিন্তু প্রায়ই শুনত কি সব মারামারি ধরাধরির খবর। পত্রিকায় এগুলো ছাপা হতো। ফাতিমা পড়তে চেষ্টা করত। ওর বড় ভাইয়েরা এ বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করত। বাইরে বেরুলে, স্কুলে গেলে সবাই কেমন অস্থির আর আতঙ্কিত হয়ে পড়ত।

দিন যায়। বড় হতে হতে ফাতিমা সব বুঝতে পারল। বুঝতে পারল মাতৃভূমি, স্বাধীনতা, ধর্ম, সব বিষয়। ওদের এই কাশ্মীর এলাকাটা নিয়ে দখল-বেদখলের রাজনীতি চলছে। একদিকে হিন্দুস্থান অন্যদিকে পাকিস্তান। কাশ্মীর হচ্ছে ভুস্বর্গ। সবার চোখ এদিকেই। কিন্তু ওরা তো সবাই মুসলমান। ফাতিমা ভাবে, হিন্দুস্থান শব্দটা শুনলেই কেমন গা জ্বালা করে। শিরক আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ভারত ওদের এই পবিত্র ভূমির উপর দখলদারি চালাচ্ছে কেন?

ফাতিমার এক চাচা থাকেন পাকিস্তানে। তাঁকে ওর খুব ভাল লাগে। এত সুন্দর করে ইসলামী সংস্কৃতি ও ভ্রাতৃত্ব নিয়ে কথা বলেন। তাছাড়া চাচাত ভাইরা মাঝে মাঝে এদের এখানে এসে ওর ভাইদের সাথে জিহাদ নিয়ে আলোচনা করেন। সবাই কেমন সাহসী ও উদ্দীপ্ত। কলেজের অনেক বন্ধু নিয়ে ফাতিমার ভাইরা একটি সংগঠন তৈরি করেছেন। বাবা, ভাই, আত্মীয় স্বজন সবার মুখে একই কথা ঃ স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত হতে দেব না।

ক্রমশ পরিস্থিতি আরও জটিল ও খারাপের দিকে গড়াতে থাকে। দুই দেশের মধ্যে শুরু হয় প্রচণ্ড লড়াই। ভারতের সৈন্যরা নৃশংসভাবে হত্যা করছে নিরীহ কাশ্মীরী জনতাকে। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে কত বাড়ি-ঘর। মানুষের অগণিত লাশ আর চিৎকার। একদিন ওর বড় ভাইরা বেরিয়ে গেলেন অস্ত্রহাতে কয়েকজন যুবকের সাথে। হঠাৎ একদিন খবর এল ওর বড়ভাই শহীদ হয়েছেন। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন ওর মা-বাবা।

সেই দিন থেকে ফাতিমার বুকে জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন। সে আগুন ভারতীয় সৈন্যদের ওপর। তারা কেবল হত্যাই করছে তাই নয়, অনেক মেয়ের সম্ভ্রম লুটছে প্রতি দিন। মাঝে মাঝে মা-বাবা ওর বিষয়ে আলাপ করেন। ফাতিমা কান পেতে শোনে। মেয়ে বড় হয়েছে। পরিপূর্ণ যুবতী। কোন বড় ধরনের লড়াই শুরু হলে তখন মেয়ের ইজ্জত রক্ষা করবেন কী করে?

সব মেয়ের মনেই থাকে ঘর বাঁধার স্বপ্ন। ফাতিমা স্বপ্ন দেখত ওর স্বামী হবে, সংসার হবে। ওর স্বামী হবেন শিক্ষিত, জ্ঞানী, ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, অনেকটা এর চাচার মতো। যিনি সুন্দর করে কথা বলবেন, হবেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও অমায়িক। তাছাড়া ফাতিমাও অনেক বইপত্র পড়েছে ইসলামের মহত্ব, বিজয় ও সৌন্দর্য সম্পর্কে।

এত অস্থিরতা অনুভব করে মনে হয় ছেলে হলে ও এই লড়াইয়ের শেষ পরিণতি দেখত। কিন্তু এখন নিজেকে সামাল দেয়াই দায়। ওর মা-বাবা ওকে চাচার ওখানে পাঠিয়ে দিতেন কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে সে পথও বন্ধ। কাশ্মীর ছেড়ে এদিক ওদিক কোন দিকেই যাওয়া যাবে না। তাছাড়া কাল ওদের এলাকার

কয়েক জায়গায় যুদ্ধ হয়েছে। বেশ কয়েকজন মুজাহিদ প্রাণ হারিয়েছেন। যে কোন সময় ওদের মহল্লায় শত্রুরা হানা দিতে পারে। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। প্রতি ঘরে মৃত্যুর আতঙ্ক। আর যুবতীদের আতঙ্ক ইজ্জতের।

ফাতিমা কেবল ভাবে আর আল্লাহর কাছে মোনাজাত করে। নিজের জীবনের চেয়ে মূল্যবান এই সতীত্ব। প্রাণ দেবে তবু ইজ্জত দেবে না। কিন্তু কি করতে পারে? ভাবতে ভাবতে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে সে। যদি এমন মুহূর্ত আসে তাহলে আত্মহত্যা করবে। পরক্ষণেই সে ভাবে, আত্মহত্যা করা মহাপাপ। তাই সে আত্মহত্যা করবে না; বরং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে লড়ে যাবে পাষণ্ডদের সাথে। তাই নিজের সাথে একটা ধারালো ছুরি রাখে সব সময়। আবার ভাবে মরার আগে দু'একটাকে শেষ যদি করা যায়। শক্তি দিয়ে সম্ভব নয়, তাই বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে সাহসের সাথে। ঘরে মা-বাবা নিয়ে তিনটি মাত্র প্রাণী।

একটা প্রচণ্ড ঝড় যেমন সব উলট পালট করে দিয়ে যায় ঠিক তেমনি আজ ঘরবাড়ি, কাল মসজিদ, মাজার। সকালে এক শহর বিকালে এক শহর, জনপদ ধ্বংস হচ্ছে। নরপিশাচরা কেবল হত্যাই নয়, ফাঁকে ফাঁকে পশুত্ব চরিতার্থ করছে। প্রতিটি ঘর থেকে ভেসে আসছে স্বামীহারা, ভাইহারা, নারী-পুরুষের কান্নার রোল যেন কারবালার প্রান্তর। দেখতে দেখতে সৈন্যরা ওদের বাড়ির দিকেও আসছে। প্রথমে দুজন ওদের ঘরে ঢুকল। ফাতিমা একটা কোণায় সরে আত্মগোপন করেছে। সামনের ঘরে বাবা-মা। এসেই বাবাকে ভাইদের কথা জিজ্ঞেস করল আর 'শালা মুসলমানের বাচ্চা' বলে বাবাকে লাথি মেরে ফেলে দেয়। বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারান তার মা। তারপর তার বাবাও।

ফাতিমা তো আর সহ্য করতে পারছিল না। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছিল, বুকের ভেতর থেকে প্রাণটা বেরিয়ে আসতে চাইছিল। যে কোন মুহূর্তে আসবে ওর ওপর ঝড়। কোন রকমে স্থির হয়ে ভাবে সে, এই পশুদের ছেড়ে দেওয়া যায় না। শক্তিতে কুলাবে না। তাই বুদ্ধি দিয়ে কাজ সারতে হবে– যা থাকে কপালে। এখন সব চেয়ে বড় সম্পদকে ব্যবহার করতে হবে অস্ত্র হিসেবে।

একজন সৈন্য চারদিক তাকিয়ে এদিকেই আসছিল। যথাসম্ভব স্বাভাবিক হয়ে উঁকি মেরে একজনকে ইশারায় ডাক দেয় ফাতিমা। একজন সৈন্য এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ছলনার মাধ্যমে সে তাকে নিয়ে যায় ছোট কামরায়। তারপর চূড়ান্ত পর্যায়ে আসার আগেই বুকে বসিয়ে দেয় ছুরির ঘা। চার দেয়ালের ভেতর থেকে চিৎকারের শব্দও শোনা যায় না। বিদ্যুৎবেগে লাশটা অন্য ঘরে নিয়ে সরিয়ে রাখে।

তারপর আয়নায় একবার নিজের চেহারার উস্কো খুস্কো ভাব দেখে নেয় ও আবার আগের মতো স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে। তারপর যথাসম্ভব নিজেকে

সামলে নেয়। তারপর এগিয়ে গিয়ে একই ভঙ্গিতে দ্বিতীয়জনকে ডাক দেয়। যুবতীর ইশারায় সে তার সঙ্গীর কথা ভুলে যায়। একই প্রক্রিয়ায় দু'নম্বর খুন করে লাশ সেই কামরায় ঢোকায়। বাইরে এসে উঁকি মেরে দেখে নেয় আরও কয়েকজন সামান্য দূরে পাশের বাড়িতে পায়চারী করছে। ফাতিমার এখন প্রতিশোধের নেশা। ভাবছে এদের কিভাবে শেষ করা যায়। মুহূর্তের মধ্যে কত কথা মনে পড়ে। সুন্দর সাজানো সংসার আজ কোথায়! পাশের ঘরে পড়ে আছে মা-বাবার লাশ। এই পৃথিবীতে সে এখন নিঃসঙ্গ একটা প্রাণী। বাইরে বেরুলে হায়েনারা কুড়ে কুড়ে খাবে। ঘরে চিৎকার করে কাঁদবে তারও উপায় নেই। আবার ভাবে চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য তো ছুরিটা আছেই। এ ছুরি দিয়েই যে কয়েকটাকে পারে সে শেষ করে দেবে। ময় অল্প তাই কৌশলে কাজ সারতে হবে।

ফাতিমা নিজের রক্তমাখা কাপড় পাল্টায়। নতুন কাপড় পরে ও যথাসম্ভ পরিপাটি হয়। সাজগোজ করে আর ভাবে, যে মেয়ে বোরকা পরে চলে আজ তাকে সাজতে হচ্ছে কতগুলো পশুর জন্য। কল্পনার নয়, এটাই তার বাস্তব লড়াই। তারপর মা-বাবার লাশের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। গাছের আড়াল থেকে বিচ্ছিন্ন একজন সৈন্যকে ইশারায় ডাকে আগের ভঙ্গিতে। বুঝতে পেরে ফাতিমাকে অনুসরণ করে সেই নরপিশাচ। পেছন দরজা দিয়ে নিয়ে একটা ঘরে যায়। সামনের ঘরে মা-বাবার লাশ যেন উলট-পালট না হয় সে জন্য। তারপর সুস্থ মাথায় কাজ সারে। এভাবে এক এক করে তার আয়ত্তে আসা সৈন্যের সবগুলোকেই শেষ করে দেয়। নিজেকে আর সামলাতে পারে না ফাতিমা। লাশের স্তূপ ওদের ঘরে। দুএকজন এখনও বাকি কিন্তু আর পারছে না। মাথা ঘুরছে, সমস্ত শরীর অবসন্ন। এক সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় ফাতিমা।

যখন জ্ঞান ফিরে তখনও দেখতে পায় চোখের সামনে ওর মেঝ ভাই, চাচাত ভাই ও আরও অপরিচিত মুখ। তারা বাকি সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করে এই এলাকা আবার দখলে নিয়েছে। এত লাশ দেখে সব ঘটনা তারা জানতে চায়, কিন্তু ফাতিমা বলার শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছে। ভীষণ ক্লান্ত, মৃত্যু যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সে আবার জ্ঞান হারায়। অবস্থা খারাপ দেখে ওরা ফাতিমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জ্ঞান আবার ফিরে আসে। চোখের সামনে দেখতে পায় ওদের এলাকার মুজাহিদ দলের নেতা আলী আহমদকে। উনিই ফাতিমার ভাই ও অন্যদেরকে যুদ্ধের জন্য তৈরি করেন। তার অসীম সাহস, বীরত্ব ও ঈমানের কথা অনেক শুনেছে ভাইদের মুখে। ফাতিমা মনে মনে তার কথা ভাবত ও তাকে আপন করে পেতে ইচ্ছে করত। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসতো। আবার ভাবতো

সত্যের সৈনিকদের সংসারের জালে বাঁধতে নেই। আজ সেই মহান ব্যক্তি তার এত কাছে। কিন্তু সময় বড় অল্প। ফাতিমা সব কথা বলতে চেষ্টা করল। সবশেষে আলী আহমদ সম্পর্কে তার ধারণার কথাও বলল।

সব শুনে মুজাহিদ নেতা বললেন, আপনার মূল্যায়ন করার যোগ্যতা বা ক্ষমতা আমার নেই। একমাত্র মহান আল্লাহই আপনার মূল্যায়নকারী। তবুও বলব, যতদিন বেঁচে আছেন আপনার কিছু দুঃখের ভাগ আমায় দিন। জানি আমার সময় খুব অল্প। আমার পথ অনেক দুর্গম। মঞ্জিল আমার মৃত্যুর পর। তবুও সংঘাতের ফাঁকে ফাঁকে জীবনের স্বাদ গ্রহণ, স্বপ্নের বাস্তবায়ন। আলী তো ফাতিমার জন্যই।

কয়েকজন মুজাহিদের উপস্থিতিতে তাদের বিয়ে হয়। কিন্তু একটু পরেই বেরিয়ে যেতে হবে কর্তব্যে। সবাই মুহূর্তের জন্য ওদের দু'জনকে অবকাশ দেয়। ফাতিমার হাত দুটো ধরে আলী আহমদ বলেন, আমাকে চলে যেতে হবে এক্ষুণি, সময় খুব অল্প। ফাতিমা অপলক তাকিয়ে থাকে মানুষটির দিকে। নিজেকে সে সবচেয়ে ভাগ্যবতী ভাবে। মনে পড়ে তার কারবালার কাসেম ও সখিনার কথা। আলী আহমদ বলেন, যতোদিন তোমার মত সাহসী ও ত্যাগী নারী এই ভূখণ্ডে আছে ততোদিন আমাদের পরাজয় নেই। তুমি আমার চেয়ে বড় মুজাহিদ।

স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসরের নামায আদায় করে আবার অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন আলী আহমদ সাথীদের নিয়ে। ফাতিমা অপলক তাকিয়ে থাকে তাদের গমন পথের দিকে।

একজন কাশ্মীর কন্যার মেহেদি রাঙ্গা হাত

নিশ্চুপ বসেছিলাম আমরা চারজন। সামনে ধূমায়িত চায়ের কাপ। উড়ে যাওয়া ধোঁয়ার মাঝে আমরা প্রত্যেকেই খুঁজে ফিরছিলাম অনেক সংকটের সমাধান। চায়র কাপে আরেকটি চুমুক দিয়ে আমি ভাবলাম, নাহ্ এভাবে আর বসে থাকা যায় না। চায়ের কাপে ঝড়-এ কথাটি কি তাহলে মিথ্যে হয়ে যাবে?

ঃ না, আলীটা না হলে কোন আড্ডাই জমে না। আমার আগে আজীজই নীরবতা ভেঙ্গে দিল।

হ্যাঁ, অনেকদিন হয়ে গেল, এতোদিন তো তার ফিরে আসার কথা। একথা বলে আমার প্রতীক্ষার দৃষ্টি বাইরে দিলো।

আরে চিন্তা করো না। আলী বেড়ালের মতো চুপি চুপি আসবে নাকি? ও ব্যাঘ্রের ন্যায় হুংকার ছেড়ে হঠাৎ এসে পড়বে। চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে এ কথাগুলো বলল সাআদ।

ছাফওয়ান সবার কথার ফাঁকে কথা বলার সুযোগ খুঁজছিলো।

ঃ আসলেই আলী ছাড়া আমরা কেমন যেন ঢিলে হয়ে পড়েছি। কোন অপারেশন চলছে না। কেমন যেন সংগ্রামবিমুখ হয়ে পড়েছি আমরা। আসলেই ছাফওয়ানই আমাদের মনের কথাটি বলে ফেলল। আলীকে ছাড়া আমরা করবই বা কি? সমস্ত খবরাখবর সেই তো সংগ্রহ করে। সেই তো নির্ধারণ করে আমাদের টার্গেট। সাআদ আলীর অভাবটা আরো প্রকট করে তুললো এ কথা ক'টি বলে।

ঃ আচ্ছা, এখনই তো আমাদের দলে সদস্যসংখ্যা ছিল এগার। এখন তা পাঁচে এসে দাঁড়িয়েছে। বাকিরা আমাদের ছেড়ে গিয়ে জান্নাতবাসী হয়েছে। বন্ধু মুজাহিদরা শাহাদতের পিয়ালা পান করে স্রষ্টার সান্নিধ্যে আজ কতইনা আনন্দমুখর।

ঃ আলী ছিল আমাদের ইনচার্জ। দশদিন আগে সে তার মায়ের কাছ থেকে একটি পত্র পেয়েছিল। পত্রে তার মা তাকে বাড়ি যেতে বলেছিলেন। আলীর ফুফাতো বোন রুবাইয়ার সাথে তাঁর বিয়ের কথা।

আজ যখন আযাদী-চেতনার অগ্নিশিখা ভূস্বর্গ কাশ্মীরের সর্বত্র জ্বলে উঠেছে তখন মানবতাবিরোধী, পাশব শক্তির হাতে সংযোগকৃত সহিংসতার বহ্নিশিখায় জ্বলে-পুড়ে ভারতের স্বর্গোদ্যানে মহাশ্মশানে পরিণত হতে চলেছে। কুলুকুলু ধ্বনিতে বহমান পাহাড়ি নদীগুলোতে আজ রক্তের বন্যা। আঙ্গুর-আপেল আর ফসলের ক্ষেতগুলোও এখন রুক্ষ-চৌচির। চারদিকে শুধু হিংস্র হায়েনার তর্জন-গর্জন। পাখিদের কলকাকলী যেন আজ দূর অতীতের কাহিনী। কাশ্মীরী বৃদ্ধারা আজ স্থানুর মত দেখছে, দুঃস্বপ্নের কালো রাত। কলরব মুখরিত শিশুরা ছুটে বেরিয়ে পড়েছে প্রতিরোধ সংগ্রামে। রিক্ত কোল মায়েরা দু'হাত তুলে ফরিয়াদ করছে। আর নিষ্পাপ কোমল-হৃদয় ষোড়শীরা অঝোর বেগে অশ্রু ঝরাচ্ছে। ভূমিতলে লুটোপুটি খাচ্ছে মাতৃজাতির আকাশ-উঁচু মর্যাদা। হিংস্রতার তলোয়ার চলছে আজ যুবতী, কিশোরী ও কুমারী কাশ্মীর কন্যাদের নাযুকতার ওপর। এগুলো সব যেন আজ মামুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাশ্মীরের প্রতিটি যুবক আজ আযাদি ও মুক্তির আবেগে উচ্ছ্বসিত। ইসলাম কায়েমের জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আজ তারা সবটুকু ইমানের উত্তাপ নিয়ে। কেউই আজ ঘরে বসে নেই।

ইসলামের কন্যারাও আজ কালো বোরকার পাট দুলিয়ে রাস্তায় নেমেছে। বারুদ ভরা ভারী বাতাসে এখন রং-বেরং-এর ওড়নিও উড়তে দেখা যায়।

আলীর মার চিঠিটি দেখে ওরা সবাই একটু চিন্তিত হয়েছিলো। চিঠিতে আলীর মা লিখেছিলেন, বুরাইরা মা এখন আর নিজেকে রক্ষা করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। যার আমানত তার কাছে অর্পণ করে আমি তোমার ফুফু এখন একটু

নির্ভার হতে চাই বাবা। তুমি তাড়াতাড়ি এসো। কমান্ডার চিঠির কথা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ আলীকে অনুমতি দিয়েছিলেন, মায়ের ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য।

আলী একটি প্রাণময় যুবক। প্রতিটি অভিব্যক্তি তার প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা। মনমরা একটা মানুষও তার সাক্ষাতে হয়ে উঠতো প্রাণপূর্ণ। গোমরামুখো লোকের চেহারায়ও লাগতো খুশির ছোঁয়া।

আলী চলে যাওয়ার সময় আমরা ভগ্ন হৃদয়ে তাকে বিদায় করেছি।

সাআদ বলেছিল ঃ দেখ আলী, ঘনিষ্ঠতার সুখে পড়ে আমাদেকে ভুলে যেও না। তোমাকে ছাড়া কিন্তু আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে উঠবে অসহ্য, কঠিন। ছাফওয়ান বলেছিল, দেখ আলী, বেশিদিন দেরি করো না। এমনি যেন না হয়, তুমি আনন্দ খোঁপায় সুখের বিলি কাটবে আর আমরা এদিকে তোমার অপেক্ষায় শুকিয়ে মরবো।

আলী তখন বলেছিলঃ বাব্বা, কি যে বলো। বিয়ের রে আমিতো তাকে সাথে করেই এখানে চলে আসবো। ও খুব বীরঙ্গণা। আমাদের মাঝে নতুন এক সৈনিকের আগমনের অপেক্ষায় থাকতে পারো তোমরা।

আজীজ ভারী গলায় বললো ঃ ঠিকইতো বাড়ীতে কি কোন নিরাপত্তা আছে? কাশ্মীরের কোন জনপদেই এখন নিরাপত্তা নেই। আলী গেছে আজ তিনদিন। আমাদের ধারণা আলী হয়তো ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে?

এর মধ্যেই আমরা সীমান্তবর্তী কাপওয়ারা জেলার কুনান গ্রামে ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক নারী নির্যাতনের মর্মান্তিক ঘটনা শুনতে পেয়েছি। হৃদয় আমদের কেঁপে উঠলো মানব ইতিহাসের জঘন্যতম গণধর্ষণের খবর শুনে। মুখের কথা ফুরিয়ে গেছে আমাদের। আমরা স্তব্ধ হয়ে গেছি। কারো মুখ থেকে কোন ধরনের অশুভ উচ্চারণ বেরিয়ে যায় এই ভয়ে সবাই কেমন যেন আতঙ্কগ্রস্ত। এ খবর শুনে আমাদের হৃদয়-মন আলীর জন্য চরম অস্থির। আমরা চোখে-চোখেই একে অপরের হৃদয়ের কথা বুঝে নিতাম। অখণ্ড নীরবতা ভয়ানক রূপ ধারণ করলে শূন্যে খুঁজতাম মনের ভাষা। আলীর বাড়িত কুনান গ্রামে। আজ সাতদিন। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছে আমাদের। মনের কোণে জমে থাকা অনেক কথা না বলতে পেরে আমি কাঠি মাটিতে আঁকা-আঁকি করছিলাম। এমনি মুহূর্তে আচমকা পরিচিত একটি আওয়াজ শুনে আমরা উচ্চকিত হয়ে উঠলাম। হ্যাঁ, এটা তো আলীর কণ্ঠ।

চলো, চলো, আলী তাহলে এসে গেছে। বন্ধুরা সবাই ঘাঁটি থেকে বের হয়ে গেলো।

কখন এসে আলী আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে তা টেরও পাইনি। স্থানুর মতো নিশ্চল-নির্বাক দাঁড়িয়ে আলী। কোন কথা নেই মুখে। মনে হয় আজ যেন সে চরম

বিধ্বস্ত। কোনদিনও কথা বেরোয়নি এ মুখ দিয়ে। আঁখিদ্বয় ছলছল। যখন কোন বড় অপারেশন শেষ করে আসে আলী, তখন তার চেহারা এমন হয়, যে কেউ তাকাতে পারে না তার দিকে।

নিস্তব্ধতা যখন আমাদের তীরের মতো বিদ্ধ করছিলো, তখন আবেগপ্রবণ সাআদ চরম উত্তাপে আলীকে ঝাঁকি দিয়ে বলল ঃ এই আলী, কিছু বল; তোর কি হয়েছে। বিয়ে হয়েছে তো? তোমার মা, ফুফু আর বুরাইরা কেমন আছে?

সাআদ একদমে এতগুলো প্রশ্ন করলো কিন্তু আলীর ওপর এর কোন প্রতিক্রিয়াই হলো না। নিস্তব্ধ ও নিশ্চল হয়ে সে আগের মতোই দাঁড়িয়ে রইলো। সাআদের কথাগুলো যেন সে শুনতেই পেল না। আবার সজোরে ঝাঁকুনি দিল সাআদ আলীকে।

কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আলী তার কাঁধে রাখা থলেটি আস্তে আস্তে মাটিতে নামিয়ে রেখে সেটি খুলল। থলের মধ্যে রুমালে মোড়ানো কী একটা জিনিস। উৎসুক দৃষ্টিগুলো আনচান করছিল তা দেখার জন্য। আলী রুমালটি খুলে ফেললো। আমরা সবাই তখন নিশ্চুপ হয়ে গেলাম। আমাদের কলজে, হৃৎপিণ্ড সব বুঝি ঠেলে বের হয়ে আসবে আমাদের প্রাণ। লাল বুটিদার আরবী রুমালটির ভেতর ঘুমিয়েছিল একটি মর্মান্তিক উপাখ্যান। নির্যাতন, নিপীড়ন ও বর্বরতার এক চরম ব্যথাভরা এক ইতিহাস।

মুক্তির ইতিহাস, স্বাধীনতার ইতিহাস। যুগে যুগে ইসলামের জন্য উৎসর্গীত জীবনের ইতিহাস। এখন আর আলীর কাছে আমাদের জানার কিছুই ছিল না। রুমালে রাখা ছিল স্বপ্নীল ভবিষ্যতের ভাবনায় ডুবে থাকা এক কুমারী কন্যার মেহেদি রাঙা হাত। হাতের ঠিক মাঝখানে ছিলো মেহেদি রঙে রাঙানো একটি নাম "আলী"।

কুনান পল্লীতে সেই ভয়াবহ পাশব উল্লাসের রাতে যেসব মা-বোন জীবন দিয়েছে বুরাইরাও এদের একজন। একটি কাটা হাত ছাড়া আর গোটা দেহের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে সকল মৃতদেহের ছাইভস্ম। আলীদের ঘাঁটির সামনেই দাফন করা হবে মেহেদি রাঙা এই হাতটি।

কাশ্মীরের জেলখানা থেকে সদ্যমুক্ত একজন মুজাহিদের নির্যাতনের কাহিনী

কাশ্মীরের কংগন প্লামার অধিবাসী স্নাতক ডিগ্রিধারী মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ তার বক্তব্য ঃ ছাত্রজীবন থেকে আমি ইসলামিক স্টুডেন্ট লীগের সাথে যুক্ত। কাজের প্রতিও ছিল আমার প্রবল আগ্রহ। তাই আমি প্লামারে ফটোস্ট্যাট এবং টাইপিংয়ের কাজ করতাম। অধিকৃত অঞ্চলের সকল নওজোয়ানের যে অপরাধ, আমার অপরাধও তাই। স্বাধিকারের দাবি করাই আমার একমাত্র অপরাধ। স্বাধিকার আদায়ের জন্য আমি লড়াই করে যাব, যতক্ষণ না তা আদায় হয়। সৈয়দ শাব্বীর শাহ আমার হৃদয়ে স্বাধীনতার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন। আমি তার নেতৃত্বে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করছি। সৈয়দ আলী শাহ গিলানী আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব, যিনি সংসদের ভেতরে এবং বাইরে ঝড় সৃষ্টি করেছেন। যিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, মহল্লায় মহল্লায় স্বাধীনতার অগ্নিমশাল জ্বালিয়েছেন। যিনি ভারতের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী যুবকদের জাগিয়ে দিয়েছেন। যিনি বারংবার ভারত সরকারকে শোষক এবং অত্যাচারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

ভারতের কাশ্মীর দখল আইন মানবতাবিরোধী একথা আজ নতুন করে বলার প্রয়োজন হয় না। এই অধিকৃত এলাকার স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের অভিযোগে আমাকে ১৯৮৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রথমবারের মতো প্লামা থেকে গ্রেফতার করা হয়। যখন তিনি মাকবুল বাটির মৃত্যুবার্ষিকী পালনের প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছিলেন, তখন আমাকে গ্রেফতার করে উটিপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রথম তিনদিন আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করতে থাকে। অতঃপর আমাকে শ্রীনগরের সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয়। অবশেষে এভাবে ১৫ দিন পর্যন্ত অনাহারে-অর্ধাহারে দুর্বিষহ কষ্ট দিয়ে মুক্তি দেয়া হয়।

১৯৮৯ সালের ৭ আগস্ট (যখন পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস নিকটে) পাকিস্তানীরা একটি হ্যান্ডবিল প্রচার করে। তাতে ১৪ আগস্টকে মহাসমারোহে স্বাধীনতা দিবস পালন এবং ১৫ আগস্টকে কালো দিবস পালনের আহ্বান জানান হয়। ওই হ্যান্ডবিল নিয়ে আমি মোটরসাইকেলযোগে প্লামা থেকে নিউখান্দা যাচ্ছিলাম। সাথী হিসেবে ছিলেন 'মুসলিম মুত্তাহেদা মোহাযের' সাবেক প্রধানের পুত্র বশীর আহমদ। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এই হ্যান্ডবিল বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার করা। কিন্তু না, কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতের পেটুয়া বাহিনী পুলিশেরা। আমাদের গ্রেফতার করে ওই পোস্টারগুলো উদ্ধার করে। দোষী সাব্যস্ত করার জন্য তাদের কাছে এটাই ছিল প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতএব নিউখান্দা থেকে গ্রেফতার করে আমাদের

নিয়ে যায় ৩০ কিঃ মিঃ দূরে শ্রীনগরে। এরপর একজন সৈনিক এসে আমাদের পৃথক করে চোখ বেঁধে নাম জিজ্ঞাসা করে। অধিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমাকে লালবাগ ইন্টারোগেশন সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং একটি অন্ধকার সেলে আমার জীবনের প্রহরগুলো কাটতে থাকে। যে সেলে আমাকে রাখা হয় তার কপাট এবং প্রাচীরে ছিল রক্তের চিহ্ন। একজন দুর্ধর্ষ সৈন্য আমার সেলে প্রবেশ করেই জামায়াতে ইসলামী, পিপলস লীগ, লিবারেশন ফ্রন্টকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল শুরু করে। আমাকে নির্দেশ করল জুতা খুলে হাত উপরের দিকে উঠাতে। আমি তার নির্দেশ পালন করলাম। এক ঘন্টা এভাবে থাকার পর হাতকড়া পরিয়ে ছাদের সাথে বেঁধে ফেলল আমার হস্তদ্বয় এবং একজন রক্তপিপাসু জানোয়ার আমার পায়ের লোম উপড়ে ফেলতে শুরু করল নির্দয়ভাবে। প্রথমত আমি এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে হতভম্ব হয়ে যাই। এরপর অন্য একজন সিপাহিকে পায়ে আঘাত করার নির্দেশ দেয়। এভাবেই চলতে থাকে গোটা দিনমান। পরের দিন আমাকে দাঁড় করিয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করলো। আমাকে প্রশ্ন করলো–

(১) জামায়াতে ইসলামী নেতা-কর্মীদের নাম প্রকাশ কর, যারা এই আন্দোলনের সাথে জড়িত।

(২) পিপলস লীগের সেক্রেটারী জেনারেল শেখ আব্দুল আজিজ কোথায় আত্মগোপন করেছে তার ঠিকানা দাও।

(৩) লিবারেশন ফ্রন্টের আশরাফ মজীদওয়ারী (যিনি কিছুদিন পূর্বে শাহাদত লাভ করেন) ইয়াসীন মুলক এবং আব্দুল হামীদ শেখ কোথায় আত্মগোপন করেছে তার ঠিকানা দাও।

(৪) তুমি সৈনিকের ট্রেনিং কোথা থেকে পেয়েছ?

(৫) দেশদ্রোহী এই পোস্টার কোত্থেকে পেলে?

আমি তাদের সবগুলো প্রশ্ন শুনে বললাম, ১৪ আগস্টের পোস্টার আমি নিজেই ছেপেছি আর অবশিষ্ট কিছুই আমি অবগত নই। এরপর তারা দুজন সৈনিক পাঠিয়ে আমার দোকান থেকে তিনটি টাইপ-রাইটার এবং একটি সাইক্লোস্টাইল মেশিন টরচার সেলে আটক রাখে এবং আমাকেও অন্য একটি সেলে এনে নির্যাতনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করে। একজন দুর্ধষ সিপাহি এসে আমকে ঘুষি মারতে শুরু করে। যে যখন একটু দুর্বল হয় তার ঘুষি বন্ধ করতো তখন অন্যজন শুরু করতো চপেটাঘাত। এই অসহনীয় নির্যাতন চলল সারাদিন। বিকেলের দিকে আমার দাঁত থেকে পুঁজ বের হতে শুরু করে। আর এর ফলে দু'দিন পর আমার তিনটি দাঁত উপড়ে ফেলা হয়। রাজবাগ ইন্টারোগেশন সেন্টারে আমার ওপর সব রকমের বর্বরতার পরীক্ষা করা হয়েছে।

খাবারের মধ্যে ইঁদুরের মল এবং ডালের মধ্যে তিক্ত কিছু ঢেলে দিয়ে আমার জন্য নিয়ে আসা হতো। পেটের জ্বালা মেটানোর জন্য বাধ্য হয়ে তা আমাকে

খেতে হতো। একদিন হঠাৎ করে আমার পেটে সাংঘাতিক ব্যথা অনুভব করলাম। ব্যথায় আমি চিৎকার করতে শুরু করলে দু'জন সৈন্য এবং একজন ডিএসপি আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। পথিমধ্যে ডিএসপি আমাকে বললো, যদি তোমাকে সিএমএইচ-এ ভর্তি করা না হয় তবে অন্য কোথাও ভর্তি হতে তুমি অস্বীকার করবে। অন্যথায় পরবর্তীতে তার জন্য কঠোর পরিণতি তোমাকে ভোগ করতে হবে। যখন হাসপাতালে পৌঁছলাম, তখন এই জালেমগণ নিজেরাই আমাকে পুনঃ নির্যাতন সেলে নিয়ে আসে। আসার পথে আমার ছোট ভাইকে দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না। তাকে অনিচ্ছাকৃত ডাক দিয়ে উঠি। আমার ডাক শুনে আমার ভাই দৌড়ে যখন আমার কাছে আসছিল, তখন এই নরপিশাচ তাকেও গ্রেফতার করে।। একদিকে আমার দাঁতের জ্বালা-যন্ত্রণা, অন্যদিকে পেটের জ্বালা। তার ওপর আমার নির্দোষ ভাইয়ের ওপর এহেন জঘন্য জুলুম। এই দৈহিক ও মানসিক জ্বালা বোঝানোর নয়। একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। আমাকে পুনরায় নির্যাতন সেলে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। অতঃপর দু'টি শর্তের মাধ্যমে সমঝোতায় আসার প্রস্তাব তারা দেয়–

(১) ত্রিশ হাজার টাকা নগদ নিয়ে দাও,

(২) মেশিনগুলো ফেরত নাও; তার পরিবর্তে দেবে সঠিক উত্তর। কিন্তু আমি তাদের প্রস্তাবকে দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করলে তারা আমার ওপর নির্যাতন আরো বাড়িয়ে দেয়। কয়েকজন সৈন্য আমার ওপর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো। খুলে ফেলল আমার কাপড় চোপড়। উলঙ্গ করে যে দিকে থেকে পারে লোমগুলো উপড়ে ফেলা শুরু করে।

আমার শরীরের লোম উপড়ানোর ব্যথা ছিল অসহ্য। মনে ক্ষোভে, দুঃখে হাউমাউ করতে লাগলাম। ৪০ দিন পর্যন্ত আমার ওপর এই নির্যাতন চললো। ৪০ দিন পর আমাকে শ্রীনগর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হলো। সেখানে অধিকৃত কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী নেতা সৈয়দ আলী শাহ গিলানী, জামায়াতে ইসলামীর সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল, হিযবুল মুজাহিদীনের বর্তমান আমীর গোলাম মুহাম্মদ ছফী, পিপলস লীগের শিব্বীর আহমদ শাহ এবং আযম ইনকিলাবীর সাথে দিনগুলো ভালই কাটছিল। ১৯৮৯ সালের ৭ ডিসেম্বর জামিনে মুক্তি পেয়ে আমি ঘরে পৌঁছি। কিন্তু তখনও অধিকৃত কাশ্মীরের সব জায়গায় কারফুও বলবৎ ছিল। ভারতীয় পুলিশ বাহিনীর পৈশাচিক নির্যাতন আর সেনাবাহিনীর নির্মম আচরণে মানুষের জীবন বাঁচানো দুরূহ হয়ে পড়ে। স্বাধিকার ও স্বাধীনতাকামী জনতা শাহাদতের পথে অগ্রসর হয়েছে।

কাশ্মীরী মুজাহিদদের প্রধান মুখপাত্র শায়খ গোলাম মোঃ সফীর সাক্ষাৎকার

আমেরিকার ইচ্ছামতো নয়, কাশ্মীরের স্বাধীনতা আর ইসলামী শাসন মুজাহিদদের রূপরেখা অনুসারেই হবে

[কাশ্মীর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান মুখপাত্র মুজাহিদ নেতা গোলাম মোহাম্মদ সফীর এ সাক্ষাৎকারটি পাকিস্তানের একটি প্রভাবশালী সাপ্তাহিকের সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

প্রশ্ন ঃ কিছুদিন আগে আপনি বলেছিলেন ভারত আপনাকে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানতে পারি?

মোঃ সফী ঃ আসলে ভারত খুব ভালভাবেই বুঝে নিয়েছে যে, কাশ্মীর তার হাত থেকে চলে যাচ্ছে। অবস্থার পরপ্রেক্ষিতে যে কি করা উচিত তা ভারতের উপলব্ধিতে নেই। কাজেই ভারত নানা অজুহাত দেখাচ্ছে। কখনো বলছে মুজাহিদদের সাথে আলোচনা হবে, আবার কখনো বা তাদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে বলেছে যে, আমরা কাশ্মীরী মুজাহিদ নেতাদের সাথে বিনা শর্তে আলোচনায় বসতে রাজি। ভারতের এসব চালবাজির কারণেই আমরা এমন কর্ম কৌশল অবলম্বনে তৎপর রয়েছি, যাতে জিহাদের কোনো প্রকার ক্ষতি না হয়। ভারতকে আমরা এমন কোন সুযোগ করে দিতে চাই না, যদ্দারা জিহাদের সামান্যতম ক্ষতি হওয়ার আশংকা দেখা দেবে। কারণ, অতীতে যথেষ্ট তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। আমি ১৯৪৭ সালে সূচিত জিহাদের কথাই বলছি। জিহাদ যদি সাম্প্রতিক শুরু হতো, তাহলে অবস্থার প্রেক্ষাপট হতো ভিন্ন। কেননা, তখন যুদ্ধের ময়দানে আমরা বিজয়লাভ করেছিলাম; আর আলোচনার টেবিলে হয়েছিলাম পরাস্ত। বর্তমানে আর আলোচনার বৈঠকেও কোনরূপ দুর্বলতা আমরা দেখাব না, যুদ্ধক্ষেত্রে তো নয়-ই।

প্রশ্ন ঃ অধিকৃত কাশ্মীরীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং এ নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞাত আর কেউই নেই। অতএব, এ বিষয়ে কিছু বলুন।

মোঃ সুফী ঃ কিছুদিন আগে আমি মধ্যপ্রাচ্য সফরকালে এখানকার বিভিন্ন স্থানের অবস্থা তুলে ধরেছি। আরব নওজোয়ানরা তা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে আফগানিস্তানের পর কাশ্মীরে এসে জিহাদ করার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমরা এখনো-এর অনুমতি দিচ্ছি না। কারণ আমরা আগে শায়খ আবদুল্লাহ বিন বায-এর ফতোয়া নিয়ে নিতে চাই। যেমন তিনি আফগানিস্তানে গিয়ে জিহাদের পক্ষে ফতোয়া দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ঃ শায়খ আবদুল্লাহ বিন বাযের ফতোয়াদানে বাধা কিসের? তনি এখানো ফতোয়া দিচ্ছেন না কেন?

মোঃ সফী ঃ ফতোয়াদানের ব্যাপারটিতে একটি শরঈ নীতি রয়েছে, যাতে কিছু সময় লাগে। ফতোয়ার আবেদন আমরা তার কাছে পেশ করছি। নীতিগতভাবে তিনি ফতোয়াও দিয়ে দেবেন, যার প্রভাব পুরো আলমে ইসলামে পরিলক্ষিত হবে। তখন পূর্বের তুলনায় অধিক রাজনৈতিক শক্তির সহায়তাও আমাদের অর্জিত হবে। তাছাড়া অর্থনৈতিক সাহায্যও বহুগুণ বেশি হারে পাবো আমরা। জনাব আব্দুল্লাহ বিন বায হচ্ছেন সউদী আরবের প্রধান মুফতী। তিনি বলেছেন, আগামীতে হজের ভাষণে তিনি ফিলিস্তিন ও অন্য অধিকৃত মুসলিম দেশসমূহের সাথে কাশ্মীর বিষয়েও বক্তব্য রাখবেন এবং সউদী সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণেরও সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালাবেন। তাঁর ফতোয়া প্রচারিত হলে ভারতের সাথে সউদী আরবের সম্পর্কেও ব্যাপক অবনতি ঘটবে। যৌথ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও দেখা দেবে চরম মন্দাভাব।

প্রশ্ন ঃ আরব রাষ্ট্রগুলোর সফরকালে আপনি কোন্ কোন নেতার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন?

মোঃ সফী ঃ আমার শুধুমাত্র হজের পাসপোর্টই মিলেছিল। তাই আমি শুধু সউদীতেই গিয়েছি। এ সফরে পবিত্র মক্কা, মদীনা ও রিয়াদ ছাড়াও আরো তিনটি সউদী শহর সুন্দর করেছি। তাছাড়া রাবেতা জেনারেল, ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইউথ-এর সেক্রেটারী জেনারেল এবং হারাম শরীফের ইমামগণ ছাড়াও বহু নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করেছি, তাদের কাছে কাশ্মীর সমস্যাকে তুলে ধরেছি। কাশ্মীরে মুসলিম নির্যাতনের ওপর পাকিস্তান টেলিভিশন যেসব ফিল্ম তৈরি করেছে তাও তাদের দেখাই, যেন তারা এ ব্যাপারে সম্যক ধারণা নিয়ে স্ব স্ব পরিমণ্ডলে প্রচার করতেও সক্ষম হন।

প্রশ্ন ঃ কাশ্মীরের ব্যাপারে এ যাবৎকাল কূটনৈতিক পর্যায়ের পাকিস্তান সরকার যে কার্য আঞ্জাম দিচ্ছে সে সম্পর্কে কিছু ধারণা দিলে খুশি হবো।

মোঃ সুফী ঃ এ পর্যায়ে কোন না কোন প্রচেষ্টা এ যাবৎ অব্যাহত আছে। যেমন, কিছু সৈন্য পাঠানো হয়েছে এবং তাদের ইতিবাচক ভূমিকা দেখা যাচ্ছে। তবে সুস্পষ্ট কোন পলিসিতে না আসা পর্যন্ত পূর্ণভাবে তার ফল পাওয়া যাবে না। তাই এ পর্যায়ে আমি পাকিস্তানকে আবেদন জানাবো, অতি সত্ত্বর আমাদের একথা খুলে বলতে হবে যে, আমরা কি সিমলা চুক্তি মতো কথা বলবো, না ১৯৪৮ সালে প্রণীত জাতিসংঘের নীতিমালা অনুসারে চলবো? কারণ, একই সাথে দুই কূল সামলানো যায় না।

প্রশ্ন ঃ আপনার ধারণামতে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারে কাশ্মীর সমস্যার ওপর তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। তাহলে এর বাইরে এ সমস্যার গুরুত্বের দিক ও তা নিরসনের সম্ভাবনাগুলো কী হতে পারে বলে মনে করেন?

মোঃ সফী ঃ আমি মনে করি আমেরিকা ও তার পক্ষের শক্তিগুলো পাকিস্তানকে শক্তিশালী দেখতে চায় না। তাই তারা চাচ্ছে না যে, কাশ্মীর পাকিস্তানের সাথে

মিশে যাক। কাজেই জাতিসংঘের নীতিমালা বাদ দিয়ে সিমলা চুক্তি অনুসারেই সমস্যার সমাধানে আমেরিকা আগ্রহী দেখাচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে অন্য বিষয়। তা হলো আমেরিকার কথায় কি আমরা আমাদের অধিকার হাতছাড়া করবো, না সামনে এগিয়ে নিজেরাই আপন অধিকার ছিনিয়ে আনবো? অবস্থা যাই হোক ঈমানের চেতনা ও মনযিলে মকসুদে পৌঁছার উদ্যম থাকলে এমন কোন বাধা নেই, যা অতিক্রম করা যাবে না। মাত্র কবছর আগেও কি কেউ একথা ভাবতে পারতো যে, বিশ্বের একটি বৃহৎ শক্তিকে আফগানিস্তানের ঢিলেঢালা পোশাক পরিহিতা একদল লোক এমনভাবে কাবু করে ফেলবে যে এজন্য তার লেজ গুটিয়ে পালাতে হয়।

সউদী আরবের নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের বরাত দিয়ে অনেক সাংবাদিকই আমাকে বলেন যে, আমেরিকা তো এখন স্বাধীন কাশ্মীর চাচ্ছে। এমতাবস্থায়ও কি পাকিস্তানের সাথে সংযুক্তির বিষয়টিকে বাধা হিসেবে রাখতে চান আপনারা? আমি বলি আপনারা একথা কেন ভাবছেন যে, আমরা আমেরিকার খুশি অখুশিকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে নেবো? ধরুন, যদি এমনটিই হয় যে, আমেরিকার মর্জির কাছে মাথানত করেই আমরা স্বাধীন কাশ্মীর রাষ্ট্র মেনে নিলাম। এরপর কে বলতে পারে যে, আমেরিকা স্বাধীন কাশ্মীরে ইসলাম ও ইসলামী বিধি-বিধান বাস্তবায়নের অনুমতি দেবে? তাই আমি পরিষ্কার করেই বলছি যে, আমরা আমেরিকার ইঙ্গিতে নয়, নিজেদের কর্মপদ্ধতিতেই অগ্রসর হতে চাই। ইনশাআল্লাহ সেদিন আর বেশি দূরে নেই, যখন ভারতের পরিণতি হবে রাশিয়ার চেয়েও করুণ।

কাশ্মীরী শিশু ঃ অস্ত্র যাদের খেলনা

উন্মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন যেখানে বিপর্যস্ত, মানবতার মমত্ব যেখানে বিষাক্ত খঞ্জরে বিদ্ধ, স্বাধিকারের স্পন্দিত তাকবীর যেখানে নির্যাতনের স্টীম রোলারে পিষ্ট, মীমাংসিত সত্য যেখানে উপেক্ষিত, সেই খুন-ঝরা ভূস্বর্গ কাশ্মীরের কথাই বলছি। প্রাকৃতিক ঝরনা-ফোয়ারার পর্যটকরা যেখানে এক সময় অবকাশ যাপনের লক্ষ্যে ছুটে আসতো, সেই স্বর্গরাজ্যের বায়ুপ্রবাহে এখন মিশে আছে বারুদের গন্ধ। ধোঁয়ার কুণ্ডলী এখন তার আকাশকে ঘিরে রেখেছে। দখলদার নরপিশাচদের নারকীয় কর্মকাণ্ডে স্বর্গরাজ্য এখন পরিণত হয়েছে ভূতের রাজ্যে।

যুগ যুগ ধরে রক্তের লাল গালিচায় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলন করে আসছে কাশ্মীরীরা। এজন্য তাদের কম রক্ত দিতে হয়নি। যার সঠিক হিসাব হয়তো দেয়া মুশকিল। স্বাধিকার আন্দোলনে কাশ্মীর উপত্যকার প্রতিটি নাগরিকই সচেতন, শিশু-কিশোররাও স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত। ফুটবল আর ক্রিকেট

খেলার ভিতর যাদের সময় অতিবাহিত হওয়ার কথা, সেই অবোধ শিশুরাই আজ হাতে তুলে নিয়েছে অস্ত্র। বড়দের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে লড়ে যাচ্ছে তারা দেশের জন্য। অত্যাধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত ভারতীয় বাহিনী এদের ভয়ে আতংকিত। অস্ত্র নিয়ে আজ কাশ্মীরের শিশুরা নেমেছে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়। খেলার পরিবর্তে অবসর মুহূর্তের নেশা এখন তাদের বোমা আর বন্দুক। এগুলো তাদের মাঝে সঞ্চার করেছে অপ্রতিরোধ্য দুর্জয় সাহসের।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কাশ্মীরী শিশুদের অস্ত্র-প্রবণতায় জড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হলো সেখানকার পরিবেশ। স্কুলের শিশুদের যখন-তখন সেনাবাহিনীর নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। বিভিন্নভাবে তাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নেয়ার চেষ্টা করে মানবরূপী এই নরপশুর দল। আর তখন বিগড়ে যায় এই কোমলমনা শিশুরা। পরিত্যক্ত হয় তাদের স্বাভাবিক জীবন। এ সকল জিজ্ঞাসা এখন তাদের কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার। যে কারণে বই-কলম নয়, বন্দুকই এখন তাদের হাতের শোভা। বন্দুক চালানো তাদের কাছে লাটিম ঘুরানোর চেয়েও সহজ। তারাবাজির মতো বোমা ফাটিয়ে তারা আনন্দ পায়। শিশুদের এই মানসিক পরিবর্তনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে ভারতের স্বার্থান্বেষী মহল। ছোট্ট ছোট্ট শিশু যাদের দেখে আদর-সোহাগ ভরিয়ে দিতে মন চায়, কল্পনাতীতভাবে এরাই আক্রমণের ঝড় উঠায় যখন-তখন। সীমান্ত অতিক্রম করে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধ করার ঝুঁকির চেয়ে স্থানীয় প্রশিক্ষকদের সহায়তায় কাশ্মীরের শিশুরা যে নিপুণ যুদ্ধশৈলী প্রদর্শন করছে, ভারতীয় বাহিনী এগুলোর মোকাবিলায় হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। এছাড়া বাইরে প্রশিক্ষণ নিতে গেলেই এ তথ্য সরকারি বাহিনীর গোচরে এসে যায়, যে কারণে এ ধরনের লোকদের দেশে এসে গোপনে যুদ্ধ করা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু এসব নিয়ম-কানুন তো আর শিশুদের বেলায় খাটে না। ফলে তাদের অপারেশন খুব কমই ব্যর্থ হয়। দশ থেকে সতেরো বছরের শিশু-কিশোররা সকালে স্কুলে হাজিরা দেয় আর বিকেল বেলাটা কাটায় অস্ত্র প্রশিক্ষণের মাঝে। টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয় যে, শিশুদের যুদ্ধের প্রতি আসক্ত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, যখন তারা তাদের পরিবারের অন্যসব সদস্যের স্বাধীনতা আন্দোলনে সোচ্চার দেখে, তখন শিশুরাও নিজেদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। নিজেদের অজান্তেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা স্বাধীনতার লড়াইয়ে। এ ব্যাপারে এক কাশ্মীরী শিশুর বক্তব্য–

'কনকনে শীতের রাতে বিছানা থেকে আমার বৃদ্ধ পিতাকে টেনে নিয়ে বরফের উপর দৌড়ানোর হৃদয় বিদারক দৃশ্যকে আমার মানসপট থেকে মুছে ফেলতে পারি না। তাই বাধ্য হয়ে অস্ত্র হাতে নিতে বাধ্য হলাম।

একজন কাশ্মীরী বালক যোদ্ধার আত্মকাহিনী

যেভাবে আমি অস্ত্র হাতে তুলে নিলাম

আমার নাম দেলাওয়ার খান। বয়স পনের। শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী পাস। বাড়ি কাশ্মীরের কাপওয়াড়া জেলার দারাপুরায়। পনের বছর বয়সেই কিন্তু আমি একজন পূর্ণবয়স্ক যোদ্ধা হয়ে গেছি। বয়স ও শারীরিক দিক দিয়ে আমি একজন কিশোর বালক হওয়া সত্ত্বেও ইতিমধ্যেই আমি অসংখ্য ভারতীয় সৈন্যকে হত্যা করেছি। আমার জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল আর দশজন বালকের মতোই সীমিত। আমাদের ছোট্ট গ্রামেই সীমাবদ্ধ ছিলো আমার পৃথিবী। আযাদী গোলামি, কল্যাণ, অকল্যাণ, ভালো এবং মন্দের ব্যাপারে তখনো আমি ভাবতে শিখিনি। আমার বিচরণ ছিল ফল-ফসলের ক্ষেত এবং গাঁয়ের স্কুল পর্যন্ত।

১৯৯০ সালের জানুয়ারি থেকে কাশ্মীরে স্বাধীনতা আন্দোলনের নতুন জোয়ার আসে। লোকমুখে শুনেছি এই জাগরণ আরম্ভ হয়েছে তারও এক বছর পূর্বে। কিন্তু আমি হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে প্রথম স্লোগান শুনি বিগত ২৬ জানুয়ারি বিকেলে আমাদের গ্রামের মসজিদে। এই স্লোগান ছিল স্বাধীনতার মুক্তির, যা আমার কাছে ছিল একোবারেই নতুন। সংবাদপত্র এবং রেডিও'র মাধ্যমে পাওয়া খবর অনুযায়ী হাজার হাজার স্বাধীনতাকামী জনগণকে সেনাবাহিনী নির্বিচারে হত্যা করেছে।

এর উপলক্ষ কী? কী ঘটছে? কেন ঘটছে? এসব বিষয়ে আমি পুরোপুরি অজ্ঞ ছিলাম। আযাদী এবং গোলামির পার্থক্য আমি বুঝতাম না। আমি উর্দু লিখতে ও পড়তে পারতাম। বিভিন্ন স্থানে লেখা দেখতাম ঃ আমরা কাশ্মীরীরা কি চাই? আযাদী।

২৬ শে জানুয়ারী থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারী '৯১ পর্যন্ত সময়ের মধ্যেও আমি গোলামি এবং আযাদীর মধ্যে সার্বিক পার্থক্য করে উঠতে পারিনি। মানুষ কেন আযাদীপ্রিয়? কেন এর জন্য রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করে তারা? কেন শাহাদত-এর অমর পিয়ালা পান করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না মানুষ? তা আমি চিন্তাও করিনি কখনো। মুক্তির জন্যে পাগলপারা হওয়ার কারণ নিয়ে গভীরভাবে ভাবিওনি কোনদিন।

১০ ফেব্রুয়ারি ছোট বোনটিকে সাথে নিয়ে যাচ্ছিলাম আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে। বোনকে সাথে নিয়ে এটাই আমার প্রথম সফর ছিলো না। দীর্ঘ ১৫ বছর বয়স কেটেছে আমার গ্রামের ঘনিষ্ঠতায়। আমি কখনো সেনাবাহিনী দেখিনি। এবারই প্রথম দেখলাম সামরিক পোশাক পরিহিত অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত টহলদার সৈন্য। সৈন্য দেখে আমরা দু'জনই একটু বিব্রত হয়ে পড়লাম। হাইহামা নামক এলাকায় পৌঁছার জন্য কোন যানবাহনের ব্যবস্থা ছিলো না। অতএব রীতি অনুযায়ী আমরাও পায়ে

হেঁটে যাচ্ছিলাম। পাহাড়ের এক প্রান্তে সেনাবাহিনীর ঘাঁটি। যেতে হচ্ছে তাদের সম্মুখ দিয়েই, তাই যাচ্ছিলাম। আমার বোনকে দেখে উত্যক্ত করতে লাগলো একটি সৈন্য। আকস্মিক অস্ত্র উঁচিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো একটি সৈন্য। সে আমাকে বলল ঃ তোমার কাছে কি পাস আছে? উত্তরে আমি বললাম ঃ সেটা আবার কি? সে উত্তর কি আমি দেব? বলে আমার বোনের দিকে হাত বাড়ালো সৈন্যটি। বোন আমার শংকা ও ভয়ে কাঁদতে লাগলো। কিন্তু হায়! নির্জন পাহাড়ের পাদপথে এই চিৎকার আর করুণ আর্তনাদ আমি ছাড়া আর কেউ শুনল না। মহান স্রষ্টাই ছিলেন আমাদের বিপদের একমাত্র সাক্ষী। বোনের বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে চিৎকার করতে বারণ করলো সৈন্যটি। আমি ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গেলাম। মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগুন জ্বলে উঠলো আমার। বন্দুকের নল ধরে প্রচণ্ড এক টান দিলাম। আর বিলম্ব করলো না ফৌজ জওয়ান। বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করলো আমার শিরে। অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর যখন জ্ঞান ফিরে এলো, দেখি আমার মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে আমার বোন। তার কাপড় ধূলিমলিন, চুল এলোমেলো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো সে।

বোনের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, সৈন্যটি কোথায়? উত্তরের পরিবর্তে বোন আমার বিদীর্ণ দৃষ্টিতে তার আয়ত চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো আমার প্রতি। সে তোকে কিছু বলেনি তো? তার সামনে বসে আমি জিজ্ঞেস করলাম। রেশমা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। তার চোখের পানিতে আমি অনেক কিছুই পড়ে নিলাম। গোলামির জিন্দেগীতে যেমন হওয়ার তেমনি হয়েছে ভাইয়া। বলে রেশমা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

ওর কাছে আমি আর কিছুই জিজ্ঞেস করলাম না। পথ চলতে লাগলাম, অনেক পথ অতিক্রম করে ওকে অনেকটা আশ্বস্ত হতে দেখে আমি তার কাছে জানতে চাইলাম। গোলামি কী?

"আমরা যাদের গোলাম, তাদের যখন ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, কিন্তু টু শব্দটি পর্যন্ত করার শক্তি নেই আমাদের– বললো রেশমা।

ছোট বোনের এই কথাগুলো বর্শার ন্যায় গেঁথে গেলো আমার অন্তরে। তৎক্ষণাৎ আমি আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সা.)কে অন্তরে উপস্থিত রেখে দৃঢ় সংকল্প করলাম যে, আমি গোলামির বিরুদ্ধে লড়বো এবং আজ থেকেই লড়বো।

আব্বাজান আমার সর্বদাই বলতেন দেশের ছেলেরাই হয়। দেশ ও জাতির রচীয়তা এবং স্থপতি। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আমাকে আব্বা বলতেন, তুমি রেশমাকে আদর করবে, সহানুভূতিসূচক ব্যবহার করবে। ফৌজি জওয়ানের এই হীন আচরণের সময় আব্বার কথাই আমার মনে পড়ছিলো বারবার। আমি ছিলাম এই নির্যাতনের বদলা নিতে উদগ্রীব। পথ চলতে চলতেই আমার বোন চলতে আরম্ভ করলো ঃ ফৌজি জওয়ান আমার সাথে যে ব্যবহার করেছে তা কারও

কাছে বলবে না ভাইয়া। এমনকি আব্বা-আম্মার কাছেও না। শুধু তুমি আমি ছাড়া একথা কেউ জানুক তা আমি চাই না। বোনের উৎকণ্ঠাভরা আবদার শোনে অন্তরে গেঁথে গেলো একটি অব্যক্ত বেদনা।

বাড়ি চলে এলাম। অস্থিরতার ভেতর কাটালাম অনবরত সাতটি দিন। খাওয়া-দাওয়া, আরাম নিদ্রা সবই যেন হারাম হয়ে গেছে আমার ওপর। অত্যাচার, নির্যাতন ও জুলুমের বিরুদ্ধে লড়ার অঙ্গীকার এবং সংকল্প করেছি অনেক আগেই। কিন্তু কী করি?

ইতিমধ্যে শুনেছি যুবকরা সীমান্তবর্তী এলাকায় যায়, গিয়ে অস্ত্র নিয়ে আসে। আমিও তো অস্ত্র হাতে তুলে নিতে চাই। কিন্তু আমার যে ওখানে যাওয়ার মতো পয়সা নেই, নেই পথ চলার কোন সাথী।

জীবনে এই প্রথমবারের মতো চুরি করলাম আমি। চুরি করলাম আব্বার শাল। সে শাল একশ' টাকায় বিক্রি করলাম এক দোকানে। বাড়ি ফিলে এলাম। রাত কাটলো। সকালে দোকান থেকে বিশ টাকার রুটি কিনে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঘরের কাউকে কিছুই বললাম না। কোথায় যাচ্ছি এবং কি করতে যাচ্ছি এ সম্পর্কে কাউকে কিছু না জানিয়েই পার্বত্য অঞ্চলের দিকে যাত্রা শুরু করলাম, সম্পূর্ণ একা। সূর্য ডুবে অন্ধকার নেমে এলো। পৌঁছলাম এক ঘন জঙ্গলে। কোথাও পানির সন্ধান নেই। চারদিক থেকে ভেসে আসছিল জীব-জন্তুর ভয়াল আওয়াজ। রাত কাটালাম একটি দেবদারু গাছে। বেশ ক'টি রুটি খেয়ে নিয়েছি। কিন্তু পিপাসায় গলা ভেজানোর মতো কিছুই নেই এখানে। পরদিন সকাল হওয়ার আগেইপথচলা শুরু করলাম। পৌঁছে গেলাম সুউচ্চ এক পর্বতে। এখানে পৌঁছে বরফ দেখে আবার যেন জীবন ফিরে পেলাম। বরফ দিয়ে খেয়ে নিলাম আরো কিছু রুটি। বিকেলে পৌঁছলাম বরফঢাকা আরেক পাহাড়ে। পথ চলার সাহস হারিয়ে ফেললাম ক্লান্তি, অবসাদ ও দুর্বলতায়। হাত-পা যেন অবশ হয়ে পড়েছে। শীতে কেঁপে কেঁপে কাটলো সারারাত। সকাল হলে সাহস করে পা বাড়ালাম সম্মুখে। এরমধ্যে সময় এবং কিবলা আন্দাজ করে নামাযও আদায় করে নিচ্ছিলাম কখনো তায়াম্মুম করে। আমি কোথায় যাচ্ছি, তা তো আমার জানা ছিলো। অজ্ঞ ছিলাম শুধু রাস্তা সম্পর্কে। অতএব প্রকৃত রাস্তা থেকে নিজের অজান্তেই সরে পড়েছি। কেননা, পাঁচদিন চলার পরও কোন বস্তি চোখে পড়লো না। এদিকে আমার কেনা বিশ টাকার রুটি শেষ। ক্ষুধার জ্বালায় পথ চলাও অসম্ভব হয়ে উঠলো। চললেও কোন রাস্তা ধরবো, এই নিয়ে ছিলাম গভীরভাবে চিন্তিত। এমনি সময় দেখলাম একটি কাক আমার মাথা অতিক্রম করে যাচ্ছে। উঠলাম। চলতে লাগলাম এই কাকের গতিপথ দেখে দেখে। সেটা যেদিকে যাচ্ছে, আমিও সেদিকে পা বাড়াচ্ছি।

সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে চলতে পরিশ্রান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়লাম। অসহায়ভাবে বসে পড়লাম এক পাথরের উপর। আমার দু'গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা বইছে। অনিচ্ছাকৃতভাবে ভেঙ্গে পড়লাম কান্নায়। জানি না এই কান্না কিসের? কেন এই অশ্রু? আমার অসহায়ত্বের জন্য? না বোনের হরণকৃত সতীত্বের জন্য?

বোনের কথা মনে পড়তেই চাদরে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠলাম আমি। কাঁদতে কাঁদতে অচেতন অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন সকাল।

বোনের সতীত্ব হরণের প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহা যদি আমার না থাকতো, তবে আমাকে এখানেই হার মানতে হতো, সামনে চলতে পারতাম না। কিন্তু প্রতিশোধ স্পৃহা আমাকে টেনে নিয়ে গেলো। চলছি, পথ অতিক্রম করছি। রাস্তায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পেলাম একটি বন্দুক। ভাবলাম হয়তো এটা আমার মতো কোন দুঃখী বালকেরই হবে। সাহস বেড়ে গেলো। অস্ত্র চালনা তো আমার জানা ছিলো না। তবুও কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম সেটি। অগ্রসর হতে লাগলাম ক্লান্ত, শ্রান্ত এবং পরিশ্রান্ত দেহ নিয়ে।

পৌঁছলাম গন্তব্যস্থলে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। আমার কাহিনী খুলে বললাম, পূর্ণ সম্মান করা হলো। অতঃপর ক্যাম্পে পাঠানো হলো আমাকে। যে ক্যাম্পে পাঠানো হলো তাতে আমিই সবচেয়ে অল্পবয়স্ক। এবার চললো ট্রেনিং-এর পালা। তিন মাস চললো ট্রেনিং। অতঃপর একটা ক্লাসিনকোপ, একটি পিস্তল এবং একটি গ্রেনেড দ্বারা সজ্জিত করে আমাকে পাঠান হলো একটি গ্রুপের সাথে। দুইদিন একরাত পথ চলার পর আপন ঘরে পৌঁছলাম। আম্মা-আব্বা নির্বাক। আমাকে পেয়ে তারা আবার হাসি ফিরে পেলো। জানতে চাইলো এতদিনের অবস্থানের কথা। কোথায় ছিলাম, কি করছিলাম ইত্যাদি। কিন্তু আমার মুখ ছিল তালাবদ্ধ।

দ্বিতীয় দিনই বেরিয়ে পড়লাম জুলুমের বদলা নেওয়ার উদ্দেশ্যে। পৌঁছে গেলাম আমার বোনের কান্নাভেজা হাইহামা রোডে। আড়ালে দাঁড়িয়ে টহলরত সৈন্যদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করে বসলাম। নিহত হলো টহলরত কিছু সৈন্য। এরপর চার মাস ধরে কত টহলদার ভারতীয় পুলিশ ও সেনাকে হত্যা করেছি তার সঠিক হিসাব আপাতত দিতে পারছি না। হিসাব আমি রাখিওনি। আমি যখনই আক্রমণ করেছি, তখন বোনের সম্ভ্রম হননকারীদের প্রতিশোধের নেশায় করেছি। আমি দৃঢ় সংকল্প করেছি যতদিন জীবিত থাকবো, পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়বো। গোলামির জিঞ্জির করবো ছিন্নভিন্ন, গোলামিতে নিমজ্জিত জাতিকে করবো স্বাধীন। পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে উড্ডীন করবো স্বাধীনতার পতাকা। যে গোলামি আমার বোনের সতীত্ব-সম্ভ্রম, মান, সম্মান কেড়ে নিয়েছে, এর বিরুদ্ধেই আমার লড়াই।

আমি অনুভব করছি অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এমনও একটা সময় ছিলো, যখন আমরা সেনাবাহিনীর নাম শুনে থর থর করে কাঁপতাম। কিন্তু সাম্প্রতিক পরিস্থিতি হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বর্তমান এমনই একটি পরিস্থিতি বিরাজ করছে, যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। কাশ্মীরের শিশু-কিশোররাও আজ স্বাধীনতার নেশায় মাতাল। কেননা, আযাদী অথবা ইজ্জতের সাথে মৃত্যু, প্রাচুর্যময় জীবন, গোলামির জিন্দেগী থেকে উত্তম।

প্রথম সুযোগেই সংগ্রহ করুন